ক্যাসানোভা-পরিচিতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ···

তার সাহিত্যের ভাণ্ডার আশ্চর্যভাবে সমৃদ্ধ হোয়ে উঠেছিলো আত্মজীবনীর রূপায়ণে। Restif de la Bretonne, Rousseau, Madame Roland, Hamilton—তাঁদের বিভিন্ন মনের মুকুরে প্রতিফলিত সমকালীন স্বচ্ছন্দ জীবনধারা, আনন্দউজ্জ্বলতা, প্রাণ-প্রাচুর্যের স্বতঃস্ফূর্ত ভোগতৃষ্ণা—এক কথায় জীবনকে রঙে রসে ভ'রে তোলার সকল সম্ভাবনায় ভরা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ণ ছবিখানি পাওয়া যায় তাঁদের আত্মস্মৃতির মাধ্যমে। কিন্তু সমস্ত স্মৃতিচিত্রই ম্লান করে সবচেয়ে চড়া রঙে উজ্জ্বল হোয়ে উঠেছিলো ক্যাসানোভার স্মৃতিচিত্র জীবনের নব নব বৈচিত্র্যের ঝঙ্কারে···অভিনব ঘটনার রসাস্বাদনে আর তার দ্বিধাহীন অকপট বর্ণনায়···

গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথম প্রকাশিত হোলো এই স্মৃতিকথা। সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপে প্রায় সমস্ত ভাষায় ছড়িয়ে পড়লো এর অসংখ্য সংস্করণ—চকিত হোয়ে উঠলেন বিদগ্ধ সমাজ। এও কি সম্ভব? এমন বিচিত্র লীলাময় জীবন? সম্ভব কি তার এমন অকপট অসঙ্কোচ প্রকাশ—যা এসে পৌঁছেছে শালীনতার শেষ সীমায়?

সত্যের সন্ধানে এগিয়ে এলেন প্রায় পঞ্চাশজন বিখ্যাত সাহিত্যিক—তাঁদের সমস্ত শক্তি, শ্রম আর সাধনা নিয়োজিত হোলো তথ্যানুসন্ধানে। এলেন Charles Henry, Charles Samaran, O. Uzanne, Gustave Kahn, Remy de Gourmont, Arthur Symons, Havelock Ellis, Joseph le Gras—আরও অনেকে। রাশি রাশি চিঠিপত্র, প্রবন্ধ, পুস্তিকা প্রকাশিত হোলো ক্যাসানোভার

কাহিনীর সত্যমিথ্যা প্রমাণে।···অদ্ভুত বিচিত্র কাহিনী!···ভেনিসে পিয়োম্বির কারাগার থেকে ক্যাসানোভার পলায়নের যে অধ্যায় সেও কি এক রোমাঞ্চকর কাল্পনিক কাহিনী মনে হয় না?···

সত্য-সন্ধানী সাহিত্যিকরা বহু আয়াসে সংগ্রহ করলেন সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে লেখা ক্যাসানোভার চিঠিপত্র, তন্ন তন্ন করে খুঁজে আনলেন Duxএর লাইব্রেরী থেকে ক্যাসানোভার বহু প্রবন্ধ ও রচনার পাণ্ডুলিপি, বহু চিঠিপত্র, দলিল ইত্যাদির নকল—সারা ইউরোপ তোলপাড় করে ক্যাসানোভার সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য সংগৃহীত হোলো···কারণ এই বিচিত্র মানুষটি বহু দেশ ভ্রমণ করেছিলেন—রোম, টুরিন, নেপলস্, জেনোয়া, ত্রিয়েস্ত, করফু, কনস্তান্তিনোপল্, লণ্ডন, প্যারিস, মাদ্রিদ, পিটার্শবুর্গ, বার্লিন, ভিয়েনা, ওয়ারশ'—কোথায় নয়? এসেওছিলেন বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে—ফ্রেডারিক দি সেকেণ্ড, ক্যাথারিণ দি গ্রেট, চতুর্দ্দশ পোপ বেনেডিক্ট, মার্ক্‌ইস দ্য পম্পাড্যুর ইত্যাদি; তাই তার সম্বন্ধে তথ্য অনুসন্ধান আয়াসসাধ্য হোলেও অসম্ভব হয়নি। অবশেষে তাঁদের সমস্ত পরিশ্রমকে পুরস্কৃত করে প্রমাণিত হোলো ক্যাসানোভার আত্মকাহিনী সম্পূর্ণ বাস্তব ঘটনা—নিছক সত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

শুধু প্রমাণিত নয় আত্মকাহিনীর মধ্য দিয়ে অমরত্ব লাভ করলেন ক্যাসানোভা। George Sand লিখলেন–'Casanova will remain in history and in literature the most lively expression of the 18th Century"—আত্মস্মৃতির মাধ্যমে জেগে উঠলো অষ্টাদশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ পৌরুষের এক মূর্ত প্রতীক···যে জীবনের হাত থেকে দস্যুর মত লুটে এনেছে পরিপূর্ণ সুধাভাণ্ড···আদিম উল্লাসে মুক্তকণ্ঠে আনন্দের জয় ঘোষণা করেছে···বাঁচার

আনন্দের···ভোগের আনন্দের···বাসনার চরিতার্থতার আনন্দের। তার সেই ছলনাহীন অকপট ঘোষণায় নেই কোনো মনস্তত্ত্ব, কোনো আধ্যাত্মিকতার সৌজন্য আবরণ। জীবনকেই সে গ্রহণ করেছে ভোগের জন্য—ভালোবেসেছে মানুষকে···তাই তার কাহিনীর কোথাও এমনকি ভ্রমণের বর্ণনাতেও প্রকৃতির রূপরসগন্ধের কোনো আভাস নেই···প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তার দৃষ্টি নন্দিত করেছে মানুষের প্রকৃতিকে। ষ্টিফান জুইগ তারই বর্ণনায় বলেছেন "Art to him, is the servant of life and exists only in so far as it enhances the charm of living."

বিশ্ববিখ্যাত মনস্তাত্বিক হ্যাভলক এলিসের মতে যে প্রচণ্ড শক্তি আর বিপুল ক্ষমতা ক্যাসানোভা শুধু নিজের ভোগবাসনার চরিতার্থতায় ব্যয় করেছে, তাতে সহজেই সে যে কোনো পথেই সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌছতে পারতো—হোতে পারতো জনপ্রিয় রাষ্ট্রনেতা, তীক্ষ্ণধী বিচারক কিম্বা বিরাট ধনী ব্যবসায়ী, তারপর কর্মজীবনের সেই বৈচিত্র্যহীন, স্বাদহীন অবসাদগ্রস্ত, ক্লান্ত দিনগুলিকে ঠেলে ঠেলে এগিয়ে যেতো সমাপ্তির পথে কিন্তু "Casanova chose to live. A crude and barbarous choice it seems to us, with our hereditary instinct to spend our lives in wasting the reasons for living"—এলিস আরও বলেছেন—"He sought his pleasure, and not in the complaisance of the women he loved, and they seemed to have gratefully and tenderly recognised his skill in the art of love-making. "Casanova loved many women······." ক্যাসানোভা নিজেই এই উক্তির যথার্থতা প্রমাণ করে গেছেন তার

স্মৃতিকথার প্রসঙ্গে—"My story is that of a bachelor whose chief business in life was to cultivate the pleasures of the senses,"

ইন্দ্রিয়পরায়ণ ক্যাসানোভার জীবনের রসাস্বাদনের সেই অকুণ্ঠ বর্ণনা তাই প্রথম যখন প্রকাশিত হোলো জার্মান ভাষায় ১৮২২-১৮২৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তখন সেই স্মৃতিকথার অনেক অংশ বর্জন করে তাকে অনেক সংযত আর মার্জিত করা হোয়েছিলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফরাসী অধ্যাপক জ্যঁ লাফো ক্যাসানোভার বিকৃত, অশুদ্ধ ফরাসী থেকে শুদ্ধ ফরাসী ভাষায় দ্বাদশটি খণ্ডই প্রকাশিত করলেন যথাসম্ভব পরিবর্তন আর পরিবর্জন করে—যথাসম্ভব শালীনতা বজায় রেখে। কিন্তু বিগত শতাব্দীর সেই বিচিত্র নায়কটি বহুপূর্বেই তার জবাবদিহি করে গেছেন—'জানি অনেকেই আছেন যারা বলবেন আমার এই স্মৃতিকথা প্রকাশ করতে লজ্জিত হওয়া উচিত, সত্যিই লজ্জিত হওয়াই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক…কিন্তু আমার মন তা মানেনা'…

ক্যাসানোভার বহু সাহিত্যিক ভক্ত এমনকি ষ্টিফান জুইগও স্মৃতি-কথার অংশ বিশেষকে বাতিল করার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু স্মৃতিকথার মূল পাণ্ডুলিপিটি আজও Brockhus Firmএ একই অবস্থায় পড়ে আছে—মূল পাণ্ডুলিপিটি সমগ্রভাবে প্রকাশিত করার আশা আজও দুরাশা। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ক্যাসানোভার কনিষ্ঠা ভগিনীর জামাতা Carlo Angiolini এই পাণ্ডুলিপিটি এনে Brockhus Firmএ রাখেন। পাণ্ডুলিপিটির শিরোনামা হোলো "The story of my life to the year 1797"…কিন্তু সুদীর্ঘ দ্বাদশটি খণ্ডে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দের আত্মকাহিনী বর্ণনার অর্ধপথেই আকস্মিকভাবে স্তব্ধ হয়ে গেছে। পরের খণ্ডগুলি যে কোথায় কেমন করে বিলুপ্ত হোয়েছে

কোনো সন্ধানই পাওয়া যায়নি—যেমন জানা যায়নি ঐ অসমাপ্ত দ্বাদশটি খণ্ডই বা কেমন করে Carlo Angioliniর হাতে পৌঁছেছিলো।

ক্যাসানোভা ১৭২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল তারিখে ইটালীর ভেনিস সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার জীবনের শেষ চোদ্দটি বছর কাটে বোহেমিয়ার Duxএ একটি ভিলায়। স্মৃতিকথার অধিকাংশই এখানে তিনি লেখেন। Duxএর এই ভিলাতেই ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের আত্মকাহিনীর বর্ণনার যে অংশ থেকে অবশিষ্ট পাণ্ডুলিপিটি লুপ্ত হোয়ে গেছে তার বিশদ বিবরণ অজানা থাকলেও ক্যাসানোভার শেষ জীবনের সংক্ষিপ্তসার তাঁরই রচিত 'Summary of my life" থেকে জানা যায়···

"...I settled down in Trieste, where after I had waited two years my petition was granted. That was on the 14th September 1774. My return to Venice after nineteen years of absence was the most beautiful moment of my life.

In the year 1782 I quarrelled with the whole Venetian nobility. I voluntarily left my ungrateful country in the begining of 1783 and went to Vienna. Six months later I went to Paris to live, but my brother, who had been there twenty-six years, made me forget my interests for his.

I freed him from his wife and took him to Vienna, where prince Kaunitz induced him to settle in the capitol. He is still there, younger than I by two years. I placed myself at the service of M. Foscarini, Venetian ambassador, to write his dispatches. Two years later

he died in my arms of gout which had gone to his chest. Then I decided to go to Berlin hoping to get an appointment at the Academy, but when I was half way there, Count Waldstein stopped me at Toeplitz and took me to Dux where I am still living and where in all probability I shall die,

This is the only summary of my life which I have written and I permit it to be used in any way desired.

Non erubesco Evangelium, This November the 17th, 1797.

Jacques Casanova

—শান্তা বসু

‘মাকে আর বাবাকে’

প্রথম অধ্যায়

বেটিনা—বেটিনা—হাস্যমুখরা লীলাচঞ্চল কিশোরী।

ওকে ঘিরেই সেদিনের সেই অপরিণত কিশোরটির মনে প্রথম স্বপ্ন নেমে এসেছিলো—জেগে উঠেছিলো সুপ্ত অনুভূতি—কামনার রক্ত গোলাপের স্পর্শে—তার পাপড়ির পেলবতায়—তার কাঁটার তীব্র ঝঙ্কারে।

স্মৃতির পটে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে—বেটিনার খুশিভরা দু'টি চোখ—ভোরের আলোর সঙ্গে ঘরে এসে ঢোকে, আমার ঘুম ভাঙার আগেই। সুরু হয় আমার চুলের পরিচর্যা—কি ভালোই না বাসে আমার চুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে! শুধু তাই? আমার মুখ হাত ধুইয়ে চুল আঁচড়ে দেবে—সাজিয়ে গুজিয়ে আদরে আদরে ভরে তুলেও যেন আশ মেটে না ওর। কিন্তু—সেদিনের সেই কিশোরটি সহজ হতে পারতো না কিছুতেই ওর ওই নির্দোষ আদরের অত্যাচারে—কি এক অদ্ভুত অস্বস্তি আর উত্তেজনায় ভরে উঠতো ওর দেহ মন।

*　　*　　*

ধীরে ধীরে সরে যায় বিস্মৃতির যবনিকা। পিছনের পটভূমি মিশে গেছে নিকষ কালো অন্ধকারে—একটি আলোর বিন্দুও দেখা যায় না। শুধু পাদপ্রদীপের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—বছর আষ্টেকের একটি ছেলে—রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর মুখ।

*　　　*

ভয়ে, যন্ত্রণায় বিহ্বল হয়ে দুই হাতে মাথাটা চেপে ধরে আছি, নাক থেকে অজস্র ধারায় রক্ত ঝরে ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে। বুড়ী দিদিমা মার্জিয়া ফারুসী কাঁপা কাঁপা হাতে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিচ্ছে চোখে মুখে। কিন্তু কিছুতেই বন্ধ করা গেলনা রক্ত ঝরা। শেষে আমাকে নিয়ে দিদিমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। একটা গণ্ডোলাতে চড়িয়ে নিয়ে এলো মুরানাতে। মুরানা হলো ভেনিসের খুব কাছেই ছোট্টো একটা দ্বীপের মতো। ওখানে নেমে একটু হাঁটবার পরই পৌছলাম—একটা ভাঙা কুঁড়েঘরের সামনে। টুলের উপর একটা বুড়ী বসেছিলো কালো রঙের একটা বিড়াল কোলে নিয়ে—চার পাশে আরও অনেকগুলো বিড়াল। বুড়ীকে দেখেই আমার ধারণা হলো নিশ্চয়ই ও একটা ডাইনী। দিদিমা চাপা গলায় ওর সঙ্গে কি সব কথাবার্তা বলে ওর হাতে একটি রূপার টাকা গুঁজে দিলেন। তখন বুড়ী আমাকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গেল—অনেক সাহস আর আশ্বাস দিলে, আমার অসুখ নিশ্চয়ই সারিয়ে দেবে। ছোট্টো নীচু খুপরীর মত ঘর—আমাকে শুইয়ে ফেলে বুড়ী সুরু করলে ওর ঝাড়ফুঁক তুকতাক আরও কত অজস্র রকমের প্রক্রিয়া। আর বার বার আমাকে সাবধান করতে লাগলো যা দেখছি, শুনছি, এসব যেন কখনও কারো কাছে না বলি, তাহলে অসুখ তো সারবেই না—রক্ত ঝরে ঝরে মরেই যেতে পারি একেবারে। যাই হোক, বাড়ী ফিরে অসীম ক্লান্তি আর দুর্বলতায় বিছানায় শুতে না শুতে ঘুমে ঢুলে পড়লাম। ভোরবেলা আমাকে কাপড় জামা পরাতে এসে দিদিমার মুখেও সেই একই কথা, কালকের কথা যেন কারো কাছে না বলি, তাহলেই কপালে অনেক শাস্তিভোগ আছে।

ভয় দেখানোর প্রয়োজন ছিল না—এমনিতেই দিদিমার কথা না শোনার মত সাহস তখন আমার মোটেই ছিল না। কেমন যেন বোকাটে, গোবেচারা, ভালোমানুষ ধরনের ছিলাম—সবাই দূর থেকে করুণাই করতো, কাছে এসে মিশতে চাইতো না।

কিন্তু মাঝে মাঝে সেই বোকাটে মাথাতেও দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যেতো। বাবার টেবিলে রাখা বড় একখণ্ড স্ফটিকের উপর আমার ভারী লোভ ছিলো। বাবার ভারী সখের জিনিস সেটি। একদিন বাবার ঘুমের সুযোগে ওটি পকেটস্থ করলাম। ঘুম থেকে উঠে সেটি না দেখে বাবা খোঁজ করতে করতে আমাদের জিজ্ঞাসা করলেন। ছোটো ভাই ফ্রাঁসোয়ার দেখাদেখি আমিও বললাম, জানি না। কিন্তু বাবার সন্দেহ আমাদেরই উপর। তল্লাসীর ফাঁকে কায়দা করে সেটি ফ্রাঁসোয়ার পকেটে ঢুকিয়ে দিলাম—বেচারা টেরও পেল না—অথচ ধরা পড়ার ফলে যথেষ্ট মার খেলো। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি আমার! কয়েকবছর পরে নিজেই ফ্রাঁসোয়ার কাছে একদিন বলে ফেলি সেই হাত সাফাইয়ের কাহিনী—আশ্চর্য! সেই থেকে আজও ফ্রাঁসোয়া আমাকে ক্ষমা করেনি, সুযোগ পেলেই প্রতিশোধ নিয়েছে।

এর কিছুদিন পরই বাবার মৃত্যু হয়, মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে। মা বাবার সঙ্গ জীবনে নিবিড়ভাবে কোনো দিনই পেলাম না। এক বছর বয়স থেকেই দিদিমার কাছে আমাকে রেখে ওঁরা থাকতেন লণ্ডনে। দু'জনারই পেশা ছিলো অভিনয়। কিন্তু বাবার মৃত্যুর পর মা ছেড়ে দিলেন অভিনেত্রী-জীবন—ফিরিয়ে দিলেন রূপমুগ্ধ অসংখ্য পাণিপ্রার্থীকে। মায়ের সঞ্চিত অর্থে আমার শিক্ষা সুরু হোলো।

পিতৃবন্ধু, অভিভাবক আবে গ্রিমানী আর মা আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেন পাডুয়াতে। তখন আমার বয়স নয় বছর। আমার

থাকার ব্যবস্থা হলো একটি বৃদ্ধার বোর্ডিং-হাউসে আর শিক্ষার ভার নিলেন ডাঃ গাৎসি—ছাব্বিশ বছরের প্রিয়দর্শন তরুণ যাজক। অসাধারণ মেধা আর পড়াশোনায় দ্রুত উন্নতির ফলে প্রথম থেকেই শিক্ষকের সবটুকু স্নেহ আদায় করে নিয়েছিলাম। এমন কি পরে আমার সহপাঠীদের পরীক্ষা নেবার ভারও আমি পেয়েছিলাম।

কিন্তু বোর্ডিংএ আমার দুরবস্থা চরমে উঠেছিলো। প্রথম রাতেই তো খাবার টেবিলে কাঠের চামচ দেখে চেঁচিয়ে উঠলাম আমার রূপার চামচটা দেবার জন্যে। বলা হোলো এখানে সবাই যা করে তাইই করতে হবে। মস্ত একটা কাঠের গামলায় স্যুপ ঢালা থাকতো। সবাই তাই থেকে কাঠের চামচ ডুবিয়ে খেতো। যার হাত যত দ্রুত চলতো তার ভাগ্যেই তত বেশী জুটতো। ঐ স্যুপের সঙ্গে একটুকরা নোনা কড মাছ আর একটি করে আপেল—ব্যস্! রাতের খাওয়া ছিলো আরও চমৎকার! জলের গ্লাসের বদলে জুটেছিলো মাটির ভাঁড়।

নোংরা বিছানায় শুয়ে অন্ধকারে মস্ত মস্ত ইঁদুরের লাফালাফির শব্দে ভয়ে কাঁটা হয়ে বুকে বালিস চেপে জেগে থাকতাম। সকালে পড়তে গিয়ে ঘুমে ঢুলে আসতো দুই চোখ। ক্ষিদের জ্বালায় শেষে চুরি করেও খেতাম—রান্নাঘর থেকে উড়ে যেত তাকের উপর সাজানো হেরিং আর সসেজ। পড়াশোনায় উন্নতির জন্যে সহপাঠীদের হিংসে তো ছিলোই—তারা শিক্ষকের কাছে নালিস করলে—কিন্তু ফল হলো উল্টো—দিনের পর দিন আমার এই অবস্থা দেখে বিচলিত হোয়ে ডাঃ গাৎসি নিজের বাড়িতে আমাকে নিয়ে এলেন—আমার অভিভাবকদের অনুমতি নিয়ে।

ইতিমধ্যে আমার উপর পক্ষপাতিত্বের ফলে অনেকগুলি ছাত্রই ছেড়ে দিয়েছিলো—এবার উনি নিজেই একটা স্কুল খোলার ঠিক করলেন—আর ইতিমধ্যে আমাকে উজাড় করে দিতে লাগলেন নিজের অধীত সমস্ত বিদ্যা—এমন কি বেহালা বাজানো সুদ্ধ।

বোর্ডিং-এ কয়েকটি দিনের নিদারুণ অভিজ্ঞতার পর এতদিনে সত্যিকারের আশ্রয় মিললো এঁদের ছোট্টো পরিবারে। পরিচয় হোলো স্বল্পভাষী বাবা—আর পুত্রগর্বান্বিত মায়ের সঙ্গে—আরও পেলাম—উপন্যাসের নেশা লাগা, রোমান্সের স্বপ্ন বিভোর বেটিনা—ডাঃ গাৎসির কনিষ্ঠাকে।

* * * *

আমি যে বেটিনার চেয়ে তিন বছরের ছোটো—ওর আদর ওর ঘনিষ্ঠতার আড়ালে যে আর কোনো অর্থই থাকতে পারে না, একথা মনে হলেই কোথায় যেন ঘা লাগতো—জ্বালা ধরে উঠতো সমস্ত মনে। বিছানায় পাশাপাশি বসে বেটিনা যখন আমার গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মাসলগুলি টিপে বলতো, আমি দিন দিন বলিষ্ঠ হয়ে উঠছি, তখন কি এক বিচিত্র অনুভূতির তীব্রতায় আমি অস্থির হয়ে উঠতাম। কিন্তু কোনো কথা না বলে চুপ করে থাকতাম, কেমন যেন ভয় হোতো পাছে বেটিনা টের পায় আমার এই অনুভূতির ক্ষীণতম আভাস।—আলতো ভাবে আঙুলগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ও যখন বলতো কী নরম, মসৃণ আমার চামড়া—শিরশিরিয়ে উঠতো সারা মন। কেন? কেন? আমিই বা পারি না কেন ওর মত সহজ হোতে?—ওর মত অবলীলায় ওর কাছে এগোতে? কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরামও পেতাম এই ভেবে যে, আমার মনের এই ক্ষোভ, এই জ্বালার কথা ও জানতে পারেনি।

কাপড় জামা পরা শেষ হলে ভারী মিষ্টি করে আমায় চুমো খেতো—আদর করে বলতো—'আমার ছোট্টো খোকা'—আর ঐ চুমাগুলি ওকেই ফিরিয়ে দেবার জন্যে ছটফট করে উঠতো আমার মন।

আরও কিছু দিন পরে—যখন আরও খানিকটা সাহসী হয়ে উঠেছি তখন বেটিনা আমাকে লাজুক বলে ঠাট্টা করলেই আমি ওর চুমাগুলি ফিরিয়ে দিতাম আরও গভীর আরও মধুর আবেগে—যেই মনে হোতো অনেকটা এগিয়েছি, অমনি থেমে যেতাম—কি যেন খুঁজছি, এমনি ভাবে সরে আসতাম—আর বেটিনাও তখনি চলে যেতো ঘর থেকে। আর ও চলে গেলেই প্রচণ্ড ধিক্কারে জর্জ্জরিত করতাম নিজেকে—কেন সাড়া দিলাম না? ক্ষুব্ধ কামনাকে এমন জোর করে রুদ্ধ করলাম কেন?—কেন?

অথচ বেটিনা কত সহজ—কত স্বাভাবিক। ও যা কিছু করে কেমন অনায়াসেই করে—ওকে তো এমন কঠিন প্রয়াসে নিজেকে সংযত করতে হয় না?

শরতের প্রথম দিকেই ডাঃ গাৎসি আরও তিন জন ছাত্র পেলেন। তাদের মধ্যে কর্ডিয়ানীরই বয়স হবে বছর পনেরো। মাসখানেকের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম কর্ডিয়ানী আর বেটিনার মধ্যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

এই দেখে আমার মনে যে একটা অদ্ভুত অনুভূতি হলো সেটা ভালো কোরে বোঝার ক্ষমতা সেদিন ছিল না। কিন্তু পরে বিশ্লেষণ করে দেখেছি সেটা না ছিলো হিংসা, না ছিলো বিতৃষ্ণা—ছিলো শুধু প্রচণ্ড ঘৃণা। সেটা সংযত করে রাখাও সেদিন আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। কিছুতেই আমি ধারণা করতে পারছিলাম না

যে, কার্ডিয়ানী—একটা মূর্খ, বংশমর্যাদাহীন, স্থূল প্রকৃতির চাষার ছেলে—আমার চেয়েও বেটিনার বেশী প্রিয় হোলো—শুধু একটু বয়স বেশীর দাবীতে ? আমার সুপ্ত পৌরুষের অভিমানে কোথায় যেন ঘা লাগলো—মনে হোলো আমি অনেক যোগ্য, আমার স্থান অনেক উঁচুতে—বেটিনাকে স্পষ্টই ঘৃণা করতাম—যদিও অবচেতন মনে ওকেই তখন ভালোবাসি।

কিন্তু অবচেতন মনের সে প্রেম গুপ্ত থাকে নি—বেটিনার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েছিলো—ধরা পড়েছিলো ভোরে এসে আমার চুল আঁচড়ে দেবার সময়—ধরা পড়েছিলো আমার নীরব উপেক্ষায়।

আমি ঠেলে দিতাম ওর উদ্যত হাত দু'টি—মধুভরা ঠোঁট দু'খানিতেও দিতাম না কোনো প্রতিদান। বেটিনা নিজেই একদিন জিজ্ঞাসা করলে, আমার এমন ব্যবহারের কারণ কি ?

আমি বললাম কিছু না। আমার উত্তর শুনে অদ্ভুত এক ভঙ্গীতে হেসে বেটিনা বলল, আমি নাকি কাডিয়ানীকে হিংসা করি—কি করুণায় ভরা স্বর ? রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলে গেল—প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে জানালাম কার্ডিয়ানীর মত ছেলেই ওর মত মেয়ের উপযুক্ত ; ওদের যোগ্য ওরাই···বেটিনা হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু সেদিন মনে মনে বেটিনা প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা করেছিলো—চেয়েছিলো আমাকে টের পাওয়াতে হিংসার জ্বালা কি ? আরও চেয়েছিলো—আমার চোখে আঙুল দিয়ে আমাকেই বুঝিয়ে দিতে যে, বাইরে ঘৃণার আবরণের আড়ালে আমার সমস্ত মনপ্রাণ জুড়ে যে আছে সে—বেটিনাই।

* * * *

একদিন সকালে ডাঃ গাৎসি যখন উপাসনায় গেছেন, তখন বেটিনা এসে আমার বিছানার ধারটিতে দাঁড়ালো। ওর হাতে এক জোড়া সাদা পশমের মোজা। আমার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বেটিনা বললে, মোজা জোড়া আমার জন্যে ও বুনেছে, পায়ে ঠিক না হলে আবার বুনে দেবে। সেদিন গোড়া থেকেই আমার মন কেমন যেন লুব্ধ হোয়ে উঠেছিলো—সাহস করে একটু বেশী অগ্রসর হবার চেষ্টা করলাম, ফলে কথা কাটাকাটি হতে হতে শেষটায় ঝগড়ায় দাঁড়ালো। বেটিনা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—আর আমি চুপ করে বসে রইলাম, মনের মধ্যে ঝড় বইতে লাগলো চিন্তার।

সে যে কী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা! মনে হোলো আমি বুঝি অসম্মান ঘটিয়েছি! বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এঁদের কাছে—সুযোগ নিয়েছি এঁদের আতিথেয়তার! ভাবতে ভাবতে মনে হলো আমার এত বড় অন্যায়ের একমাত্র প্রতিকার হোলো—বেটিনাকে বিয়ে করা—অবশ্য ও যদি রাজী হয় আমার মত অযোগ্যকে বিয়ে করতে।

সমস্ত দিনরাত মনের উপর চেপে রইলো এক পাষাণভার। তার উপর যখন বেটিনা আমার ঘরে আমার কাছে আসা একেবারেই বন্ধ করে দিলে তখন যেন আমার দুঃখের আর সীমা রইলো না।

প্রথমটা মনে হোলো ঠিকই করেছে বেটিনা নিজেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে—কর্ডিয়ানীর সঙ্গে ওর যে ব্যবহার তা যদি আমার মনে অমন জ্বালা না ধরাতো, তবে হয়তো আমার এই বেদনা রূপান্তরিত হোতো প্রকৃত প্রেমে।

চিন্তা—চিন্তা—চিন্তা। ক্রমাগত এই একই চিন্তার ফলে আমার বিশ্বাস হোলো আমার সঙ্গে বেটিনার এই যে নিষ্ঠুর কৌতুক, সবই

ওর ইচ্ছাকৃত—এখন নিশ্চয়ই ও অনুতপ্ত তাই আর কাছে আসতে পারে না সঙ্কোচে, দ্বিধায়। ভেবেই যথেষ্ট আনন্দ পেলাম। তখন ঠিক করলাম একটা চিঠি লিখবো ওকে, যাতে কেটে যায় ওর এই সঙ্কোচ, আবার আগের মত সহজ হয়ে উঠতে পারে ও। লিখলাম চিঠি—স্বল্প কথায়—তবে যাতে ওর অভিমানে আঘাত না লাগে সে বিষয়ে যথেষ্ট সতর্ক ছিলাম।

আমার নিজের ধারণা যে চিঠিটা রীতিমত উঁচুদরের হয়েছিল। একথাও মনে হোলো যে এমন একখানা চিঠি পেয়ে এবার বেটিনা নিশ্চয়ই অবাক হবে যে কেমন করে আমাকে আর কর্ডিয়ানীকে একই পর্যায়ে ফেলার কথা ও মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পেরেছিলো।

চিঠিটা পাবার আধঘণ্টা পরই বেটিনা জানালে পরদিন ভোরে ও আসবে আমার কাছে—আবার আগের মতো।

বৃথা—বৃথা—বৃথাই অপেক্ষা !

রাগে দুঃখে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু ঐ পর্যন্তই। খাবার টেবিলে বসে বেটিনা যখন বললে আমাদের প্রতিবেশী ডাঃ অলিভোর বাড়িতে ক'দিন পরেই একটা বল নাচের পার্টি আছে —তাতে যোগ দেবার জন্যে ও আমাকে মেয়েদের পোষাকে সাজিয়ে দিতে চায় নিজের হাতে—আমি সাজবো তো? শুধু ওই বলার ভঙ্গীটুকুতেই আমার সমস্ত ক্ষোভ শান্ত হোয়ে গেলো। সবাইকে উৎসাহিত হতে দেখে আমিও রাজী হয়ে গেলাম। আরও মনে হোলো এই সুযোগে পরস্পরের মধ্যে একটা মিটমাট হওয়াও অসম্ভব নয়।

* * * *

ডাঃ গাৎসির ধর্ম পিতা যথেষ্ট ধনী ছিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর গ্রামের বাড়িতেই থাকতেন। একদিন তাঁর কাছ থেকে খবর

এলো যে তিনি মৃত্যুশয্যায়; ডাঃ গাৎসি আর তাঁর বাবাকে যাবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে গাড়ী পর্যন্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন। শেষ সময় ওদের দেখে একটু আনন্দ পেতে চান।

আমার মনে হোলো এও একটা সুযোগ। আসলে আমার নিজেরই আর ধৈর্য থাকছিল না কবে সেই বল নাচের রাত আসবে তার আশায় বসে থাকায়।

বেটিনাকে আমি বললাম ঘরের দরজা খুলে রাখবো রাতে। সবাই শুতে গেলে ও যেন আসে আমার কাছে। একতলায় একটি ঘরে ছোট্টো পার্টিশান দিয়ে একদিকে বেটিনা আর অন্যদিকে ওর বাবা শুতেন। অন্য একটা ঘরে ঐ তিন জন ছাত্র শুতো। তাই কোনো বাধাই ছিল না বেটিনার আসার—আর আমার আশার পথে।

সেদিন রাত্রে ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। শুধু বারান্দার দিকের একটা দরজা এমন ভাবে ভেজিয়ে রেখেছিলাম যাতে বেটিনা এসে আস্তে একটু ঠেললেই খুলে যায়। মনের চাঞ্চল্যে কাপড় জামা না বদলেই এক ফুঁয়ে আলোটা নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। আর মুহূর্তগুলি কাটিতে লাগলো অধীর প্রতীক্ষায়।

কিন্তু ঘড়ীতে বেজে গেল পরপর এক—দুই—তিন—চার; প্রহর গুণে গুণে শেষ হয়ে এলো বিনিদ্র রাত। প্রতীক্ষার আকুলতা তখন জ্বলে উঠেছে ব্যর্থতার তীব্র রোষে। তখন আমার দিশাহারা অবস্থা। বাইরে তখন হিমের রাতে বইছে তুষার ঝড়—আর অপমানের জ্বালায় দেহের সমস্ত রক্ত তখন টগবগ করে ফুটছে।

পারলাম না শেষ অবধি ধৈর্য ধরতে। তখনও সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক বাকী, ভাবলাম নিজেই যাবো নীচে, দেখবো কি

ব্যাপার। পাছে কুকুরটার ঘুম ভেঙে যায়, চেঁচিয়ে ওঠে, এই ভয়ে জুতা খুলে পা টিপে এসে দাঁড়ালাম একতলায় বেটিনার ঘরের সামনে। ও যদি বেরিয়ে এসে থাকে, তাহলে দরজা তো খোলাই থাকবে এই ভেবে এগিয়ে গিয়ে দরজায় হাত দিয়ে দেখলাম দরজা ভিতর থেকেই বন্ধ। তাহলে নিশ্চয়ই বেটিনা ঘুমাচ্ছে। ভীষণ ইচ্ছা হোলো দরজাটা ঠেলতে—কিন্তু কুকুরটা যদি জেগে ওঠে? একটা ভয়ে, সঙ্কোচে একবার আমার সমস্ত শরীরটা কেঁপে উঠলো—যদি চাকরটা হঠাৎ আমাকে এই অবস্থায় দেখে ফেলে?—কি ভাববে সে?—ভাববে কি আমি পাগল হয়ে গেছি? না, শেষ অবধি প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলাম—ফিরে যাওয়াই ভালো—এমন ভাবে সবার সামনে নিজেকে ধরা দিতে পারবো না।

সবে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি, হঠাৎ একটা শব্দ শুনলাম ঘরের ভিতর থেকে। নিশ্চয়ই ও বাইরে আসছে—আবার যেন সাহস ফিরে এলো—এগিয়ে গেলাম দরজার সামনে—

খুলে গেল দরজা—বেরিয়ে এলো বেটিনা নয়—কাডিয়ানী—

আমাকে সামনে দেখেই প্রথমটা চমকে উঠলো, পরক্ষণেই আমার পেটের উপর সজোরে এমন লাথি মারলো যে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম বাইরে—তুষারপাতের মধ্যে। আর কর্ডিয়ানী দ্রুতপদে ঢুকে গেল ওদের তিন জনের সেই নির্দিষ্ট ঘরটাতে, আর ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলে।

আমিও উঠে পড়লাম ঝেড়েঝুড়ে—পাগলের মত ছুটে গেলাম বেটিনার ঘরের দিকে, এর সমস্ত শোধ ওর উপর তুলতে।

কিন্তু দরজা বন্ধ হয়ে গেছে ততক্ষণে। দিগবিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে সজোরে এক লাথি মারলাম দরজায়···দরজা খুললো না। শুধু কুকুরটা

আচমকা শব্দে জেগে উঠে তারস্বরে চীৎকার জুড়ে দিলে। ছুটে পালিয়ে এলাম উপরে। ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে কম্বলের তলায় ঢুকে বালিসে মুখ গুঁজে পড়ে রইলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় আর অপমানের বেদনায় আমি তখন অর্ধমৃত।

এমন শোচনীয় ভাবে প্রতারিত, লাঞ্ছিত, পরাজিত হ'তে হোলো? সুদীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা কেটে গেলো মনের আগুনে জ্বলে জ্বলে। চরম প্রতিশোধ নেবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞা করলাম। উঃ! শেষে জয়ী হোলো কার্ডিয়ানী। আর আমি কি না তার করুণার, তার উপহাসের পাত্র হলাম? সে যে কী কষ্টকর, কী জ্বালাভরা অনুভূতি; সে সময় ওদের দু'জনকেই বিষ খাওয়াতে পারতাম একটুও দ্বিধা না করে। প্রতিশোধ নেবার জন্যে পাগল তখন আমি। কত উপায়ই না মাথায় এলো—একবার ভাবলাম দিই জানিয়ে সব কীর্তি ওর দাদাকে।

সবই কেবল অপরিণত দুর্বল মনের ভীরু চিন্তা। মাত্র বারো বছর বয়স তখন আমার। এসব বিষয়ে না ছিলো কোনো ধারণা না ছিলো কোনো অভিজ্ঞতা—কোথায় পাবো পরিণত মনের সেই ধৈর্য, সেই সংযম যাতে আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখে 'বীরে'র মত প্রতিশোধ নেওয়া যায়?

মনের এই উন্মত্ত অবস্থায় হঠাৎ কানে গেলো বেটিনার মায়ের তীব্র আর্তনাদ—বেটিনা নাকি মারা যাচ্ছে। রাগের জ্বালায় মনে হোলো আমার সঙ্গে একটা বোঝাপাড়া হবার আগেই ও মরে যাবে? তখনি উঠে পড়ে এক ছুটে নীচে নেমে এলাম। বাবার খাটের উপর বেটিনা শুয়ে আছে—প্রবল স্নায়বিক আক্ষেপে ছটফট করছে, অর্ধ আবৃত অবস্থা, একবার এপাশ একবার ওপাশ করছে—চেপে

ধরতে গেলে এমন ভাবে লাথি, ঘুঁষি ছুড়ছে যে, কাছে এগোয় কার সাধ্য।

চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—সেদিনের সেই অপরিণত বয়সের সরল বুদ্ধিতে এই মূকাভিনয়কে যে কি বলবো বুঝতে পারলাম না—তখনও মনের ভেতর কাঁটার মত বিঁধে আছে গত রাতের স্মৃতি।

অবশ্য মনে মনে আশ্চর্য হলাম নিজের এই আত্মসংযমে! যে দুজনের একজনকে অপমানিত আর অন্যজনকে খুন করবার জন্যে আমার হাত নিসপিস করছে, তাদের দুজনকেই হাতের এত কাছে পেয়েও নীরব দর্শকের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম তো!

প্রায় ঘণ্টাখানেক ধস্তাধস্তি করার পর বেটিনা ঘুমিয়ে পড়লো। ঠিক সেই সময় ঘরে ঢুকলেন ডাঃ অলিভো একজন ধাত্রীকে সঙ্গে নিয়ে। ধাত্রীটি সব দেখে শুনে বললে এ হিষ্টিরিয়া ছাড়া আর কিছুই নয়—কিন্তু ডাঃ অলিভো সেকথা মানলেন না—সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর ঠাণ্ডা জলে স্নানের ব্যবস্থা করে চলে গেলেন। আর আমি দুজনের মন্তব্য শুনলাম আর মনে মনে খুব হাসলাম। আমি তো জানি, অন্ততঃ আমার ধারণা ছিলো তাই, যে আমিই একমাত্র জানি এ রোগের মূল কারণটি কি?

গত রাত্রের অনিদ্রা আর ক্লান্তি তো আছেই তার উপর আমার কাছে কাডিয়ানীর ধরা পড়ে যাওয়ার আতঙ্কই কি কম? যার জন্যেই হোকগে যাক ওর এই অবস্থা—আমি আপাতত ডাঃ গাৎসির না আসা অবধি প্রতিশোধটি মুলতুবী রাখলাম। আমার ধারণা ছিলো না যে অমন ভীষণ হিষ্টিরিয়ার ফিটের ভান বেটিনা করতে পারে এমন

নিখুঁত ভাবে। ওকে দেখলে ধারণা করা যায় না অত জোর আছে ওর।

ওপরে নিজের ঘরে ফিরে যাবার সময় বেটিনার ঘরের ভিতর দিয়ে আমায় আসতে হোলো। যেতে গিয়ে দেখি ওর বিছানার উপর ছোট্টো পকেট বইটা পড়ে আছে। চট করে তুলে নিলাম—কি লেখা আছে পড়বার লোভ সামলাতে পারলাম না। ওর সঙ্গে দেখি একটুকরো কাগজও রয়েছে, তা'তে কাডিয়ানীর হাতের লেখা মনে হলো—সোজা তুলে নিয়ে ঘরে চলে এলাম। নির্জন অবসরে বসে পড়তে হবে।

অবাক হলাম আমি অতটুকু মেয়ের অত সাহস দেখে। সহজেই তো মায়ের চোখে ঐ কাগজের টুকরোটা পড়তে পারতো। আর তিনি নিজে না পড়তে পেরে সোজা নিয়ে যেতেন ছেলের কাছে পড়ে দেবার জন্যে। আমার মনে হলো নিশ্চয়ই বেটিনার মাথার ঠিক ছিল না, কিন্তু চিঠিটা পড়ে আমার মাথার ঠিক ছিলো কি ?

"যখন তোমার বাবা এখানে থাকবেন না তখন তো আমি ইচ্ছে করলেই যখন হোক আসতে পারি। তুমি ঘরের দরজটা খুলে রেখো, তাহলে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না। রাতে খাবার পর আমি এই ছোট্টো ঘরটায় লুকিয়ে থাকবো"—

মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হোয়ে পর মুহূর্তেই হেসে উঠেছিলাম—ইশ কি বোকাই না বনেছি আমি। যাক্ ভালবাসার নেশা থেকে রেহাই পেলাম। সারা জীবনের মত শিক্ষা হলো ভেবে নিজেকেই নিজে ধন্যবাদ দিলাম। এমন কি এত দূরও মনে হলো যে, বেটিনা ঠিকই করেছে কার্ডিয়ানীকে বেছে নিয়ে—হাজার হোলেও ওর বয়স পনেরো আর আমি তো নিতান্তই একটা বালক। সেই সঙ্গে একথাও

মনে হোলো যে আমাকে লাথি মারার প্রতিশোধ কার্ডিয়ানীর উপর তুলবোই।

দুপুর বেলা অসম্ভব ঠাণ্ডার জন্যে রান্নাঘরের টেবিলে সবাই মিলে খেতে বসেছিলাম। এমন সময় আবার বেটিনার ফিট সুরু হোলো। সবাই ছুটলো ওর পরিচর্যায়—আমি ছাড়া। ধীরে সুস্থে খাওয়া দাওয়া সেরে আমি সোজা উঠে এলাম ঘরে পড়তে বসবার জন্য।

রাতে খাবার সময় দেখলাম ওরা বেটিনার বিছানাটা রান্নাঘরেই টেনে এনেছে যাতে সব সময় মা ওকে দেখাশোনা করতে পারেন। তা ছাড়া সাধারণত উনি রান্না ঘরেই শুতেন। এসবে আমি নজরও দিলাম না, এমন কি রাতে, আর পরদিন সকালে আবার যখন বেটিনার হিষ্টিরিয়ার চীৎকার শুনলাম তখনও তাতে কান দিলাম না।

সেইদিনই সন্ধ্যায় ডাঃ গাৎসি ফিরে এলেন। মনে ভয় ছিলো বৈকি কার্ডিয়ানীর—তাই এবার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে, আমি কি করবো ঠিক করেছি—আমি কলমকাটা ছুরীটা নিয়ে ওকে এমন তাড়া করলাম ও ছুটে পালিয়ে গেলো।

না—ওদের কুৎসা রটিয়ে বেড়াবার কোনো ইচ্ছাই আর আমার ছিল না—সে প্রচণ্ড বিদ্বেষ তখন শান্ত হয়ে গেছে।

পরদিন ভোরবেলা আমাদের পড়ানোর মাঝখানে হঠাৎ এসে মা ডাকলেন গাৎসিকে। অনেক ভূমিকা করার পর বললেন যে ওঁর বিশ্বাস বেটিনার এই অসুখের মূল হলো ওর উপর ডাইনীর দৃষ্টি পড়া—আর ডাইনী যে কে তাও জানেন

—"হতে পারে, কিন্তু মা ভুল করছো না তো? কাকে সন্দেহ করছো তুমি?"

—"পুরানো ঝিটাকে। হাতে হাতে প্রমাণও পেয়েছি আমি"—

—"কি রকম ?"

"—আমার ঘরের দরজায় দুটো ঝাঁটাকে ক্রশ চিহ্নের মত করে পথটা এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যে, ঢুকতে হলে ঝাঁটা দুটোকে সোজা করে তবে ঢুকতে হবে। কিন্তু ঝিটা ওই দেখে আর ঢুকলো না, সরে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে এলো—তবে ? ডাইনীই যদি না হবে তবে ঝাঁটা সোজা করে এলো নাই বা কেন ?"

—"তার কোনো মানেই নেই মা—আচ্ছা ডাকো তো ওকে ?" —ঝি আসতেই জিজ্ঞাসা করলেন,—"যে দরজা দিয়ে রোজ ঢোকো, সে দরজা দিয়ে আজ তুমি ঢোকনি কেন ?"

—"আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না তো।"

—"দরজার উপর সেণ্ট এণ্ড্রুজের ক্রশ চিহ্ন কি দেখনি ?"

—"কি রকম ক্রশ সেটা ?"

—"না বোঝার ভান করিস্ না"—ধমকে উঠলেন মা—"গত বৃহস্পতিবার রাত্রে কোথায় শুয়ে ছিলি ?"

—"আমার বোনঝির বাড়ি তার ছেলে হলো কি না"—

—"সে আমার খুব জানা আছে কোথায় গিয়েছিলি, আসলে তুই একটা ডাইনী, মেয়েটার উপর তোরই দৃষ্টি লেগেছে"—

ঝিটা একথায় ক্ষেপে গিয়ে ওঁর মুখে থুথু ছুঁড়লো। রাগে দিশাহারা হয়ে মা ছুটলেন লাঠি আনতে ডাঃ গাৎসি তাড়াতাড়ি উঠে মাকে থামাতে গেলেন, তারপর ঝিটার দিকে এগোবার আগেই সে উর্ধ্বশ্বাসে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে প্রাণপণ চেঁচিয়ে প্রতিবেশীদের ডাকতে সুরু করলে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে ওকে ধরে এনে হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে তবে ঠাণ্ডা করা গেল।

এই সব কাণ্ডকারখানা আর কেলেঙ্কারীর পর ডাঃ গাৎসি উঠে নিজের ধর্মযাজকের পরিচ্ছদ পরে বেটিনার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তাকে ঝেড়ে দেবার জন্যে। সত্যিই যদি কোনো দুষ্ট আত্মা ভর কোরে থাকে ওর উপরে। এই সব নতুন নতুন অদ্ভুত ব্যাপার কিন্তু সেদিন আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলো—যদিও বেটিনার উপর ভূতের ভর হয়েছে ভাবতে খুবই মজা লাগছিলো।

বিছানার ধারে আমরা যখন গেলাম তখন বেটিনার নিঃশ্বাস পড়ছে কি না বোঝাই যাচ্ছিল না। যাজক দাদার ঝাড়ফুঁকেও কিছু মাত্র উন্নতি দেখা গেল না। ডাঃ অলিভো এই সময় এসে পড়েছিলেন। ঐ সব ব্যাপার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন ওঁর আর থাকার প্রয়োজন আছে কি না? বলা হলো ওঁর যদি বিশ্বাস থাকে তবে থাকতে পারেন। বলা বাহুল্য উনি বিদায় নিলেন, বলে গেলেন টেষ্টামেণ্টের বাইরে কোনো অলৌকিক ব্যাপারই তিনি বিশ্বাস করেন না।

কাজ সেরে ডাঃ গাৎসি যখন নিজের ঘরে চলে গেলেন—সে সময় বেটিনার কাছে আমি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় প্রাণী ছিলো না। সেই সুযোগে চট করে বিছানার কাছে গিয়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে ফিশফিশ করে বললাম—"ভয় পেও না, সহজ হয়ে সেরে ওঠ। আমি মুখ বন্ধ করেই আছি। কাউকে কোন কথা বলে দেবো না। কোন ভয় নেই তোমার"—

বেটিনা ধীরে ধীরে মাথাটা আমার দিকে ফিরিয়ে চুপ করে চেয়ে রইল। একটি কথাও বললে না। কিন্তু সে রাতে ও ভালই ছিলো, আর ফিট হয় নি।

মনে করেছিলাম আমি বুঝি ওকে সারিয়েই তুললাম। কিন্তু পরদিন আবার ফিট সুরু হলো, সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক আর লাটিন ভাষায়

অনর্গল অসংলগ্ন প্রলাপ। নিশ্চয়ই ওকে কোনো খারাপ আত্মায় পেয়েছে, এ বিষয়ে কারো আর কোনো সন্দেহ রইলো না। মা বেরিয়ে গেলেন আর ঘণ্টাখানেক পরে এক অত্যন্ত কুৎসিত ভদ্রলোককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। তিনি নাকি পাডুয়ার বিখ্যাত রোজা—ফাদার প্রস্পেরো দ্য' ভভোলেণ্টো।

রোজাকে দেখেই বেটিনা চীৎকার করে হেসে উঠলো। পরক্ষণেই অশ্রাব্য ভাষায় অনর্গল গালি দিতে লাগলো তাঁকে। যারা দাঁড়িয়েছিলো সবাই ভাবলে যাক্, এতক্ষণে টাকা খরচ করা সার্থক হলো, রোগ ঠিক ধরা পড়েছে—ও কোনো দুষ্ট আত্মা ছাড়া কিছুই নয়, নইলে রোজাকে অমন করে গালাগাল দেবার সাহস কি মানুষের হয়?

মূর্খ, পরচর্চাকারী, ইতর ইত্যাদি বিশেষণে অভিষিক্ত হতে হতে হঠাৎ ফাদার প্রস্পেরো তাঁর হাতের কাঠের ক্রশ দণ্ডটা নিয়ে বেটিনাকে মারতে সুরু করলেন। বললেন বেটিনা নয় এ মার খাচ্ছে ওর ভিতরের শয়তান আত্মাটা। হঠাৎ এক সময় থেমে গেলেন মারতে মারতে—যেই দেখলেন ওঁর মাথাটা তাক করে বেটিনা ঘরে রাখা প্রস্রাবের জায়গাটা তুলে ধরেছে—আর তারস্বরে গালি দিচ্ছে—"গাধা কোথাকার—কথায় হারাতে না পেরে মারতে এসেছো? আমার ঘাড়ে কোনো শয়তানই চাপেনি—অসভ্য, ছোটলোক, চাষা, ভদ্র ব্যবহার করতে না পারো তো দূর হয়ে যাও"—

চেয়ে দেখলাম ডাঃ গাৎসির মুখ লাল হয়ে উঠেছে। কিন্তু বেটিনার রোজার তা'তে কিছুই এসে যায়নি। নিরাপদ দূরত্ব রেখে তিনি ততক্ষণ ভূত ঝাড়া মন্ত্র পড়া সুরু করেছেন। শেষে এক সময় সেই দুষ্ট আত্মাকে তার নাম বলতে আদেশ করলেন—

—"আমার নাম বেটিনা।"

—"না। সে নাম হলো খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা একটি বালিকার"—

—"তা হলে শয়তানটাও হলো একটি বালিকা—যে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিতা হয়নি। শোনো—মূর্খ রোজা এটুকু জানো না যে, শয়তানের কোনো লিঙ্গভেদ নেই? তোমার যখন বিশ্বাস যে আমার মুখ দিয়ে শয়তানটাই কথা বলছে, তবে তার প্রশ্নের যদি ঠিক ঠিক উত্তর দাও তবেই শয়তানটা বেরিয়ে আসবে—"

—"বেশ, আমি কথা দিচ্ছি—"

—"তুমি কি নিজেকে আমার চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান মনে কর?"

—"না, তবে আমি নিজেকে তোমার চেয়ে শক্তিমান মনে করি এইজন্যে যে, আমি ঈশ্বরের নাম করেছি আর এই পবিত্র পরিচ্ছদ পরেছি তাই—"

—"বেশ, বেশী শক্তিশালী যদি তবে আমার এই সত্যি কথাগুলো বলা থামাতে পারো কিনা দেখি—তোমার যত গর্ব সব তো ঐ দাড়িটি নিয়ে—দিনে দশবার তো ওটা আঁচড়াচ্ছো। আমাকে এর দেহ ছেড়ে বার করবার জন্যে ঐ দাড়ির একটা চুলও কি ছিঁড়তে পারবে, উঁহু অতখানি ত্যাগ তোমার পক্ষে সম্ভবই নয়। আচ্ছা ঐ দাড়িটা যদি কামিয়ে ফ্যালো, তবে আমি ঠিক বেরিয়ে যাবো—"

—"মিথ্যাবাদী, কি শাস্তি করি তোর দ্যাখ—"

—"আমি একটুও মানি না তোমাকে—"

বলার সঙ্গে সঙ্গে বেটিনা এমন উদ্দাম হাসিতে ফেটে পড়লো যে, থাকতে না পেরে আমিও হেসে উঠলাম। রোজা তৎক্ষণাৎ ডাঃ গাৎসির দিকে ফিরে বললেন, আমার মত অবিশ্বাসীর থাকা চলবে না ঘরে। একথা সত্যি স্বীকার করেই বেরিয়ে এলাম।

আর সেই মুহূর্তেই দেখলাম বেটিনা রোজার প্রসারিত হাতখানির উপর সজোরে থুতু ছুঁড়লো, এ দৃশ্যে কি আনন্দই না পেলাম।

সেদিন ফাদার প্রম্পেরো খেতে বসে অনর্গল বাজে কথা বকে গেলেন। পরে বেটিনাকে আশীর্বাদ জানাবার জন্যে ওর ঘরে ঢুকলেন। ওকে দেখেই বেটিনা গ্লাসে ভরা কালো রঙের কি একটা তরল পদার্থ ছুঁড়ে মারলো ওঁর মুখে। ঠিক পাশেই কাডিয়ানী দাঁড়িয়েছিলো, তার গায়েও বেশ খানিকটা লাগলো। আর এইসব দেখে আমি একেবারে খুশীতে ফেটে পড়লাম। এবার বিদায় নিলেন ফাদার প্রম্পেরো। যাবার আগে বলে গেলেন অন্য রোজা ডাকতে—কারণ দেখাই যাচ্ছে ঈশ্বর চান না যে ওঁর হাতে শয়তানের মুক্তি ঘটে।

উনি চলে যাবার পর থেকেই বেটিনা স্বাভাবিক সুস্থ হোয়ে উঠলো, এমন কি, রাত্রে আমাদের সঙ্গে খেতেও বসলো। মাকে বাবাকে বরাবর আশ্বাস দিলে এখন আর কোনো কষ্ট নেই, বেশ সুস্থ বোধ করছে। আমার দিকে ফিরে বললে ভোরে আসবে আবার আমার চুল আঁচড়ে দিতে। আর রাতে নিজের হাতে সাজিয়ে দেবে মেয়েদের পোষাকে নাচের জলসায় যাবার জন্য। ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আপত্তি করলাম, রুগ্ন দেহে বিশ্রামের প্রয়োজনই বেশী ওর। কিছু না বলে সকাল সকাল উঠে ও শুতে চলে গেল। একটু পরে আমরাও উঠলাম। ঘরে গিয়ে শোবার আয়োজন করছি, দেখি, একটুকরো কাগজ পড়ে আছে তুলে নিলাম —লেখা আছে—

"হয় আমাকে তোমাকে নিজের হাতে সাজিয়ে দিতে দেবে আর নাচের জলসায় আমার সঙ্গে আসবে—নইলে যা দেখাবো তাতে তোমাকে কাঁদতে হবেই—"

চিঠিখানা নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। ডাঃ গাৎসির ঘুমিয়ে পড়ার পর উঠে এসে একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখলাম—

"ভালোবাসি তোমাকে—ভালোবাসি সহোদরা বোনের মতই। বেটিনা, আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি, আমি চাই সব ভুলে যেতে। একটা চিঠি এইসঙ্গে ফিরিয়ে দিচ্ছি—জানি ফিরে পেয়ে তুমি কত নিশ্চিন্ত, কত খুসী হবে। এ চিঠি পকেট বইয়ের সঙ্গে বিছানায় ফেলে গিয়ে কতখানি বিপদের ঝুঁকি নিয়েছিলে বলো তো? ফিরিয়ে দিলাম—

এইসঙ্গে প্রমাণও দিলাম না কি—আমি তোমার বন্ধু—"

বন্ধু বই কি!

আজও সে বন্ধুত্বের স্মৃতি সগৌরবে বহন করছি—তিনটি ক্ষতচিহ্নে। সেই রাত্রেই প্রবল জ্বরের আক্রমণে বেটিনা আবার শয্যা নিল। দেখতে দেখতে বসন্তের গুটিতে ছেয়ে গেল ওর সারা দেহ। সব অভিমান, সব ভয় তুচ্ছ করে সেদিন ওর বিছানার পাশে এসে বসলাম। ওর রোগক্লান্ত দিনগুলিকে ভরে তুললাম—আশা আর আশ্বাসে, সেবা আর সাহচর্যে······

সেই সেবার স্বাক্ষর অক্ষয় হোয়ে রইলো আমার দেহে—তিনটি ক্ষতচিহ্নে।

কিন্তু যাক সে কথা, বছরের পর বছর ঢেউএর পর ঢেউএর মত এসে কত দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে সেই সব দিনগুলিকে······

তখন কে-ই বা জানতো একদিন স্বামীর নিষ্ঠুর অত্যাচারে, দারিদ্রের পেষণে রোগগ্রস্তা অকালবৃদ্ধা বেটিনা ফিরে আসবে শৈশবের সেই গৃহটিতে···আর, আর আমারই এই দুটি বাহুর আশ্রয়ে শেষ নিঃশ্বাস ফেলবে কিন্তু সেও তো অনেক পরের কথা—

আগেই বলেছি ছাত্র হিসাবে মেধাবী ছিলাম—তাই ষোলো বছরেই 'ডক্টর অব ল' ডিগ্রী পেলাম। আমি কিন্তু নিজে চেয়েছিলাম চিকিৎসক হোতে। তার বদলে আমাকে জোর করে আইন পড়ানো হোলো। আইন পড়ার উপর আমার আজন্মের বিতৃষ্ণা। কিন্তু মা আমার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, আমাকে এডভোকেট তৈরী করবেনই। দিলেই হোতো আমাকে আপন রুচিতে চলবার অধিকার—ফলে না হোলো এদিক না হোলো ওদিক। সারাজীবনে ছুটোর একটাও কাজে লাগাতে পারিনি। অবশ্য ও ছুটোরই কাজ একই। আইন ঘর গড়ার চেয়ে ঘর ভাঙ্গেই বেশী। আর ডাক্তারী—রোগীকে নিরাময় করার চেয়ে রোগীকে মারেই বেশী।

যাই হোক, এদিকে ছাত্রজীবনের দোষগুলিও বেশ রপ্ত করে নিয়েছিলাম। সহপাঠীদের কাছে দৈন্য প্রকাশের ভয়ে অবস্থার অতিরিক্ত খরচ করতাম। সে সময় ভেনিসে ছাত্রদের নানা রকম স্বাধীনতা আর সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ছিলো।

বাহ্যিক আড়ম্বর আর বেশী দিন চললো না। শীগগিরই সর্বস্বান্ত হোলাম। তখন জামা-কাপড় অবধি বাঁধা রেখে ঠাট বজায় রাখার চেষ্টা চললো—কিন্তু সেই বা ক'দিন! দিশাহারা অবস্থায় দিদিমাকে লিখলাম টাকা পাঠাতে। কিন্তু টাকার বদলে দিদিমা নিজে এসে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে গেলেন। অবশ্য যাবার আগে ডাঃ গাৎসিকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিতে ভোলেননি। ডাঃ গাৎসি আমাকে দিলেন অজস্র অশ্রুসিক্ত আশীর্বাদ। পাদুয়াতে এই শেষ নয়, ভবিষ্যতে যখনই এসেছি আতিথ্য নিয়েছি ডাঃ গাৎসির স্নেহের আশ্রয়ে।

দিদিমা যখন মারা গেলেন আমি তখন ভেনিসে। শেষের দিকে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন—আমিও এক মুহূর্তের জন্যও কাছছাড়া হইনি।

দিদিমাকে বড় ভালবাসতাম। জ্ঞান হোয়ে অবধি ওই স্নেহের ছায়ায়ই তো গড়ে উঠেছি। কিন্তু মৃত্যুকালে একটি কপর্দকও রেখে যাননি—তার আগেই যা কিছু সঞ্চয় নিঃশেষিত হোয়েছিলো আমার পিছনে। মা তখন ছিলেন সেণ্ট পিটার্সবার্গে। মাসখানেক পরেই মায়ের চিঠি পেলাম। লিখেছেন, ভবিষ্যতে ভেনিসে তাঁর ফিরে আসার কোনোই সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি ভেনিসের বাড়ি বিক্রী করে দিতে চান। এ বিষয়ে আবে গ্রিমানীকেও তিনি জানিয়েছেন। আর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর মতানুসারে চলতে। আসবাব-পত্র বিক্রী করে দেবার ইচ্ছা জানিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে আমার লেখাপড়ারও যাতে ক্রুটি না হয়, সে ব্যবস্থা করার জন্যও তাঁকে জানিয়েছেন।

চিঠি পেয়েই ছুটলাম আবে গ্রিমানীর কাছে। জানালাম, তাঁর আদেশ আমার শিরোধার্য।

কিন্তু বিচিত্র এই মন! যেই মনে হোলো এখন থেকে আমি গৃহহারা হোলাম, এমন কি পুরানো স্মৃতিজড়ানো আসবাব-পত্রও বিক্রী হোয়ে যাবে, তখন কি যেন আক্রোশ পাগলামির মত আমার ঘাড়ে চাপলো। নিজেই সব বিক্রী করতে লাগলাম, অন্যের হস্তগত হবার আগেই। কাপড়-জামা, বাসন-কোশন, সৌখান টুকিটাকি থেকে সুরু করে বিছানা-পত্র, আয়না অবধি। কেমন যেন মনে হোতে লাগলো আমাদেরই অধিকার এই সব পৈত্রিক সম্পত্তিতে, মায়ের কোনো অধিকার নেই তাই থেকে বঞ্চিত করার।

মাস চারেক পর ওয়ার শ' থেকে মায়ের আবার চিঠি পেলাম। লিখেছেন—'এখানে একজন আছেন, যখনই তিনি আসেন আমার তোমার কথাই মনে হয়। আমি বছরখানেক আগে তাঁকে বলেছিলাম,

আমার একটি ছেলে আছে—ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত হবার জন্যেই যেন তার জন্ম, কিন্তু আমার এমন ক্ষমতা নেই যে তাকে কোনো গির্জ্জায় কাজে লাগাই। তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন তোমার সম্বন্ধে রাণীকে অনুরোধ করবেন, তাঁর মেয়ে নেপল্‌স্‌-এর রাণীকে তোমার বিষয় জানাতে। তাঁর কথা তিনি রেখেছেন, এখন ভেনিস হোয়ে ক্যালাব্রিয়াতে ফেরার পথে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন—ওখানে যাজকের কাজে তোমাকে নিযুক্ত করবেন। ওঁর করুণায় ভবিষ্যতে তুমি অনেক বেশী পদমর্যাদাও পেতে পারো। ভাবো তো, মায়ের কি আনন্দ ছেলেকে ধর্মযাজকরূপে দেখতে পেলে? এই সঙ্গে উনিও তোমাকে একটি চিঠি দিচ্ছেন। যত দিন না তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, তত দিন আবে গ্রিমানীই তোমার দেখা-শোনা করবেন…'

চিঠি দু'খানা পেয়ে সত্যিই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলাম। এবার বিদায়—ভেনিস বিদায়। সামনে স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ! আর যেন এক মুহূর্তও দেরী সহ্য হচ্ছিল না। সেই আনন্দের উত্তেজনায় দেশ ছেড়ে যাওয়ার বেদনা বিন্দুমাত্রও অনুভব করি নি সেদিন।

কিন্তু অপেক্ষা করতেই হোলো বেশ কিছু দিন। আর তারই মধ্যে আমার উপর দিয়ে বেশ কিছু ঝড়-ঝাপটা বয়ে গেল—বিনা অনুমতিতে সব বিক্রী করার ফল, অভিভাবকের অসন্তোষ, নানা চক্রান্ত ইত্যাদি……

শেষে একদিন আবে গ্রিমানী খবর দিলেন ধর্মযাজকটি এসে পৌঁছেছেন। তখনি গেলাম তাঁর কাছে। সুদর্শন তরুণকান্তি—বয়স বছর চৌত্রিশের বেশী নয়। পরিচয়ের পর উনি জানালেন এখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। আমি যেন ওঁর সঙ্গে

রোমে গিয়ে দেখা করি। দীর্ঘ তিনটি ঘণ্টা ধরে আমাকে অজস্র প্রশ্ন করলেন সেদিন। কিন্তু স্পষ্টই বুঝতে পারলাম আমার উত্তর ওঁকে সন্তুষ্ট করেনি মোটেই—কিন্তু আমার ভারী ভালো লেগেছিলো।

যাই হোক, এই পরিচয়ের দু'দিন পরেই আমি যাত্রা করলাম—পকেটে মাত্র বিয়াল্লিশটি টাকা। কিন্তু সাহসের একটুও অভাব ছিল না মনে। পথে নিজের স্বভাব দোষে আর কয়েকটি জুয়াচোরের পাল্লায় পড়ে সর্বস্বান্ত হলাম। কিন্তু পরোয়া না করে হাঁটা পথেই পাড়ি দিলাম। অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতার শেষে এসে পৌছলাম চিরগৌরবময়ী নগরী রোমেতে। পকেট শূন্য থাকলেও রোমের সৌন্দর্য আমার মন দিয়েছিলো পূর্ণ করে। কিন্তু চোখের পিপাসা মেটানোর আগেই সোজা গেলাম ধর্মযাজকের খোঁজে। হা হতোঽস্মি! কোথায় তিনি? শুনলাম আগেই চলে গেছেন রোম ছেড়ে, তবে আমার জন্য নেপল্‌সে পৌছবার পাথেয় আর পথের নির্দেশ রেখে গেছেন। পরদিনই একটা গাড়ী ছাড়বে জেনে প্রথমেই তাইতে যাবার ব্যবস্থা করলাম—রোমের সৌন্দর্যের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে। কিন্তু দুর্ভোগের শেষ তখনও হয়নি। ৬ই সেপ্টেম্বর নেপল্‌স পৌছলাম—শুধু জানতে পারলাম, তিনি আগেই চলে গেছেন মার্টোরানোতে। আমার সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা দূরে থাক একটি কথাও কাউকে বলে যাননি। আজও মনে পড়ে সেদিন সেই বিশাল নগরীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজেকে কি ভীষণ একাকী অসহায়ই না মনে হোয়েছিল। কিন্তু, মনের জোর ফিরতেও দেরী হয়নি। ঠিক আছে মার্টোরানো—বেশ মার্টোরানোই সই। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হলে আমাকে ওখানে পৌছতেই হবে—নাই বা থাকলো পাথেয়···নাই বা রইলো পরিচিত আত্মজন। মাত্র দু'শো মাইল পথ

—গাড়ীতে যাওয়া? শূন্য পকেটে? সে তো দুরাশা! হাঁটা পথেই আবার পাড়ি জমালাম।

অনেক ঘটনা আর দুর্ঘটনা, অনেক বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর ক্যালাব্রিয়াতে এসে পৌঁছলাম। সেখান থেকে ছোটো একটি গাড়ীতে সোজা মার্টোরানো। পথের অভিজ্ঞতায় তখন সঞ্চয়ও কিছু হোয়েছে বৈ কি!

অবশেষে সেই ধর্মযাজকের খোঁজ মিললো। তাঁর নাম হোলো বানার্ড ছ বার্নাডিস। ঘরের ভিতর ছোট্টো নড়বড়ে একটা টেবিলে বসে কি লিখছেন। আমি ঢুকেই প্রচলিত রীতি অনুসারে নতজানু হোলাম। উনি তাড়াতাড়ি এসে আমাকে উঠিয়ে আশীর্বাদ জানালেন। পথের দুরবস্থার কথা শুনে ব্যথিত যেমন হোলেন—সব বাধা কাটিয়ে নিরাপদে এসেছি এমন কি কোথাও ধার দেনা কিছুই রাখিনি শুনে তেমনি খুশীও হোলেন।

বাড়িখানা বেশ বড়। কিন্তু ঐ পর্যন্তই, তাছাড়া যেমন অপরিচ্ছন্ন তেমনি অব্যবস্থা। বিশেষ করে খাওয়া দাওয়া তো জঘন্য। তেলটা অবধি কটুগন্ধে ভরা। সেদিনই আবার উপবাসের দিন ছিলো। কিন্তু যাজকটি শুধু বিচক্ষণ নন অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন। বাড়ির বিশৃঙ্খলায় অত্যন্ত বিচলিত, আর অপ্রস্তুত হোয়ে উঠলেন। আমাকে নিজের বাড়িতে তুলে আমার উপকারের বদলে অপকার করলেন কি না, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করলেন।

আমাকে বললেন, এত দুরবস্থা সত্ত্বেও ওর একমাত্র সান্ত্বনা যে উনি মঠের সন্ন্যাসীদের কবল থেকে পালিয়ে আসতে পেরেছেন। ওদের নির্যাতনে পনেরোটি বছর ওঁকে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হোয়েছে।

পরদিন একটি উপাসনা-সভায় ধর্মযাজকের আসন উনি নিলেন। আমিও ছিলাম সঙ্গে। সেই সভাতে শহরের সমস্ত গণ্যমান্য, বিশিষ্ট ব্যক্তি আর সমস্ত যাজকরাই উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমার জীবনে আমি ভণ্ড আর ইতরদের এতবড় সমাবেশ আর দেখিনি! মহিলারাও যেমন বীভৎস নির্লজ্জ পুরুষেরাও তেমনি মূর্খ অথচ অশ্লীল, কুৎসিতভাবাপন্ন। বাড়ি ফিরে এসে আমি বললাম যে, আমাকে ক্ষমা করবেন এই জায়গায় জীবন কাটাবার ইচ্ছা আমার আদপেই নেই। আশীর্বাদ করুন, আমি তাই মাথায় নিয়ে বিদায় হই। কিম্বা আপনিও আমার সঙ্গে আসুন। আমি কথা দিচ্ছি অন্য কোথাও গিয়ে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের ভাগ্য ফেরাতে পারবো।

কিন্তু এই কথায় ওঁর এত মজা লাগলো যে শুনেই সশব্দে হেসে উঠলেন। শুধু তাই নয়, সারাদিন ধরেই মাঝে মাঝে কথাটা মনে পড়লেই হেসে উঠতে লাগলেন। কিন্তু সেদিন আমার কথাটা মেনে নিলে মাত্র দু'বছর পরেই ওঁকে জীবনের মধ্যপথেই যবনিকা টানতে হোতো না। আমাকে এখানে ডেকে এনে যে ভুল করেছেন সে কথা স্বীকার করলেন। আর ওঁর হাতে কিছু না থাকাতে (যদিও তখন ওঁর বাৎসরিক আয় হোলো দু'হাজার ফ্রাঙ্ক) আর আমাকেও কপর্দকহীন ভাবার জন্যে একখানি পরিচয়-পত্র দিলেন নেপলসে ওঁর এক বন্ধুর কাছে। আর তাতে নির্দেশ ছিলো আমাকে ষাটটি মুদ্রা দেবার জন্য।

১৭৪৩ সাল। ১৬ই সেপ্টেম্বর নেপল্‌স্‌-এ পৌঁছলাম। পৌঁছেই প্রথম গেলাম চিঠির মালিকের কাছে। সৌভাগ্য আমার! শুধু টাকা দিয়েই ক্ষান্ত হোলেন না তিনি, আমাকে ওঁর ছেলের সঙ্গী

করে নিয়ে বাড়িতেই রাখলেন যাবতীয় খরচপত্র শুদ্ধ। ওঁদের সঙ্গেই দেশভ্রমণে বেরিয়ে আবার এসে পৌঁছলাম রোমে। আমার কল্পরাজ্য রোম!

কিন্তু এবার সেই গৌরবময়ী নগরীতে পথক্লান্ত, হতশ্রী, নিঃস্ব পথিকের বদলে এসে দাঁড়ালো বেশেভূষায়, অর্থে সামর্থে, বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সম্পূর্ণ বিভিন্ন জন। শুধু অর্থ নয় কিঞ্চিৎ রত্নেরও অধিকারী তখন আমি, আর সঙ্গে বেশ কয়েকটি মূল্যবান পরিচয়-পত্র। তাছাড়া আমার চেহারাটায় এমন একটা বনেদীয়ানার ছাপ ছিলো যাতে সহজেই অন্যের দৃষ্টি আর সম্ভ্রম আকর্ষণ করতাম। আমার ধারণা ছিলো রোম এমন জায়গা যে, এখানে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায় সুরু করলেও শেষে সব সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়।

রোমের বহু বিখ্যাত, সম্ভ্রান্ত, ব্যক্তিদের নামে আমার কাছে পত্র ছিল। তার মধ্যে বিখ্যাত ধর্মযাজক ফাদার জর্জের নামেও ছিলো। স্বয়ং পোপও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা আর ভক্তি করতেন। তাছাড়া ছিলো পোপের মন্ত্রিসভার সভ্য—'কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভার নামে। সে সময় তাঁর মত ক্ষমতাশালী রোমে আর দ্বিতীয় ছিল না বললেই চলে। পরিচয় পাবার পর আমাকে তিনি বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করলেন। কথাপ্রসঙ্গে যখন শুনলেন যে পোপের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার এখনও ঘটেনি, তখন নিজেই তার ব্যবস্থা করবেন আশ্বাস দিলেন। আর কয়েক দিনের মধ্যেই আমার কাছে আদেশপত্র এলো—পোপের সঙ্গে দেখা করার জন্য।

মণ্টি ক্যাভেলোতে পৌছলাম। আমাকে সোজা উপরে নিয়ে যাওয়া হোলো যেখানে তিনি বসেছিলেন সেইখানে। আমি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে ওঁর পাদুকার ক্রশ চিহ্নটিকে চুম্বন করলাম।

আমার পরিচয় নেবার পর তিনি জানালেন আমার নাম তিনি শুনেছেন। তাছাড়া 'একোয়াভাইভা'র মত বিশিষ্ট একজন কার্ডিন্যালের আশ্রয় পেয়েছি শুনে আনন্দও প্রকাশ করলেন। নানারকম কথাবার্তার মধ্যে আমার পথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাও তাঁকে বললাম। মার্টোরানোর ধর্মযাজকের কাহিনী শুনে তাঁর সে কি প্রাণখোলা হাসি। আমারও তখন সব জড়তা বা সঙ্কোচ একেবারেই কেটে গিয়েছিলো—খুব সহজ ভাবেই গল্প করতে লাগলাম। আর সে সব শুনে ওঁর এত কৌতুক লাগলো যে আমি প্রায়ই আসলে ওঁর খুব ভালো লাগবে, সে কথাও জানিয়ে দিলেন। বাস্তবিকই পোপ চতুর্দশ বেনেডিক্টের মত অমায়িক, নম্র ও মধুর প্রকৃতির লোক খুব কমই ছিলো—তাঁর শত্রুরাও তাঁর স্বভাবের গুণে তাঁকে শ্রদ্ধা আর প্রশংসা জানাতে দ্বিধা করতো না। কথা প্রসঙ্গে আমি তাঁর কাছে অনুমতি চাইলাম যাতে নিষিদ্ধ বই পড়ায় আমার বাধা না থাকে। অনুমতি তখন মিললো। যদিও উনি বলেছিলেন একেবারে লিখিত অনুমতিপত্র দেবেন—সেকথা কিন্তু পরে ভুলেই গিয়েছিলেন।

আর একবার ওঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় ভিলা মেডিসিতে। আমাকে ডাকলেন সঙ্গে বেড়াবার জন্যে। বেড়াতে বেড়াতে নানারকম গল্প করছিলাম আমরা—সঙ্গে ছিলেন ভেনিসের রাষ্ট্[illegible] আর কার্ডিন্যাল এ্যালবানি। [illegible]টা

হঠাৎ একটি লোক এলো। চেহারাটা দেখলে [illegible]দের প্রণয়-নম্র সৎ প্রকৃতির লোক। পোপ তাকে [illegible]। ওর বাবা ওদের [illegible] করলেন কি প্রয়োজন। [illegible] ওই প্রচণ্ড জেদের বিরুদ্ধে [illegible] নই। তাই বারবারা ঠিক করেছে ও পোপ শান্ত ভাবে

গোপনে রোম ছেড়ে চলে যাবে—যেদিকে দু'চোখ যায়। একা নিঃসম্বল আশ্রয়হীনা হোলেও দ্বিধা করবে না এই নিষ্ঠুর জগতের সমস্ত সংঘাতের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াতে।

"—যদি সত্যিই তুমি ভদ্রঘরের ছেলে হও তবে কখনই তুমি বারবারাকে পরিত্যাগ করবে না। তার বাবার বিরোধিতা সত্ত্বেও তোমার তাকে বিয়ে করা উচিত—" আমার মত তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে নানা ভাবে আলোচনা করার পর ওর মনটা শান্ত হোলো। স্থির ভাবে শুনলো সব। শেষে যাবার সময় জানিয়ে গেল যে, বারবারাকে কোন অবস্থাতেই পরিত্যাগ করবে না।

কয়েকদিন পরেই একটি সন্ধ্যায় আমি বিছানাটা ঠিক করছিলাম —এমন সময় হঠাৎ দরজার পাল্লা দুটো সজোরে খুলে গেলো, আর ঘরে এসে ঢুকলো একটি তরুণী সন্ন্যাসিনী। উত্তেজনায়, শ্রান্তিতে হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকেই আমার পায়ের তলায় আছড়ে পড়লো। তখনি চিনলাম, ডাক্তারের প্রণয়নী, ফরাসী শিক্ষকের মেয়ে বারবারা। উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়ে ও বার বার আমার করুণা ভিক্ষা করতে লাগলো।

সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে দুর্ভাগিনী তরুণীর অশ্রুসিক্ত লাবণ্য-ঢলাঢল মুখখানির আবেদনে কোন পাষাণ হৃদয়ই স্থির থাকতে পারে না।

—"কিন্তু ব্যাপার কি, ডাক্তারই বা গেল কোথায় ?"

—"তাকে পুলিশে ধরেছে। দু'জনে মিলে চলে যাবার ঠিক করেছিলাম। আমি এই ছদ্মবেশে তার কাছে আসছিলাম। যেই

দেখলাম পুলিশের গাড়ীতে ওকে টেনে তুললো, তখনই মনে হোলো এবার নিশ্চয়ই আমার পালা। এখন যদি কোনো নিরাপদ আশ্রয় না পাই তাহলে যে বরাতে কি আছে তা ভাবতেও পারি না। সবার প্রথমে আপনার কথা মনে পড়লো—তাই তখনি এখানে চলে এলাম”—

—“কিন্তু এখন তো অনেক রাত! কাল ভোরে কি করবেন কিছু ঠিক করেছেন?”

—“কিছু ভাববেন না। আজ রাতটা আমায় আশ্রয় দিন। কাল ভোরে উঠেই চলে যাবো”—বারবারার অশ্রুরুদ্ধ স্বর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো—“আমাকে এই বেশে কেউ চিনতে পারবে না। আমি রোম ছেড়ে চলে যাবো—কোথায় যাবো জানি না—শুধু জানি যতক্ষণ না মরণ আসে ততক্ষণ আমার চলা ফুরাবে না”—

আমি জোর করে ওকে আমার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। সারা রাত কাটলো চিন্তায়। ভোরে উঠেই ওকে কিছু না জানিয়েই বেরিয়ে পড়লাম—ইচ্ছা ছিলো বারবারার বাবার কাছে গিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কিছু ব্যবস্থা করতে পারি, যাতে ওকে ক্ষমা করে ডেকে নেন। কিন্তু হোলো না। বাড়ি থেকে বেরোতেই মনে হোলো আমার পেছনেও চর লেগেছে। তাই সে পথে আর না গিয়ে সোজা একটা কাফেতে ঢুকে এক গ্লাস চকোলেটের অর্ডার দিলাম। কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভার বাড়িতে আমি থাকি। এ অবস্থায় যদি আমার বাড়িতে পুলিশ সার্চ হয়, তাহলে সেটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর, আর অসম্মানজনক ব্যাপার হবে।

বাড়ি ফিরে এলাম। প্রথমেই কাজ হোলো বারবারাকে জোর করে কিছু খাওয়ানো। কিন্তু এক টুকরো বিস্কুট আর একটু মদ

ছাড়া কিছুই খাওয়াতে পারলাম না। যাই হোক, একটু সুস্থ হলে ধীরে-সুস্থে ওকে পরামর্শ দিলাম যে সব ব্যাপারটাই কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভাকে জানিয়ে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা সবচেয়ে ভালো। আপাততঃ তাঁর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে একটা চিঠি লেখা দরকার। বারবারা রাজী হোলো। ফরাসী ভাষায় ছোট্টো কয়েক লাইনে লিখলে—'মহাশয়, সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে আমি। অবস্থা বিপর্যয়ে সন্ন্যাসিনীর ছদ্মবেশে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সাক্ষাতে আমার নাম আর পরিচয় জানাবার প্রার্থনা করি। আপনি মহানুভব, আমার এই অনুরোধটুকু রাখবেন। আমার আশা আছে, আপনার উদার মহৎ হৃদয় আমার সম্মান বাঁচাবার জন্যে আমার সাহায্যে এগিয়ে আসবেই।'

—"কিছুই লুকিও না, সব কথাই তাঁকে খুলে বোলো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, উনি একটা না একটা ব্যবস্থা করবেনই।"

চিঠি পাঠিয়ে দেবার পর কি একটা কাজে আমি বেরিয়েছিলাম, বোধ হয় এক ঘণ্টার বেশী হবে না। ফিরে এসে দেখি, ঘর শূন্য। বারবারা নেই। খাবার সময় কার্ডিন্যালের সঙ্গে একত্রেই খেতে বসেছিলাম। সারাক্ষণ একটি কথাও আমি বলিনি—নিঃশব্দেই খেয়ে যাচ্ছিলাম। কিন্তু এধার-ওধারের টুকরো কথা থেকে বুঝতে বাকী রইলো না যে, বারবারা ইতিমধ্যেই ওঁর আশ্রয়ে এসে পড়েছে।

পুরো দু'দিন কেটে গেলো। কোনো খবরই পেলাম না আর। পরে একোয়াভাইভা নিজেই আমাকে জানালেন যে, বারবারাকে সমস্ত খরচ দিয়ে একটি কনভেণ্টে ভর্তি করে দিয়েছেন। যতদিন না ডাক্তার ফিরে আসে, ওকে বিয়ে করার জন্যে প্রস্তুত হয়, ততদিন ও ওখানেই থাকবে।

কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যে ব্যাপারটা এখানে এসেই থেমে গেল না। যে ছোট্ট নাটকীয় ব্যাপারটি ঘটছিলো, তাতে নাটকটি ক্ষুদ্র হোলেও তার পাত্র-পাত্রীরা যে কেউই জনসাধারণের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার মত তুচ্ছ ন'ন। অতএব কয়েক দিনের মধ্যেই সারা রোম জানলো যে, আমি নিজের কোনো দুরভিসন্ধি সাধনের জন্যেই বারবারাকে একটি রাতের আশ্রয় দিয়েছিলাম। অবশ্য এ-সব গুজবে প্রথমটা আমি কানও দিইনি—কিন্তু মর্মান্তিক ভাবেই দিতে হোলো তখন, যখন লক্ষ্য করলাম কার্ডিন্যাল একোয়াভাইভাও দিন-দিন আমার প্রতি কেমন যেন নিস্পৃহ, এড়িয়ে যাবার মত ব্যবহার করছেন। সত্যিই ব্যথা পেলাম সেদিন।

তার পরই একদিন আমাকে উনি ডেকে পাঠিয়ে গম্ভীর ভাবে জানালেন—"দ্যাখো, এই বারবারা দ্যালাকোয়াদের ব্যাপারটা ক্রমেই বেশ ঘোরালো হোয়ে উঠেছে—শুধু তাই নয়, রীতিমত অসহ্যও হোয়ে উঠেছে। সবাই বলাবলি করছে, বারবারার অপরাধ আর ডাক্তারের অনভিজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তুমি আর আমি নিজেদের কোনো উদ্দেশ্য সাধন করছি। যদিও এ-সব কুৎসা রটনাকে আমি আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করি, তবুও খোলাখুলি ভাবে এ-সব সহ্য করাও আমার ক্ষমতার বাইরে। তাই তোমাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তুমি রোম ছেড়ে চলে যাও। যাতে লোকের মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ না হয়, তোমার সম্মান যাতে অক্ষুণ্ণ থাকে, সে ভার আমার। তা ছাড়া আমার হৃদ্যতা আর শ্রদ্ধা থেকে তুমি কখনও বঞ্চিত হবে না। দুঃখ কোরো না। তোমার এই তো দেশ-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বয়স। বেশ করে ভেবে বলো, কোন্ দেশে তোমার সবচেয়ে বেশী যাবার ইচ্ছা।

সারা পৃথিবী জুড়ে আমার বন্ধু, পরিচিত ও আত্মজনের অভাব নেই। যেখানেই তুমি যাবে আমি চিঠি দেবো, যাতে কোথাওই তোমার কাজকর্ম, কিছুরই অভাব না হয়। এই সপ্তাহের মধ্যেই তুমি রোম ছাড়বার জন্যে তৈরী হও। আজ রাতটা বেশ ভালো করে চিন্তা করে কাল সকালে আমাকে জানিও, কি ঠিক করলে।"

চলে এলাম। সমস্ত মনটা তীব্র ব্যথায় টন্-টন্ করে উঠলো এই আকস্মিক আঘাতে। ক্ষুব্ধ, ভারাক্রান্ত মনে কাটলো নিদ্রাহীন রাত—কোনো পথ নেই—কোনো উপায় নেই। সকালবেলা দেখা করতে যাবার সময় অবধি কি বলবো, কিছুই ঠিক করতে পারলাম না।

ভোরবেলা বাগানে সেক্রেটারীর সঙ্গে উনি বেড়াচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই তাঁকে বিদায় করে দিলেন। আমি যথাসাধ্য ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, কি দুঃসহ যন্ত্রণায় আমার সারা রাত কেটেছে। সমব্যথীর মতই সব শুনলেন কিন্তু পরক্ষণেই সেই পুরানো প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি—কোথায় যাবার ঠিক করেছি—

—"কনস্তান্তিনোপল্"—দুঃখে, ক্ষোভে, হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলাম।

—"কনস্তান্তিনোপল্। সে কি!"

—হ্যাঁ মহাশয়!" কনস্তান্তিনোপলই"—অশ্রুসিক্ত উত্তর আমার।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটলো। তার পর মৃদু হেসে উনি বললেন —"ধন্যবাদ, তুমি যে ইস্পাহান বলনি তাই যথেষ্ট। যাক, আমি তোমাকে পাশপোর্ট দেবো। তাছাড়া এবার তুমি স্বচ্ছন্দে লোকের কাছে বলে বেড়াতে পারো যে আমি তোমাকে কনস্তান্তিনোপল্ পাঠাচ্ছি—আমার মনে হয় কেউই তোমার কথা বিশ্বাস করবে না—"

হোটেলে ফিরে এসে আমার প্রথমেই মনে হোলো, হয় আমি পাগল, নয়তো কোনো অজ্ঞাত অশরীরী শক্তি আমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। জানি না, এত দেশ থাকতে কেন কনস্তান্তিনোপল বললাম—জানি না সেখানে গিয়ে আমি কি করবো! শুধু জানি যে সেখানেই আমি যাবো।

দু'দিন পরে কার্ডিন্যালের কাছ থেকে ভেনিসের একটি পাশপোর্ট এলো, সঙ্গে একটি বন্ধ খাম। ঠিকানা লেখা,

Osman Bonneval. Pasha of Caramania. Constatinople.

আরও একটি মোড়কে সাত শ' মুদ্রা!

দ্বিতীয় অধ্যায়

দীর্ঘ একটি মাস কাটলো 'করফু'তে—নিশ্চিন্তে, নিরুপদ্রবে। তারপর জুলাই মাসের মাঝামাঝি একটি দিনে আমার ভাগ্যতরী এসে ভিড়লো—কনস্তান্তিনোপল-এ।

প্রথম দিনেই গেলাম 'ওসমান-পাশা অফ কারমনিয়া'র উদ্দেশে। চিঠিখানি সঙ্গে নিয়ে। কাউণ্ট দ্য বনিভ্যালই ঐ নামে অভিহিত হোয়েছিলেন সিংহাসন পাবার পর।

ফরাসী কায়দায় সাজানো মস্ত একটি হলে আমাকে স্বাগত জানালেন। তারপর প্রশ্ন করলেন—"রোমের কার্ডিন্যাল আপনাকে পাঠিয়েছেন—আপনাকে আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন?"

তাঁর হাস্যোজ্জ্বল স্মিত মুখের দিকে চেয়ে আমার অপরিচয়ের দ্বিধা মুহূর্তে কেটে গেলো। অসঙ্কোচেই জানালাম, মনের এক তীব্র নৈরাশ্যের মুহূর্তে আমি নিজেই কার্ডিন্যালের কাছে এখানে আসার জন্য পরিচয়-পত্র চেয়েছিলাম। তারপর সেই দায়িত্ব পালন করবার জন্যে নিজেকে বাধ্য করেছি এখানে আসতে।

—"তাহলে আমাকে আপনার সত্যকারের কোনো প্রয়োজন নেই?"

—"প্রয়োজন কিছু নেই, সে কথা সত্যি—কিন্তু একথাও সত্যি যে আমার আনন্দের সীমা নেই। আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য থেকে তো বঞ্চিত হইনি—আজ সারা ইউরোপে আপনার কথা আলোচিত হচ্ছে—অতীতেও হোয়েছে আর ভবিষ্যতেও বহু দিন ধরেই হবে।"

কার্ডিন্যাল তাঁর চিঠিতে আমাকে উচ্চশিক্ষিত বলে অভিহিত করায় পাশা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ওঁর লাইব্রেরীটি দেখতে চাই কিনা আগ্রহের সঙ্গেই রাজী হলাম। আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন আর একটি মস্ত ঘরে। তার চার পাশে সারি সারি জাফরী কাটা দরজা তার উপর পর্দা ঝোলানো। পাশা এগিয়ে গিয়ে একটি দরজা খুললেন—কিন্তু বই? বই কোথায়? সারি সারি বাঁধানো বই-এর বদলে সারি সারি বোতল—সুরার—সবচেয়ে দামী, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট সুরার অফুরান ভাণ্ডার।—"এই—এই হোলো আমার লাইব্রেরী—এই হোলো আমার অন্তঃপুর।—বৃদ্ধ হোয়েছি যথেচ্ছাচার করে জীবনকে নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু সুরা? সুরা শুধু জীবনকে দীর্ঘই করে না—সেই দীর্ঘ পথ রঙীন করে তোলে তার নেশায় তার মায়ায়।"

পরদিন পাশা এক ভোজসভায় আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রচুর ইংরাজ ও অন্যান্য পদস্থ সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের সমাবেশ দেখলাম। আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন একটি বৃদ্ধ—বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি কিন্তু অত্যন্ত সুদর্শন। তাছাড়া তাঁর শান্ত, গম্ভীর মুখের দিকে তাকালে আপনিই সম্ভ্রম জাগে। পাশা তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—নীতিবিদ, ধার্মিক, দার্শনিক আর প্রচুর বিত্তবান বলে। তাঁর নাম জশুফ আলি।

সেদিনের পরিচয় মাত্র চার-পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে রীতিমত ঘনিষ্ঠতায় দাঁড়ালো। আমরা প্রতিদিন ধর্ম, নীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে আলোচনা করতাম। একদিন হঠাৎ জশুফ আলি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিবাহিত কিনা। বিবাহিত নই আর আপাততঃ বিবাহ করার মত কোন সদিচ্ছাও নেই শুনে আমাকে বললেন,

এটা শুধু অপরাধ নয়, ঈশ্বরের আদেশও অমান্য করা হয় এতে। তারপর বললেন,—"শোনো, আমার দু'টি ছেলে একটি মেয়ে। ছেলেরা তাদের সম্পত্তির অংশ আগেই পেয়ে গেছে। বাকী যা কিছু আছে সব আমার মেয়ে জেলমার। জেলমার চোখ আর চুল তার মায়ের মতই নিবিড় কালো, তার রং হার মানায় শ্বেত পাথরে গড়া মূর্তিকে। গ্রীক আর ইতালীর ভাষা সে জানে—জানে বীণা বাজিয়ে গান গাইতে। আজ অবধি কোনো পুরুষের সৌভাগ্য হয়নি তাকে চোখে দেখবার। আমার এই অমূল্য রত্নটিকে আমি তোমাকে দিতে রাজী। কিন্তু তার আগে তোমাকে একটি বছর থাকতে হবে আমার কোনো আত্মীয়ের কাছে—সেখানে তুমি শিখবে আমাদের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি—আমাদের রুচি, রীতি, নীতি। তারপর যেদিন তুমি নিজেকে সত্যিকার মুসলমান বলে এসে দাঁড়াবে, জেলমা সেদিনই তোমার হবে। প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হবে তুমি সেই সঙ্গে। না, না তোমার কাছ থেকে এখন কোনো কথাই আমি চাই না। চিন্তা কর এ বিষয়ে, যতদিন না সহজে উত্তর দিতে পারো।

এর পর দিন চারেক জণ্ডফ আলির কাছে যেতে পারিনি কি এক সঙ্কোচে। কিন্তু তিনি নিজেই এ সঙ্কোচ ভেঙে দিয়ে আগের মতই সহজভাবে ব্যবহার করতে লাগলেন। এরই মধ্যে একদিন ওঁর বাড়ির বাগানে বেড়াচ্ছিলাম—এমন সময় দারুণ বৃষ্টি এলো। ভিজতে ভিজতে ছুটে গিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামনেই যে হলটায় ঢুকলাম সেখানে এর আগেই কয়েকবার এসেছি। ঢুকেই দেখি, জানালার ধারে একজন দাসী কি কাজ করছে আর একটি তরুণী তার পাশে দাঁড়িয়ে কি নির্দেশ দিচ্ছে। আমাকে

দেখেই তরুণী ক্ষিপ্রহাতে ওড়নায় মুখ ঢেকে ফেললে। অপ্রস্তুত হোয়ে আমি চলে আসবার উপক্রম করতেই সেই অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে ভেসে এলো মধুক্ষরা কণ্ঠের সকাতর মিনতি। আলি সাহেবের নির্দেশ আছে, তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাকে অভ্যর্থনা জানাবার। আমার মনে হোলো এ নিশ্চয়ই জেলমা। আলি সাহেব নিশ্চয়ই আমাদের পরিচয় করার জন্য এমন নিভৃত আলাপের সুযোগ দিয়েছেন। অবগুণ্ঠনের আড়াল থেকে আবার ভেসে এলো সেই মধুস্বর—

—"আমি কে আপনি জানেন?"

—"না, জানি না তো বটেই, আন্দাজও করতে পারছি না—"

—"আমি আপনার বন্ধু আলি সাহেবের স্ত্রী। বছর পাঁচেক আগে আমাদের বিবাহ হয়। আমার এখন আঠারো বছর বয়স—"

অবাক হোলাম, নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ করানোর মত এতটা উদার-চিত্ততা কোনো সম্ভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষে সম্ভব? অবশ্য বিবাহিতা জানার পর আলাপ করাটা অনেক সহজ মনে হোলো। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার সেই চিরন্তন প্রকৃতিও জেগে উঠলো—দেখতেই হবে ঐ অবগুণ্ঠনের আড়ালে লুকানো রহস্যময়ীকে। আমার সামনে দাঁড়িয়ে যেন কোন ভাস্করের নিপুণ হাতে খোদাই-করা শুভ্র পাষাণপ্রতিমা। কিন্তু ঐ অপরূপার আত্মার বিকাশ যে দুটি দীপাধারে সেই দৃষ্টিপ্রদীপ থেকে বঞ্চিত থাকি কেমন করে? চোখের সামনে শুধু উন্মুক্ত একটি সুললিত, সুগঠিত বাহু। তার লীলায়িত ভঙ্গীতে মানস নয়নে জেগে উঠলো ওড়না-ঢাকা তন্বীর তনুদেহখানি। কোমল মসলিনের বহির্বাস তার দেহের ছন্দ ঢাকতে পারে নি—

ঢাকতে পারে নি তার অপূর্ব সুষমা। শুধু আবরণে বন্দী হোয়ে আছে তার উজ্জ্বল কোমল পেলবতা। দেহভঙ্গীতে বাঁধা পড়ে আছে এক অপরূপ ছন্দ, এক কোমল মূর্ছনা—

মুগ্ধ, বিস্মিত, বিহ্বল অবস্থায় যখন এগিয়ে গেছি, দুই হাত বাড়িয়ে ঐ অবগুণ্ঠনের আড়াল ঘুচিয়ে দিতে—চকিতে, ত্রস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি—সম্বিৎ ফিরে এলো, আমার কানে এলো তীব্র ভর্ৎসনার ভঙ্গীতে সেই কোমল মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর—

—"এমনি করেই বুঝি বন্ধুর বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে হয়? তার স্ত্রীকে অপমান করে বুঝি আতিথ্যের ঋণ শোধ করতে হয়?"

—"আমাকে ক্ষমা করুন। আমাদের দেশে হীনতম লোকও সম্রাজ্ঞীর মুখদর্শন থেকে বঞ্চিত থাকে না"—

—"হ্যাঁ, কিন্তু যখন ঢাকা থাকে তখন ওড়না ছিঁড়ে বোধহয় তারা দেখে না—জশুফ আপনাকে এর প্রতিফল দেবেই—"

এ কথায় আমি সত্যিই ভয় পেলাম। তখনি ওঁর পায়ের তলায় বসে ক্ষমা চাইলাম। অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর তিনি শান্ত হোলেন। তখন অনুমতি পেলাম তাঁর হাতখানি স্পর্শ করার।

এমন সময় জশুফ আলি এলেন। আমাকে আলিঙ্গন করে স্ত্রীকে ধন্যবাদ জানালেন আমাকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে। তারপর স্ত্রীর হাত ধরে অন্তঃপুরের দিকে গেলেন।

আমি পরে পাশার কাছে এই সব কাহিনী বলাতে তিনি হেসে উঠলেন। বললেন,—"কোনো ভয় নেই, নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার আনাড়ীপণায় মহিলাটি শুধু মনে মনে হেসেছেন। খুব সনাতনপন্থী তুর্কী মহিলাদেরও সমস্ত লজ্জা ঐ মুখে। ওড়নায় মুখ ঢাকা থাকলে

আর কিছুতেই তাঁরা লজ্জা পান না। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, স্বামীর সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপের সময়েতেও এঁর মুখ ওড়নায় ঢাকা থাকে—"

অবশ্য এর পর আলি সাহেবও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের আর কোনো সুযোগ আমাকে দেন নি। ঠিকই করেছিলেন অবশ্য। এর কিছুদিন পরেই আমার ফেরার সময় হোয়ে এলো। এক দিন বাজারে নানা রকম জিনিসপত্র দেখছিলাম এমন সময় আলি সাহেবও সেখানে এলেন। এসে প্রথমেই আমার রুচির আমার পছন্দকরা জিনিসগুলির খুব প্রশংসা করলেন। আমি কিন্তু কোনো জিনিসই কিনিনি—কারণ প্রত্যেকটি জিনিসেরই দেখলাম অসম্ভব বেশী দাম—কিন্তু আলি সাহেব বললেন, কোনোটারই দাম বেশী নয়, সবই ঠিক দাম। কিনলেনও প্রচুর জিনিস। কিন্তু পরদিনই সব জিনিসগুলি আমার বাড়িতে উপহার বলে পাঠিয়ে দিলেন। আমি বুঝেছিলাম এই দেওয়ার আড়ালে কতখানি আন্তরিক স্নেহ লুকানো আছে—এ-ও বুঝেছিলাম, এগুলি ফিরিয়ে দিতে গেলে কতখানি আঘাত লাগবে ওঁর মনে। কত অজস্র জিনিস যে তার সংখ্যা নেই, প্রায় পাঁচ শ' ছ'শ' টাকার (তখনকার দিনে) মত হবে।

যাত্রার দিন সন্ধ্যায় ভদ্রলোক আমাকে বিদায় দিতে এসে কেঁদে ভাসালেন। সেদিন জানালেন তাঁর জেল্‌মাকে বিয়ে করার অনুরোধ না মেনে আমি তাঁর শ্রদ্ধাই অর্জন করেছি। জাহাজের কেবিনে ঢুকে দেখি মস্ত এক বাক্সভর্তি আরও অজস্র উপহার উনি রেখে গেছেন। পাশাও উপহার দিয়েছিলেন বিদায় নেবার সময় কয়েক রকম উৎকৃষ্ট দুর্লভ সুরা।

প্রয়োজনে আর অভাবের দাবী মেটাতে এই সব উপহারের দুর্লভ সঞ্চয় আমার সব সমস্যার সমাধান করে দিতো। মনে রেখাপাত করতো না কিছুই।

*   *   *   *   *

ভেনিস। দীর্ঘ দিন পর আবার পা দিলাম দেশের মাটিতে। কিন্তু করফু হোয়ে ভেনিসেও পৌছবার ভিতরই সব সঞ্চয় নিঃশেষ করে ফেলেছিলাম। তাই স্বদেশে ফিরে প্রধান চিন্তা হোলো অর্থ উপার্জনের। জুয়া খেলা ধরলাম। ভাগ্য বিরূপ। কয়েক দিনেই নিঃসম্বল হোলাম। কি করি? কোথায় কাজ পাই? উপোস করে মরতে আমি পারবো না, কিন্তু কাজও তো আমাকে কেউই দিতে চায় না? এমনি অবস্থায় ডাঃ গাৎসির কাছে শেখা ভায়োলিন বাজানোই আমাকে পথ নির্দেশ দিলে। আবে গ্রিমানী আমাকে একটা থিয়েটারে কাজ দিলেন—সেখানে প্রতিদিন এক ক্রাউন করে পেতাম। যাই হোক্, তবু দাঁড়াবার মত মাটি পেলাম—তারপর ভাগ্য।

সেই ভাগ্যই নিয়ে এলো আমাকে এক বিবাহ উৎসবে বাদ্যকার হিসাবে। উৎসবের তৃতীয় দিনে প্রায় ভোর রাত্রে যখন বাড়ি ফিরছি তখন দেখলাম আমার আগে আগে একজন সেনেটের সদস্য চলেছেন। যেই তিনি তাঁর গণ্ডোলাতে উঠতে যাবেন অমনি একখানা চিঠি ওঁর পকেট থেকে পড়ে গেল। উনি টের পেলেন না দেখে আমি সেটা কুড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ওকে দিলাম। উনি ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে ওঁর গণ্ডোলাতে উঠে আসতে বললেন বাড়ি পৌছে দেবেন বলে। আমরা দু'জনে গণ্ডোলাতে উঠে বসতে না বসতেই উনি বললেন, ওঁর বাঁ হাতটা একটু জোরে ঘষে দিতে কেমন যেন ঝিম ঝিম করে অসাড় হয়ে আসছে। আমি খুব জোরে জোরে ঘষতে লাগলাম,

কিন্তু উনি কেমন জড়িয়ে জড়িয়ে বলে উঠলেন ওঁর সমস্ত শরীর নাকি অবশ হোয়ে আসছে। বোধ হয় মারা যাচ্ছেন—চমকে উঠে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখি, যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখ কেমন অদ্ভুত ভাবে বেঁকে যাচ্ছে। বুঝতে দেরী হোলো না যে এ নির্ঘাৎ সন্ন্যাস রোগ। তখনি গণ্ডোলা থামাতে বলে ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটলাম। তাড়াতাড়ি তো ডাক্তার ড্রেসিং গাউন পরেই চলে এলেন। এসে ওঁর শরীরের এক অংশ চিরে খানিকটা রক্ত বার করে দিলেন। আমি আমার সার্ট ছিঁড়ে জায়গাটাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। তারপর ক্ষিপ্রগতিতে গণ্ডোলা চালিয়ে ওঁর বাড়িতে এসে পৌছলাম। চাকরদের ডাকাডাকি করে তুলে সবাই মিলে যখন ওঁকে ধরে বিছানায় শুইয়ে দিলাম তখন ওঁর দেহে প্রাণ আছে কি নেই, বোঝার উপায় ছিল না। নিজেই ওঁর একজন চাকরকে ডাক্তার ডাকবার আদেশ দিয়ে বিছানার পাশে বসে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে দু'জন বেশ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক ঘরের ভিতর এলেন। শুনলাম, ওঁর দু'জন বন্ধু। সমস্ত ঘটনাটা তাঁদের কাছে বললাম, আমার পরিচয় আমি জানাইনি, তাঁরাও নিজে থেকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস করলেন না। সারাদিন কাটলো একই ভাবে, রোগীর অবস্থার কিছুমাত্র উন্নতি হোলো না।

প্রায় মাঝ রাতে রোগীর অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে উঠলো। জ্বর অসম্ভব বেড়ে গেলো, সঙ্গে নিঃশ্বাসের কষ্ট। অত শ্বাসকষ্ট দেখে আমি উঠে ওঁর বন্ধুদের ডাকলাম। তাঁদের বললাম যে, ডাক্তার ওঁর সারা বুক জুড়ে যে পুলটিস দিয়ে গেছেন সেটা যদি এক্ষুনি না সরিয়ে ফেলি তাহলে ওঁকে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না। তারা কিছু বলবার আগেই আমি সেটা টেনে খুলে ফেললাম। তারপর

অল্প গরম জলে বেশ ভালো করে স্পঞ্জ করে দিলাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রোগীর নিঃশ্বাস সহজ হোয়ে এলো—অনেক সুস্থও মনে হোলো। ধীরে ধীরে শান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে যখন আবার ডাক্তার এলেন তখন রোগী অনেকটা সুস্থ। ডাক্তারকে বললেন, "এমন ডাক্তার পেয়েছি যে তোমার চেয়ে ভালো ডাক্তারী জানে—"

—"তাহলে আমার যখন প্রয়োজন নেই, তখন নতুন ডাক্তারের চার্জেই থাকুন"—বলে ডাক্তার গম্ভীর হোয়ে বেরিয়ে গেলেন। মনে হোলো অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোয়েছেন। হওয়াই স্বাভাবিক।

তিন জনেই আমার কাজকর্মে কথাবার্তায় বেশ একটু অভিভূত হোয়েছেন দেখে আমিও একটু সবজান্তার চালে চলতে লাগলাম। ভাবখানা যেন, সমস্ত আইনকানুন আমার হাতের মুঠোয়। যাদের লেখা জীবনে পড়িনি তাদের সম্বন্ধে সব সময়ে বড় বড় কথা বলে, তাদের লেখা থেকে আউড়ে তিন জনকেই রীতিমত মুগ্ধ করেছিলাম।

এই ভাবে তাক্ লাগানোতে দোষের কিছু ছিল না। বিশ বছর বয়স তখন আমার। বাহাদুরী দেখানোর লোভ ছাড়তে পারি? তাছাড়া আমার স্বাস্থ্যও ছিলো চমৎকার! সেই বয়সে জীবনের পাওনার খাতায় কেউ কি শূন্যের অঙ্ক বসাতে চায়? অবশ্য আমার আমোদ-প্রমোদ যে খুবই নির্দোষ হোতো সব সময় তা মোটেই নয়। কিন্তু সে-ও তো বয়সের দোষ!

ভেনিসে তো কেউ ভাবতেও পারতো না আমার মত লোকের সঙ্গে মেশবার কথা। তাদের চিন্তাধারা তাদের আদর্শ সবই উচ্চ ভাবের, পবিত্র ভাবের—আমি ছিলাম পুরোপুরি রক্তমাংসের মানুষ, মাটির মায়ায় বাঁধা। তাদের কঠোর সংযত নীতির রাস্তা ধরে যাত্রার সঙ্গী আমি হোতে পারিনি—আমার পাথেয় আনন্দ আর উপভোগ।

যাক্ সে কথা। গরমের সুরুতেই উনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন—সেনেটে যাবার মত তো বটেই। ওঁর নাম ছিলো ম্যাথিয়ো ব্রাগাদাঁ। যেদিন প্রথম সেনেটে গেলেন তার আগের দিন উনি আমাকে ডেকে পাঠালেন—আমি এলে আমাকে পাশে বসিয়ে বললেন,—

—"তুমি যাই হও না কেন, আমি তোমার কাছে চিরঋণী। তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছো। আগে যারাই তোমার অভিভাবকত্ব করেছেন, তাঁরা তোমাকে ডাক্তার কিম্বা ধর্মযাজক, কিম্বা, আইনজ্ঞ এই সব করতে চেয়েছেন—কিন্তু তাঁরা সবাই ভুল করেছেন। কেউই তোমাকে বোঝেননি। তোমার ভাগ্যদেবতাই তোমাকে আমার কাছে এনে দিয়েছে। আমি তোমাকে বুঝি—তোমাকে সমর্থনও করি। আমি মৃত্যু পর্যন্ত তোমাকে আমার নিজের ছেলের মত দেখবো। আমার বাড়িতেই থাকবে তোমার নিজের ঘর। আমার সঙ্গে এক টেবিলেই তুমি খাবে। তোমার একজন নিজস্ব-চাকর থাকবে, নিজস্ব একটি গণ্ডোলা থাকবে আর মাসে দশ সেকুইন (ইতালী মুদ্রা) তুমি হাতখরচা পাবে। তোমার বয়সে আমার জন্যে আমার বাবাও ঠিক এই ব্যবস্থাই করে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতের জন্য কোনো ভাবনা তোমায় করতে হবে না, তুমি শুধু আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাও। যাই হোক না কেন, সব সময় মনে রেখো, আমি তোমার পাশে আছি—পিতার মত—বন্ধুর মত…"

আমার ভাগ্য এমনিই চিরদিন। দরিদ্র বেহালা-বাজিয়ে থেকে একেবারে অর্থ আর সামর্থ্যের শিখরে !

তৃতীয় অধ্যায়

বছর তিনেক পরের কথা। তখন আমি নেপল্‌সে বেড়াতে যাবার পথে সেশেনাতে একটা হোটেলে উঠেছি। বেশ দিলদরিয়া মেজাজ তখন। সঙ্গে আছে বেশ কিছু সোনাদানা, মনিব্যাগটিও ভর্তি, তা ছাড়া তেইশ বছরের অদম্য উৎসাহ।

একদিন ভোরবেলা দারুণ চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেলো। দরজা খুলে দেখি চারদিকে পুলিশ আর সামনেই একটা ঘরের দরজা হাট করে খোলা। আমার দরজা থেকেই দেখতে পেলাম সেই ঘরে বিছানার উপর বসে এক ভদ্রলোক লাতিন ভাষায় অনর্গল চীৎকার করে যাচ্ছেন।

ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারখানা কি? তিনি বললেন,—"এই ভদ্রলোকের সঙ্গে একটি মেয়ে রয়েছে, এখন বিশপের কাছ থেকে তাঁর অনুচরেরা জানতে এসেছে মেয়েটি ওঁর স্ত্রী কিনা। যদি স্ত্রী হয়, তাহলে তো গোলমালের কিছু নেই, শুধু ওঁদের বিয়ের সার্টিফিকেটটা দেখালেই সব ঝামেলা চুকে যায়। তা' না হলে অবশ্য দু'জনাকেই হাজত-বাস করতে হবে। কিন্তু মশাই, মাত্র তিনটি সেকুইন পেলেই আমি সব মিটিয়ে দিতে পারি। শুধু পুলিশের বড় কর্তাকে একবার বলা, তাহলেই তিনি পুলিশদের সরিয়ে নেবেন। আপনি যদি লাতিন ভাষা জানেন তো একবার দয়া করে যান, গিয়ে ঐ ভদ্রলোককে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন"—

"জোর করে দরজাটা খুলেছিলো কা'রা?"

—"কেউ নয় মশাই আমিই খুলেছিলাম, ওটা আমারই কর্তব্য।"

ব্যাপারটাতে মাথা গলানোই ঠিক করে ফেললাম। সটান ঢুকে গেলাম তাঁর ঘরে। ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দিলাম কেন লোকগুলো এই ঝামেলা করছে। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, ওঁর সঙ্গে যিনি রয়েছেন তিনি পুরুষ কি নারী বোঝবার উপায় নেই। কারণ, তিনিও ওঁরই মত অফিসারের পোষাক পরা। এই বলে তিনি একটা পাশপোর্ট বের করে দেখালেন। তাতে কার্ডিন্যাল আবানি'র সই করা নাম—উনি হাঙ্গেরিয়ান রেজিমেণ্টের ক্যাপ্টেন, জরুরী কাগজপত্র নিয়ে 'পারমা'তে চলেছেন। আমি লাতিন ভাষাতেই ওঁকে বললাম,—"ক্যাপ্টেন অনুমতি করুন আপনার হোয়ে আমি বিশপের কাছে যাই, গিয়ে জানাই, তাঁর অনুচরেরা আপনার সঙ্গে কি জঘন্য ব্যবহার করেছে। আর এই ঝামেলাও একেবারে চুকিয়ে আসি।"

অসভ্য পুলিশগুলো যে ভাবে একজন সম্ভ্রান্ত আগন্তুক ভদ্রলোককে অপদস্থ করলে তার জন্যে রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলছিল। আর সেই সঙ্গে সমস্ত মনও অস্থির হোয়ে উঠেছিলো ব্যাপারটার আড়ালে মধুর রহস্যটি জানার কৌতুহল।

বিশপের কাছে সুবিধা করতে না পেরে সোজা গেলাম জেনারেল স্পাডার কাছে। তখন তাঁরই অধীনে ছিলো এই শহরটা। তিনি সব শুনে অত্যন্ত বিরক্ত আর ক্ষুব্ধ হোয়ে মন্তব্য করলেন, ধর্মযাজকদের কাজ হোলো ঈশ্বর আর পরলোক নিয়ে। ইহলোক নিয়ে মাথা ঘামানোর কোন অধিকার তাদের নেই। কথা দিলেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সব ব্যবস্থা করবেন। আর আমার সঙ্গেই লোক পাঠালেন হোটেল থেকে পুলিশদের সরিয়ে নেবার নির্দেশ দিয়ে।

হোটেলে ফিরে খোলা দরজাটার সামনে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। ওই সঙ্গে জিজ্ঞাসাও করলাম, এদের সঙ্গে একত্রে প্রাতরাশ করতে পারি কি না।

—"আমার সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করুন"—ক্যাপ্টেন বললেন।

—"ভদ্রে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ যদিও পাইনি, তবু আপনাদের টেবিলে তৃতীয়ের স্থান আমি নিতে পারি কি?"—ফরাসী ভাষায় বেশ কায়দা করেই বললাম।

একগোছা সদ্যফোটা ফুলের মত তাজা, ভারী মিষ্টি একখানি মুখ বেরিয়ে এলো। মাথায় ছেলেদের টুপি। তার তলা থেকে এলোমেলো চুলের গুচ্ছ উঁকি দিচ্ছে। হাসিমুখে সম্মতি জানালে। আমি অর্ডার দিয়ে এলাম প্রাতরাশের। ঘণ্টাখানেক পর ওয়েটার এসে আমাকে খাবার ঘরে ডেকে নিয়ে গেল।

রহস্যময়ী সঙ্গিনীটি হোলেন এক অপূর্ব সুন্দরী ফরাসী মহিলা। ঘন নীল অফিসারের পোষাকে ওঁকে আরও মিষ্টি আরও রূপসী দেখাচ্ছিল। সুন্দরীর অভিভাবকটির বয়স ষাটের নীচে নয়—অথচ আমার তেইশ বছরের মন কিছুতেই তাদের দাম্পত্য সম্বন্ধ মানতে পারছিল না। কি দারুণ বৈষম্য! তার উপর মেয়েটি ফরাসী ছাড়া কোনো ভাষাই জানে না আর ভদ্রলোকটি ফরাসী একবর্ণও বোঝেন না। আর একটু সাহসে ভর করে বললাম ক্যাপ্টেনকে যে তিনি যখন 'পারমা'তেই যাচ্ছেন, তখন ট্রেণেতে আমার কামরার বাকী দুটো সিট যদি ওঁরা নেন তাহলে বাধিত হই। তিনি বললেন,—"আমি তো আনন্দের সঙ্গেই রাজী; কিন্তু হেনরিয়েটাকে একবার জিজ্ঞাসা করুন।"

—"ভদ্রে, আপনার সঙ্গে 'পারমা' অবধি একসঙ্গে যাবার সৌভাগ্য কি আমার হবে?" আবার সেই ফরাসী কায়দা!

"খুব খুব রাজী…অন্ততঃ কথা বলেও বাঁচবো, কয়েকদিন কি দুর্ভোগই না গেছে আমার"—'আমার ট্রেণের কামরাটা' এতক্ষণ অবধি আমার কল্পনাতেই বিরাজ করছিলো—এবার তাকে সত্যে রূপায়িত করতে চললাম। পরদিনই যাত্রা স্থির হলো।

ট্রেণ ছাড়বার কিছুক্ষণ পর থেকে আমার একটু অসোয়াস্তি হতে লাগলো। হাঙ্গেরিয়ান ভদ্রলোক বেচারী চুপ করে বসে আছেন এক ধারে, আমাদের একটি কথাও ওঁর বোধগম্য হচ্ছে না। তাই মেয়েটি যখনই কিছু হাসির অথবা মজার কথা বলছিলো তখনই সেটা আমি লাতিনে অনুবাদ করে ওঁকে শোনাতে লাগলাম। কিন্তু লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখ ক্রমেই গম্ভীর হোয়ে উঠছে।

ফরাসী ভাষায় সেই প্রথম আমি ফরাসী মহিলার সঙ্গে কথা বললাম। মেয়েটির কথা বলার ভঙ্গী ভারী চমৎকার। সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলাদের মত। কিন্তু আমার ধারণা ছিলো ও নিশ্চয়ই খুব বেপরোয়া ধরনের মেয়ে। মনে মনে চাইছিলামও তাই যেন হয়। কারণ, ক্রমেই বুঝতে পারছিলাম যে আমার সমস্ত মন চাইছে ওই বৃদ্ধের কবল থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করতে। অবশ্য বৃদ্ধের মনে যাতে খুব একটা আঘাত না লাগে তার দিকেও আমার দৃষ্টি ছিলো। কেন জানি না, এই বৃদ্ধ মিলিটারী অফিসারটিকে দেখেই আমার শ্রদ্ধা জেগেছিলো ওঁর উপর। কিন্তু মেয়েটি কেমন ধরনের? পুরুষের বেশ পরে থাকে, সঙ্গে না আছে কোনো মালপত্র, না আছে কোনো মেয়েলী প্রসাধন-সজ্জা কিংবা টুকিটাকি কিছু—একটা সেমিজ অবধি নেই! আশ্চর্য, ক্যাপ্টেনের সার্ট নিয়ে পরে থাকে। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন দারুণ হেঁয়ালির মত—তাইতেই আমার উৎসাহও বাড়তে লাগলো।

রাত্রিবেলা বেশ একটি উপাদেয় ভোজের পর সবাই মিলে আগুনের ধারে বসে ছিলাম। তখন কৌতূহল আর চাপতে না পেরে সাহসে ভর দিয়ে মেয়েটিকে সোজা জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, ওই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির সঙ্গ কি করে নিলো? ওঁকে তো ওর বাবার বয়সীই মনে হয়, তবে?

—"যদি জানতেই চান তো ওঁকেই বলুন সমস্ত কাহিনীটা আপনাকে শোনাতে। দেখবেন যেন কিছু বাদ না যায়—মেয়েটি হাসতে হাসতে বললো।

যখন ক্যাপ্টেনকে বোঝানো গেল যে, কাহিনীটা বলায় মেয়েটির একটুও আপত্তি নেই, তখন তিনি সুরু করলেন বলতে। "আমার ছ' মাসের ছুটী ছিলো। তাই ভাবলাম, রোমেতেই ছুটিটা কাটিয়ে আসবো। আমার ধারণা ছিলো, শিক্ষিত সমাজে সবাই বুঝি লাতিন ভাষা জানে। কিন্তু যখন দেখলাম আমার ধারণা একেবারেই মিথ্যে, তখন বুঝতেই পারছেন কি অসহ্য অবস্থা আমার হোলো। কোনো রকমে একটি মাস কাটার পর কার্ডিন্যাল আলবেনী যখন আমাকে কাজের জন্য পারমা পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন, তখন আমি যেন বাঁচলাম। ওই সময় ক'দিনের জন্য এক জায়গায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে একদিন জেটির ধারে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় দেখলাম এক বৃদ্ধ অফিসার আর এই মেয়েটী একটা নৌকা থেকে নামলো। তখনও ওর ঠিক এই রকম পুরুষের বেশ। তা" হোক, মেয়েটির চেহারাটা ভারী ভালো লাগলো। অবশ্য ভুলেই যেতাম, পরে যদি না হোটেলে ফিরে দেখতাম আমার সামনের ঘরটাই ওরা দখল করেছে। খোলা জানলা দিয়ে দেখলাম, ওরা মুখোমুখী খেতে বসেছে—লক্ষ্য করলাম, দুজনেই নিঃশব্দে খেয়ে

গেল, একটিও কথা না বলে। খাবার পর মেয়েটি উঠে কোথায় বেরিয়ে গেল আর অফিসারটি চুপচাপ বসে কী পড়তে লাগলেন। পরদিন দেখলাম, মেয়েটি একলা, অফিসারটি কোথায় বেরিয়েছেন। সুযোগ বুঝে আমি আমার চাকরকে দিয়ে ওকে লিখে পাঠালাম, যদি ও আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে রাজী হয়, তাহলে আমি ওকে দশ সেকুইন দেবো। মেয়েটি বলে পাঠালো, আজ খাবার পরেই ওরা রোমে চলে যাচ্ছে। ইচ্ছা হোলে আমি সেখানে ওর সঙ্গে দেখা করতে পারি।

রোমে ফিরে এলাম। ওই মেয়েটির চিন্তা নিয়ে আর একটুও মাথা ঘামাই নি। শেষে যখন আমার চলে যাবার আর দুদিন মাত্র বাকী, এমন সময় আমার চাকর এসে বললে, মেয়েটিকে দেখেছে, কোথায় উঠেছে তাও দেখেছে। আর এখনও সেই অফিসারটির সঙ্গে আছে। আমি বলে পাঠালাম মেয়েটিকে যেমন করে হোক জানাতে যে আমি কালই রোম থেকে চলে যাচ্ছি। মেয়েটি জানালে ঠিক ক'টার সময় কোন গাড়ীতে আমি যাবো জানলে ও আমার সঙ্গে শহরের বাইরে দেখা করতে পারে…আমার সঙ্গে গাড়ীতে উঠে পড়তেও পারে। স্থান, কাল সব জানালাম। যথাসময়ে মেয়েটি এসে গাড়ীতে উঠে পড়লো ব্যস, সেই থেকে আমার সঙ্গেই আছে। ওর কাছ থেকে এটুকু বুঝেছি যে ও আমার সঙ্গেই 'পারমা' যেতে চায়, সেখানে ওর কি কাজ আছে…আর রোমেতে ও আর ফিরতে চায় না। বুঝতেই পারছো পরস্পরের কথা না বোঝায় কি অসুবিধাতেই পড়তে হোয়েছে। এমন কি, এটুকুও আমি ওকে বোঝাতে পারিনি যে যদি কেউ আমাদের পিছু নিয়ে থাকে, ওকে যদি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যায় আমি কিছুই

করতে পারবো না। আমি একেবারেই ওর কোনো পরিচয় জানি না: কে, কোথা থেকে এলো কিছুই না—শুধু জানি ওর নাম হেনরিয়েটা। ও ফরাসী কি না আসলে তা'-ও ঠিক জানি না। তবে এটা দেখেছি অত্যন্ত শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির মেয়ে, তাছাড়া মনে হয় বেশ উচ্চশিক্ষিতা। মেয়েটির উপস্থিত বুদ্ধিও যেমন সাহসও তেমনি। আপনাকে যদি ও নিজের কাহিনী বলে আর আপনি যদি দয়া করে লাতিনে আমায় সেটি শোনান তাহলে আমি কত যে খুশী হই, বলতে পারি না। সত্যিই ওর ওপর আমার একটা টান পড়ে গেছে, ওর অকৃত্রিম বন্ধুই হোতে চাই আমি—'পারমা'তে ও চলে যাবে মনে হোলেও আমার ভীষণ কষ্ট হয়। ওকে বলুন আমি ত্রিশটি সেকুইন উপহার দিতে চাই—সাধ্য থাকলে আরও বেশী দিতাম।"

ক্যাপ্টেনের কাছে শোনা কাহিনীটা হেনরিয়েটাকে অনুবাদ করে শোনাতে গিয়ে দেখলাম ওর মুখ রাঙা হোয়ে উঠেছে। কিন্তু দ্বিধাহীন ভাবে সব কাহিনীটাকে স্বীকার করলে। তারপর আমাকে বললে "আপনি ওঁকে বলুন, যে জন্যে মিথ্যা কথা বলতে পারবে না ঠিক সেই জন্যেই সত্য কাহিনীটাও বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আর ঐ ত্রিশ সেকুইনের আধখানা সেকুইনও আমি নিতে পারবো না—উনি জোর করলে শুধু দুঃখই পাবো। 'পারমা' তে পৌছে আমি ওঁর কাছে বিদায় নিতে চাই, আর আমার ইচ্ছামত পথেই আমি যেতে চাই। উনি যেন জানতে না চান আর ভবিষ্যতে যদি কখনও আমার সঙ্গে দেখা হয়, তবে দয়া করে না চেনার ভান করলেই আমি সব চেয়ে অনুগৃহীত হবো।"

বেচারী ক্যাপ্টেনটি সব শুনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোলেন মনে হোলো। জানতে চাইলেন মেয়েটির কোনো কিছুর প্রয়োজন বা অভাব আছে

কি না। উত্তরে হেনরিয়েটা জানালে, তার জন্যে ওঁর ব্যস্ত হবার একটুও দরকার নেই।

এর পর কথাবার্তা আর মোটেই জমলো না। আমিও উঠে পড়ে ওদের 'শুভরাত্রি' জানালাম। লক্ষ্য করলাম, হেনরিয়েটার মুখ আরক্ত হোয়ে উঠেছে।

মেয়েটি কে? নিজের মনেই ভাবতে লাগলাম, কি আশ্চর্য সংমিশ্রণ ওর মধ্যে? ওর ওই পবিত্র সরল স্বভাব; ভদ্র সংযত ব্যবহারের সঙ্গে এমন চরম উচ্ছৃঙ্খলতা কেমন করে সম্ভব হয়? কে ওর জন্যে 'পারমা'তে অপেক্ষা করে আছে? ওর প্রেমিক না ওর স্বামী? ওখানকার কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে কি ও? কে জানে, রোমে সেই অফিসারটির কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই ক্যাপ্টেনের সঙ্গে পালিয়ে এসেছে কি না? যাই হোক, ওদের সঙ্গে আমার ভ্রমণের উদ্দেশ্যটা মেয়েটিকে জানাতেই হবে। নাহলে এ সবই তো পণ্ডশ্রম।

পরদিন এক সময় সুযোগ বুঝে জিজ্ঞাসা করলাম, "ক্যাপ্টেনকে যে সব আদেশ করলেন আমার উপরও ঐ একই আদেশ জারী করবেন নাকি?" উত্তরে বললে,—"আদেশ বলছেন কেন? আদেশ করবার কি অধিকার আমার? ও শুধু অনুরোধ। আমি ওঁকে অনুগ্রহ করে আমার সম্বন্ধে নির্লিপ্ত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছি। আপনিও যদি আমার বন্ধু হন তবে আপনাকেও ওই একই অনুরোধ আমার"—

—"ভদ্রে, যা আপনি বললেন তা' মেনে চলা ফরাসীদের পক্ষে সম্ভব হোলেও একজন ইতালীয়ের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। একই শহরে থাকবো অথচ দেখা-সাক্ষাৎ করবো না? আমার পক্ষে তা

সম্ভব নয়। তাহলে আপনার উপরই নির্ভর করছে আমার এখানেই বিদায় নেওয়া কিম্বা আপনাদের সঙ্গে যাওয়া। যদি বলেন আমি আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি, তাহলে গোড়াতেই সাবধান করে রাখছি শুধু বন্ধুত্বেই আমি তৃপ্ত নই—বন্ধুত্বের চেয়েও গভীর সম্পর্ক গড়ে তুলতে চাই—কথা দিন আমাকে? ভয় নেই, ক্যাপ্টেনের মনে কিছুমাত্রও আঘাত দেবো না; তিনি বুঝেছেন আপনার প্রতি আমার মনোভাবটা কি। আশ্বস্তই হবেন, বিদায় বেলায় আমার মত নিরাপদ আশ্রয়ে আপনাকে রেখে গেলে। কিন্তু ও কি আপনি হাসছেন কেন?"

—"হাসবো না? আশ্চর্য লোক আপনি! এমনি করে কথা নিচ্ছেন একটা মেয়ের কাছে—একেবারে সোজা খাঁড়া উঁচিয়ে? একটু বিনয়, একটু কোমলতা, একটু রঙ, একটু রস—একেবারে কিছুই না?" উচ্চ মধুর কণ্ঠে হেসে উঠলো হেনরিয়েটা।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি কোমল নই, আমি রসিক নই, আমি বীর নই—শুধু হৃদয়তাপের ভাপে-ভরা আমার সত্তা—শুধু জানি ভোগ করতে—বলুন, বলুন শীগগির, নষ্ট করবার মত সময় কই?"

—"চলুন আমাদের সঙ্গে পারমা অবধি," উত্তর এলো।

ওর হাতটিতে আমি চুম্বন করলাম। ঠিক সেই মুহূর্তেই ক্যাপ্টেন এসে পড়লেন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই উনি এটা নিলেন। তার পর আমাকে এক ধারে ডেকে নিয়ে জানালেন যে, ওঁর মনে হয় ওঁর একলাই পারমাতে চলে যাওয়া উচিত। আমরা না হয় দু'-একদিন পরে পৌছাবো। তাই ঠিক হোলো। বিদায় ব্যাপারটাও খুব সহজ আর স্বাভাবিক ভাবেই ঘটলো।

উনি চলে যাবার কয়েক দিন পর আমি হেনরিয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম···অর্থহীন, বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থায় ও পারমাতে কি করতো? স্বীকার করলে হেনরিয়েটা যে নানারকম অসুবিধায় ওকে পড়তে হোতো। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও বললে যে ও জানতো আমি ওকে দেখবোই—ও বুঝেছিলো যে আমি ওর বিপদের সময় পাশে দাঁড়াবোই। একটু থেমে, একটু দ্বিধার সঙ্গে বললে আমি যেন ওকে খারাপ না ভাবি, যা কিছু হোয়ে গেছে সে সব ঘটনার জন্য দায়ী ওর শ্বশুর আর স্বামী। দুজনেই শুধু নিষ্ঠুর নয় নরপিশাচ।

পারমা'তে এসে আমি আমার মায়ের কুমারীবেলার পদবী 'ফারুসী' নামের সঙ্গে যোগ করলাম। আর হেনরিয়েটা নাম নিলে অ্যানি দ্য' আরসি। আমরা একটা হোটেলে গিয়ে উঠলাম। একটি ফরাসী ছোকরা চাকরেরও ব্যবস্থা করে ফেললাম। তারপর বাজারে ঘুরতে ঘুরতে বড় একটা দোকানে ঢুকে চাইলাম চব্বিশটা সেমিজ করবার মত খুব ভালো কাপড়, কয়েকটা পেটিকোট, কিছু দামী মসলিন রুমালের জন্য। তারপর দোকানীকে আমার ঠিকানা দিয়ে একজন দর্জ্জি পাঠাতে বলে এলাম। কতকগুলি ভালো সিল্কের আর সুতির মোজাও কিনে নিলাম।

কি অপূর্ব মুহূর্তটি এলো! আগে থেকে এ-সব কেনার ব্যাপার আমি কিছুই বলিনি হেনরিয়েটাকে। কিন্তু জিনিস দেখে কি গভীর তৃপ্তি আর খুশীর হাসি ওর মুখে ফুটে উঠলো! একটুকু উচ্ছ্বাসের আড়ম্বর ছিল না—ছিলো কৃতজ্ঞতা ওর প্রকাশভঙ্গীতে—পছন্দের আর রুচির প্রশংসায়। আনন্দের উচ্ছ্বাস ছিল না কিন্তু খুশীর মিষ্টি হাসি আরও মধুর হোয়ে ফুটে উঠেছিলো।

দর্জিদের হাঙ্গামা চুকে গেলে দুজনে টেবিলে মুখোমুখি খেতে বসেছি এমন সময় ক্যাপ্টেন এসে হাজির। হেনরিয়েটা ছোট্টো মেয়ের মত ছুটে গিয়ে "বাবা" বলে ডেকে ওর হাত ধরে নিয়ে এলো। সবাই মিলে খুব পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। ক্যাপ্টেন দেখলাম সত্যিই খুব খুশী হোয়েছেন, সেই বেপরোয়া মেয়েটিকে এমন নিশ্চিন্ত পরিবেশে দেখে। সত্যিই ওকে আন্তরিক ভালোবাসতেন উনি।

সন্ধ্যায় খাবার পর দুজনে বসে গল্প করছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম হেনরিয়েটার মুখখানি অত্যন্ত ম্লান, বিষন্ন। কারণ জানতে চাইলে ও মৃদুস্বরে বললে,—"বন্ধু তুমি তো আজ অনেক টাকা আমার জন্যে খরচ করলে—সে কি আমার কাছ থেকে আরও বেশী মনোযোগের আশায়? আমি বিশ্বাস করি না সেকথা। কিন্তু জেনো আজ তোমাকে যত ভালোবাসি গত কালও ঠিক এমনিই ভালোবাসতাম—কিছু মাত্র কম নয়। তোমাকে আমি ভালোবাসি, সমস্ত মন দিয়ে ভালোবাসি। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস ছাড়া যা কিছু তুমি আমাকে দাও তার আর কোনো মূল্যই আমার কাছে নেই। শুধু আমাকে মনে করে এনেছো এই চিন্তাটুকুই তার দাম। কিন্তু যদি তুমি সত্যিই ধনী না হও ভাবো তো কতখানি আত্মগ্লানি আমার বাড়বে···অকারণ অনর্থক তোমার এই অপব্যয়?"

—"আমায় আজ এক মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে দাও যে আমি ধনী। আমি জানি তুমি আমাকে কোনো দিনই নিঃস্ব করবে না। কিন্তু আজ আর কোনো চিন্তা নয় শুধু বলো তুমি আমাকে ছেড়ে যাবে না—কখনও না, কোন দিনও না—কথা দাও—"

—"যতদূর সাধ্য চেষ্টা করবো। কিন্তু ভবিষ্যতের কথা কে বলতে পারে বলো? তুমি কি সম্পূর্ণ স্বাধীন? না তোমাকে কারো উপর নির্ভর করতে হয়?"

—স্বাধীন একেবারে পুরোপুরি স্বাধীন—"

—"ভালো অভিনন্দন জানাই তোমাকে। কিন্তু তার বেশী যে কিছুই বলতে পারি না। প্রতি মুহূর্তে ভয় করে, কেউ হয়তো দেখে ফেলবে চিনে ফেলবে আর ছিনিয়ে নিয়ে যাবে তোমার বাহুবন্ধন থেকে—"

"—অমন করে বোলো না—সত্যিই কি তোমার মনে হয় এমন বিপদও ঘটতে পারে?"

—"না, অবশ্য পরিচিত কেউ যদি আমাকে দেখে না ফেলে—"

—"যে অফিসারটি রোমে তোমার সঙ্গে ছিলেন তাঁর কাছে ধরা পড়ার ভয় করছো?"

—"একটুও না—তিনি তো আমার শ্বশুর—আমার খোঁজ নেবার জন্যে তাঁর একটুও মাথাব্যথা নেই, এ আমি জানি। বরং আমার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে তিনি বেঁচেছেন। কেন ছেলেদের পোষাক পরে পাগলের মত ব্যবহার করেছি জানো—উনি আমাকে জোর করে একটা কনভেন্টে ভর্তি করাতে চেয়েছিলেন, আমার আন্তরিক অনিচ্ছা সত্বেও। কিন্তু বন্ধু, আর নয় তুমি জানতে চেয়ো না আমার কাহিনী। ও অমনিই রহস্যে ঢাকা থাক।"

—"তোমার এই গোপনতাকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু মানসী আমার মনের কোণ থেকে আজ ভয়ের কাঁটা সরিয়ে ফ্যালো, শুধু ভালোবাসার ফুল ফোটাও—শুধু ভালোবাসো।

একটানা আনন্দের স্রোতে কাটতে লাগলো দিনগুলি—কেটেই যেতো হয়ত চিরদিন, কিন্তু কুক্ষণে দেখা হোলো, পরিচয় হোলো, কুঁজো ম্যসিয়ে ড্যুবোয়ার সঙ্গে। একটা লাইব্রেরীতে এই ফরাসী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। ওঁর কথাবার্তা পরিহাসপ্রিয়তা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি আমাকে এত মুগ্ধ করলো যে সে পরিচয় লাইব্রেরীতেই শুধু সীমাবদ্ধ রইলো না, আমাদের হোটেলের ছোটো বাসাটির দরজাও অবারিত রইলো ওঁর জন্য। কুক্ষণে ওর সঙ্গে হেনরিয়েটার পরিচয় করালাম।

গান-পাগল হেনরিয়েটা। আমি অপেরাতে নিয়ে যেতে চাইতাম। কিন্তু ভয়েই সারা হোতো ও, পাছে কেউ দেখে ফ্যালে। তাই পিছনের বক্স রিজার্ভ করতাম, কিন্তু সুন্দরী মেয়েরা সহজেই যে চোখে পড়ে। ভয়ের চোটে রুজ অবধি মাখতো না বেচারা—বক্সে আলো তো জ্বালাতামই না। কিন্তু নাছোড় ড্যুবোয়া হেনরিয়েটাকে নিমন্ত্রণ করবেই। শেষে একদিন বললে ওর বাড়িতে খেতে, আর কোনো অতিথি নয় শুধু আমরা। কিন্তু যখন পৌঁছলাম, দেখি বাড়ি-ভর্তি নিমন্ত্রিত। আড়চোখে দেখলাম হেনরিয়েটা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরেছে মনের উত্তেজনায়। কিন্তু সে সন্ধ্যাটা নির্বিঘ্নেই কাটলো।

হেনরিয়েটার সব চেয়ে ভয় ছিলো অভিজাত সমাজে মিশতে। কিন্তু ক্রমেই অসতর্ক হওয়ার ফলে আর ওই নাছোড় ড্যুবোয়ার পাল্লায় পড়ে রাজসভার উৎসবে পর্যন্ত যোগ দিলাম! আর সেই হোলো আমাদের কাল। সেখানে একটি বেশ সুপুরুষ অশ্বারোহী সৈনিক রাজ-পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে ফিরছিলো। তার দৃষ্টি বার বার দেখি আমার পার্শ্ববর্তিনীটির উপর পড়ছে। একবার আমাদের মুখোমুখী হওয়াতে আমরা পরস্পরকে অভিবাদন জানালাম। লোকটি কিন্তু তখনি ড্যুবোয়াকে একান্তে ডেকে নিয়ে মৃদু স্বরে কি

সব কথাবার্তা বলতে লাগলো। তার পর আমরা বিদায় নেবার আগে আবার এসে হাজির হোলো। অতি বিনীতভাবে হেনরিয়েটাকে লক্ষ্য করে বললে, ওকে যেন চেনে বলেই মনে হচ্ছে। —"কিন্তু আপনাকে তো কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না"—হেনরিয়েটা অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললো। "ঠিক আছে, কিছু মনে করবেন না, আমাকে মাপ করবেন—"

হ্যুবোয়া এসে বললে লোকটির নাম হ্য আঁতোয়ান। ও বলছিলো হেনরিয়েটাকে চেনে, তাই ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করছিলো। হ্যুবোয়া অবশ্য বলেছিলো চেনেই যদি, তবে আবার পরিচয়ের কি দরকার? কিন্তু তা শোনেনি ও।

স্পষ্ট দেখলাম হেনরিয়েটার চোখে মুখে একটি অস্বস্তির ভাব ফুটে উঠেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হ্য আঁতোয়ানকে যে না চেনার ভান করলো সেটা কি সত্যি, না ইচ্ছে করেই চিনতে চাইলো না?

—"চিনি না ঠিকই হেনরিয়েটা বললে, "তবে ওর নামটা চেনা—খুবই চেনা। প্রভেন্সে ওরা বেশ নামকরা পরিবার, কিন্তু ওই লোকটিকে এর আগে কখনও দেখিনি।"

ফিরে এলাম হোটেলে। কিন্তু হেনরিয়েটাকে দেখে আমার মনের সমস্ত আনন্দ নিমেষে অন্তর্হিত হোলো। কি ত্রস্ত, চঞ্চল ভাব! মিষ্টি হাসিভরা মুখখানি কোন অজানা ভয়ে ম্লান হোয়ে গেছে। এক অশুভ কালো ছায়া আমার মনের সব আলো যেন ঢেকে দিলো।

সেই সন্ধ্যাতেই আমার চাকর এসে আমাকে একখানা চিঠি দিলে। বললে, পত্রবাহক অপেক্ষা করছে উত্তরের। চিঠিখানা হাতে নিয়ে হেনরিয়েটার কাছে গেলাম।

—"হেনরিয়েটা, কেন এই চিঠিটা এলো বলতো? আমার একটুও ভালো লাগছে না, খালি মনে হচ্ছে যেন কোনো অশুভ ইঙ্গিত এটা ব'য়ে এনেছে। আমার খুলতেও ইচ্ছে হচ্ছে না।"

আমার হাত থেকে চিঠিখানি নিয়ে হেনরিয়েটা খুলে ফেললো। আমাকেই সম্বোধন করে লেখা—

—"অন্তত কয়েক মিনিটের জন্যেও দয়া করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আমার বাড়িতে কিম্বা আপনার বাড়িতে যেখানে আপনার ইচ্ছা। কয়েকটি বিশেষ কথা আছে—যা আপনার শোনা একান্ত প্রয়োজন।

ইতি

দ্য আঁতোয়ান।"

পত্রের উত্তরে জানালাম সম্মতি—আর নির্দেশ দিলাম স্থান আর কালের। দেখা হোতেই দ্য আঁতোয়ান প্রথমেই বললেন,—"বাধ্য হোয়েই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ চাইলাম। কারণ, অন্য কারো হাতেই মাদাম দ্য' আরসি'র এই চিঠিটা দেওয়া নিরাপদ নয়। এই চিঠিটা শীলমোহর করে আপনার হাতে দিতে হোলো বলে ক্ষমা করবেন। যদি আপনি ওর প্রকৃত বন্ধু হ'ন তবে চিঠির বিষয়বস্তু আপনাদের দু'জনকেই আকৃষ্ট করবে। চিঠিটা ঠিক ওঁর হাতে পৌছবে তো?"

—"আমি কথা দিচ্ছি, আপনি নিশ্চিন্ত হোন—"

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হেনরিয়েটার কাছে গেলাম। সব বলার পর চিঠিখানি দিলাম। তাড়াতাড়ি চিঠিখানি খুলে ও পড়তে লাগলো—লক্ষ্য করলাম, পড়তে পড়তে ওর মুখের প্রতিটি রেখায় ফুটে উঠছে গভীর উত্তেজনার আর আবেগের ছাপ।

—"বন্ধু আমার, লক্ষীটি রাগ কোরো না, এ চিঠি তোমাকে দেখাতে পারলাম না বলে—দু'টি পরিবারের মানসম্ভ্রম আজ বিপন্ন। এই 'দ্য আঁতোয়ান' ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাকে দেখা করতেই হবে, ইনি বলছেন ইনি আমাদের না কি আত্মীয় হ'ন।"

—"ওঃ! তাহলে আগমনী শেষ না হোতেই বিসর্জনের বাজনা সুরু হোলো? জানি না কি কুক্ষণে ওই হতভাগা দ্যবোয়াটাকে বাড়ি ঢুকতে দিয়েছিলাম"—আমি আর্তস্বরে বলে উঠলাম।

—"বিশ্বাস কর, এই দ্য আঁতোয়ান আমার সমস্ত ব্যাপারটাই জানেন, উনি সত্যিই সৎপ্রকৃতির লোক, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করবেন না। কিন্তু প্রিয়তম, যদি ঘটনাচক্রে বিচ্ছেদের প্রয়োজন হয় তাহলে তুমি ভেঙে পোড়ো না, আমাকে জোর দিও, যেন সঙ্কল্পচ্যুত না হই। বন্ধু আমার, বিশ্বাস কর, তোমার কাছে যে শান্তি আমি পেয়েছি তা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা আমি শেষ অবধি করবো—"

মেনে নিলাম—কিন্তু মনে নিলাম কি? হতাশার কালো মেঘে মনের আকাশ ভরা। দু'জনার প্রেমেই তখন বিষাদের সুর বাজছে—বিদায়ের পূর্বাভাষ কি? কত সময়ে দু'জনে বসে থাকি মুখোমুখী, কোনো কথাই বলা হয় না শুধু শোনা যায় সুগভীর দীর্ঘশ্বাস···

পরদিন যখন দ্য আঁতোয়ান হেনরিয়েটার সঙ্গে দেখা করতে এলেন তখন আমি অন্য ঘরে উঠে এলাম জরুরী চিঠি লেখার ছল করে—কিন্তু ঘরের দরজা খোলাই রেখেছিলাম···সামনের আয়নায় ছায়া পড়ছিলো ওদের। দীর্ঘ ছ'টি ঘণ্টা চললো ওদের আলাপ-আলোচনা কথা আর লেখা। কিন্তু শ্রবণে বঞ্চিত হোয়ে সে যে কী যন্ত্রণাদায়ক মুহূর্তগুলি কেটেছিলো!

সেই রাহুরূপী দ্য আঁতোয়ান বিদায় হোতেই হেনারয়েটা আমার কাছে এলো—"বন্ধু, কালই আমরা এখান থেকে চলে যেতে পারি কি না বলো তো ?"

—"হ্যা ভগবান, তুমি যা বলবে আমি তাই করবো, কিন্তু কোথায় তোমাকে নিয়ে যেতে বলছো ?"

—"যেখানে তোমার খুশী ! কিন্তু পনরো দিন পরে আমাদের এখানে ফিরতেই হবে।"

আমি কথা দিয়েছি সে সময় আমার লেখা চিঠির উত্তর আমি এখান থেকেই নেবো। না, না, ভেবো না আমি ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছি—আসলে এ জায়গাটা আর এক মুহূর্ত্তও সহ্য করতে পারছি না।

সবই বুঝলাম···সবই ভবিতব্য। গেলাম মিলানে—চোদ্দটি দিনের ভিতর এক দরজী ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো লোকের সঙ্গে আমরা দেখা করিনি। আমি দরজীকে দিয়ে হেনরিয়েটার জন্যে বহুমূল্য একটি পোষাক করিয়ে দিলাম···ওর বিদায়োপহার। আর ওই চোদ্দ দিনে জলের মত অকাতরে ব্যয় করতে লাগলাম আমার সঞ্চয়। একটি প্রশ্নও করেনি হেনরিয়েটা আমার এই অর্থব্যয়ের প্রাচুর্যে। পারমাতে ফিরলাম যখন তখন পকেটে তিন-চার সেকুইন অবশিষ্ট আছে।

যেদিন এলাম তার পরদিন আবার দ্য আঁতোয়ানের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা—আমাদের বিচ্ছেদ হোলো সুনির্দিষ্ট। হেনরিয়েটা এলো কাছে, জানালে উপায় নেই আর···এখনি জেনিভাতে যেতে হবে আমাদের, সেখান থেকে ও চলে যাবে।

বিদায়ের মুহূর্ত এলো। দুঃসহ বেদনায় আচ্ছন্ন দু'জনার মন। সেই সীমাহীন ব্যথার প্রকাশ শুধু অবিরল অশ্রুধারায়।

—"ভাগ্য যখন বিচ্ছেদই এনে দিলে তখন আর ফিরে চেয়ো না আমাকে…যাকে হারাতে হোলো তাকে হারিয়েই ফেলো, খবরের জন্য ব্যাকুল হোয়ো না…যদি কখনো দেখতে পাও তবে অপরিচিতের দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলো তোমার চোখে…"

যাবার বেলায় ক্ষণ-সঙ্গিনীর শেষ কথা। পরদিন ছোট্টো একটি চিরকুট পেলাম—তিনটি অক্ষর লেখা—'বিদায়'। আমার ঘরের জানলায় হঠাৎ চোখ পড়লো, দেখি কাচের উপর হীরার অগ্রভাগ দিয়ে কেটে কেটে লেখা—

"ভুলে যাবে, হেনরিয়েটাকেও একদিন ভুলে যাবে" আর একখানি চিঠি কয়েক দিন পর পেলাম—সেই প্রথম আর শেষ চিঠি—

—"বন্ধু, অদৃষ্টই জোর করে আমাকে ছিনিয়ে এনেছে তোমার কাছ থেকে…আমাকে ভুলে যেও…স্মৃতির ভারে দুঃখকে আরও নিবিড় করে তুলো না। মনে কর তিনটি মাসের এ এক নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বপ্ন। এত আনন্দ, এমন রঙীন মায়া, এমন সুধারসে ভরা ক্ষণগুলি সঞ্চিত থাক মনের মণিকোঠায়…যাক না ভেসে ক্ষণ-সঙ্গিনী… স্বপ্নচারিণী হোয়েই রইল সে। আমি ভালো আছি, তোমাকে ছেড়ে যতখানি ভালো থাকা সম্ভব। আমি আজও জানি না তুমি কে? কিন্তু তোমার মনের এত কাছে দুনিয়ায় আর কেউ এসেছে কি? তোমার প্রতিটি চিন্তার সঙ্গে শুধু আমারি তো ঘটেছে পূর্ণ পরিচয়।

আমার অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে—সে অর্ঘ্য আমার ভালোবাসা—যে ভালোবাসা রূপায়িত হোয়েছে শুধু তোমাতেই…

কিন্তু তুমি থেকো না অপরিবর্তনীয়…ভালোবাসার আগমনী বাজুক…আবার তোমাকে সার্থক করে তুলুক আর এক হেনরিয়েটা— বিদায়….বিদায়!"

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম প্যারিসে এসে সব বিদেশীদের মতই আমি প্রথম উৎসুক হোলাম প্যালেস রয়্যাল দেখার জন্যে। নতুন অভিজ্ঞতা, পথ ঘাট মানুষ-জন সবই উপভোগ করছিলাম—মন্দ লাগছিল না পথের দু'ধারে খোলা ফুটপাথের উপরই ছোটো ছোটো টেবিলে সবাইকে পানাহার আর গালগল্পে মত্ত দেখতে। আমিও একটা টেবিলে বসে এক গ্লাস চকোলেটের অর্ডার দিলাম। উৎকৃষ্ট রৌপ্যআধারে নিকৃষ্ট পানীয় আস্বাদন করতে করতে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু খবর-টবর আছে কিনা। সরাইওলা জানালে যে একটি ছেলে হয়েছে। শুনেই পাশের টেবিল থেকে একজন বলে উঠলেন—"বাজে কথা, ছেলে নয় মেয়ে হয়েছে।" তৎক্ষণাৎ অন্য একটি ভদ্রলোক ওধার থেকে জবাব দিলেন—"আরে মশাই আমি এখনি ভার্সাই থেকে ফিরছি—ও ছেলে নয়, মেয়েও নয়"—

তারপর আমার দিকে চেয়ে মন্তব্য করলেন আমি নিশ্চয়ই বিদেশী। সবিনয়ে জানালাম আমি ইতালীয়। তখনি ভদ্রলোক প্যারিসের নাড়ী নক্ষত্র বর্ণনায় মুখর হোয়ে উঠলেন। ওঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম। প্রথম ভদ্রলোকটি আমার সঙ্গ ছাড়লেন না। দু'জনে বেড়াতে বেড়াতে এগোতে লাগলাম। একটা দোকানের সামনে দেখি অসম্ভব ভিড়।

—"কী ব্যাপার এখানে? আমি প্রশ্ন করলাম।

—"নস্যির কৌটা ভরবার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে"—

—"সে কি! শহরে আর তামাকের দোকান নেই নাকি?"

—"আরে না মশাই, বহুৎ আছে। আসলে গত সপ্তাহে ডাচেস অ্ চার্টার এই দোকানেই দু'-তিন দিন গাড়ী থামিয়ে নেমে এসে নস্যি কিনেছেন, ব্যাস তাইতেই ওটা মস্ত ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেল। প্যারিসের লোকেরা যাদের প্রতি মুগ্ধ হয় যাদের প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হয় সেই সব 'দেবতা'রা যা কিছু করেন তাই নতুন আর তাই-ই ফ্যাশান। তারাও সুযোগটা পুরোপুরিই নেন। ঐ তামাকের দোকানী মেয়েটি ডাচেসের সুনজরেই ছিলো, তাই তার ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন তিনি এইটুকু কৌশলেই"—

প্যারিসের হালচাল দেখতে দেখতে আমরা বিখ্যাত অভিনেত্রী সিলভিয়ার বাড়ির সামনে গিয়ে পৌঁছালাম। সে রাত্রে সেখানে আমার নিমন্ত্রণ ছিলো। ভদ্রলোকটি সেখানেই বিদায় নিলেন। সিলভিয়া আমাকে ভিতরে নিয়ে অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। 'ক্রেবিল' নামটি শুনতেই আমি চমকে উঠলাম।

—"বলেন কি! কি সৌভাগ্য আমার! গত আট বছর ধরে আপনার লেখা পড়ে আমি মুগ্ধ। আমি কল্পনাও করিনি কোনো দিন আপনার সাক্ষাৎ পাবো—মনে মনে অথচ কি আকাঙ্ক্ষাই না ছিলো আমার আপনাকে দেখতে, আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে—আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে একটু সময় দিন"—

এই বলে আমি ওঁকে ওর এক বিখ্যাত রচনায় আমার স্বরচিত ইতালীয় অনুবাদ থেকে আবৃত্তি করে শোনালাম। কি গভীর মনোযোগের আর আনন্দের সঙ্গেই না উনি শুনতে লাগলেন। ইতালীয় ভাষায় ওঁর মাতৃভাষার মতই দখল। আমি থামতেই উনি ঐ অংশটাই ফরাসীতে আবৃত্তি করলেন। আশী বছর বয়সের

বৃদ্ধের নিজের রচনা অন্যের ভাষায় আবৃত্তি করতে শুনে খুশীতে উচ্ছ্বসিত তখন তিনি। আমরা দু'জনে বহুক্ষণ কথাবার্তা বললাম। প্যারিস আর ফরাসীদের সম্বন্ধে আমার যা কিছু ভালো-মন্দ ধারণা হোয়েছে সবই আমি অকপটে জানালাম। উনি বললেন, প্রথম দিনের পক্ষে বিশেষ করে একজন বিদেশী হোয়ে আমার এই সমালোচনায় উনি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন যে, আমার উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমার বর্ণনার ক্ষমতারও যথেষ্ট প্রশংসা করলেন।

—"দেশে পা দিয়ে অবধি আমি ভাবছি কি করে ফরাসী ভাষাটাকে আরও ভালো করে আয়ত্ত করবো। আরও মার্জিত ভাবে বলতে পারবো। আমার পক্ষে একজন উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও কঠিন, কারণ ছাত্র হিসাবে আমি অত্যন্ত তার্কিক, সহজে কিছু মেনে নিতে পারি না; তাছাড়া অত্যধিক প্রশ্ন করি, আবার এই সব গুণাবলী সহ্য করবেন, এমন ধীর স্থির শিক্ষক পেলেও তাঁর পারিশ্রমিক দেবার ক্ষমতা আমার নেই"।

—"আজ পঞ্চাশ বছর ধরে আমি আপনার মতই ছাত্র খুঁজছি"—বললেন ক্রেবিলঁ—"আপনি যদি আমার বাড়িতে আসেন তবে আমিই আপনাকে পড়াবো, তাছাড়া পারিশ্রমিকও দেবো—আমার কাছে শ্রেষ্ঠ ইতালীয় কবিদের রচনা আছে, আমি সেগুলিকে ফরাসীতে অনুবাদ করতে চাই।"

কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে যে রাজী হোলাম সে বলাই বাহুল্য। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। চেহারায় সত্যি সুপুরুষ—প্রায় ছ'ফুট লম্বা, আমার চেয়েও তিন ইঞ্চি মাথায় বড়। চমৎকার কথা বলতে পারেন, সূক্ষ্ম পরিহাসেও তিনি বিখ্যাত। কিন্তু সাধারণতঃ লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পছন্দ করেন

না—সারাক্ষণ বাড়িতে বসে থাকেন পাইপ মুখে আর প্রায় গোটা কুড়ি বেড়াল চার পাশে নিয়ে। আশ্চর্য ওঁর এই বেড়াল-প্রীতি। একটি বৃদ্ধা ওঁর গৃহস্থালী দেখাশোনা করতেন, তাছাড়া একটি চাকর আর একটি রাঁধুনী এই নিয়ে ওঁর সংসার। বৃদ্ধাটি সব কিছুরই ভার নিয়ে ছিলেন, টাকা কড়ির হিসাব রাখা, খরচ করা, ওঁর প্রয়োজনীয় যা কিছু সব করা—শুধু কখনও হিসাব দিতেন না কাউকেই। অবশ্য স্রেবিলঁও কখনও চাইতেন না কোনো হিসাব। স্রেবিল জাতীয় সংবাদপত্র আর পুস্তকাদি মুদ্রণের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন; অনেক ধরনের লেখাই তাঁর কাছে আসতো, বৃদ্ধাটি সেই সব তাঁকে পড়ে শোনাতেন—যে সব জায়গাতে সন্দেহ হোতো সেখানে থেমে যেতেন, মাঝে মাঝে দু' জনের মধ্যে এই নিয়ে শোনবার মত তর্ক-বিতর্কও চলতো। আমিও একদিন এই বৃদ্ধাটিকে একজন নামকরা লেখককেই বলতে শুনেছিলাম—“আসছে সপ্তাহে আসবেন, এ সপ্তাহে আপনার পাণ্ডুলিপি আমাদের পড়বার সময় হয়নি”—

একটি বছর আমি স্রেবিলঁর কাছে যাতায়াত করেছি সপ্তাহে দু'-তিন বার করে। আমার ফরাসী ভাষায় যতটুকু অধিকার সবই ওঁর কাছ থেকে পাওয়া। ওঁর শিক্ষা পদ্ধতিও বিচিত্র! একবার আমি আট লাইনে একটি কবিতা রচনা করে ওঁকে সংশোধন করতে দিলাম। উনি সবটা পড়লেন তারপর বললেন—“এই আট লাইনে কোনো ভুল নেই—ভাবধারাও কবিত্বপূর্ণ, ভাষাও চমৎকার, কিন্তু তবুও কবিতাটি একদম বাজে হোয়েছে”—

—সে কি! কেমন করে তা হয় বুঝলাম না তো?”

—“তা বলতে পারি না, কি যেন একটার অভাব আছে কবিতাটার মধ্যে; যেটা ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না অথচ অনুভব

করছি। ধর একটি লোককে তোমার মনে হয় সুদর্শন, বুদ্ধিমান, শিক্ষিত, অমায়িক, এক কথায় তোমার মতে সম্পূর্ণ নিখুঁত। একটি মহিলা এলো, সেই ভদ্রলোকটিকে দেখলে আর যাবার সময় বলে গেল যে তার ভালো লাগেনি লোকটিকে। তুমি জিজ্ঞাসা করলে, কেন? কি ত্রুটি, কি অভাব আপনি ওঁর মধ্যে দেখলেন?—"কিছু না, মোট কথা আমার ভালো লাগেনি, কেন তা' জানি না।" তুমি ফিরে এসে আবার লোকটিকে দেখলে—এবার অবাক্ হোয়ে তুমি আবিষ্কার করলে যে ঐ মোহিনী কণ্ঠস্বর তোমার ভালো লাগার ভাবটিকে নিয়ে উধাও হোয়েছে। তোমার সমস্ত মন যেন জোর করেই মহিলাটির ঐ স্বতঃস্ফূর্ত মতামতেই সায় দিচ্ছে—"

এমনই ছিল ওঁর উপমা দেওয়ার ধরন। চতুর্দশ লুই-এর রাজসভায় তিনি পনেরো বছর ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই উনি শোনাতেন আমাকে। ক্রেবিলঁ বিয়োগান্ত রচনা 'ক্রমওয়েল' শেষ করতে পারেন নি চতুর্দশ লুই-এর জন্যেই। কারণ রাজা তাকে বলতেন ঐ হতভাগার উপর লিখে সময় নষ্ট না করাই উচিত। ভল্টেয়ারের উচ্চ প্রশংসা করতেন কিন্তু এ সঙ্গে এ-ও বলেছিলেন যে সিনেটের সমস্ত দৃশ্যটাই ভলটেয়ার ওঁর রচনা থেকে চুরি করেছেন। উনি বলতেন ভলটেয়ার জন্ম-ঐতিহাসিক, কিন্তু ঘটনার সঙ্গে বাস্তব-অবাস্তব কাহিনী জুড়ে তাকে মনোজ্ঞ করে তোলাই তাঁর প্রধান দুর্বলতা ছিলো—সেজন্যে ঐতিহাসিক সত্য অনেক ক্ষেত্রেই ব্যাহত হোতো। ওঁর মতে 'ম্যান ইন দি আয়রণ মাস্ক' নাকি সেই রূপকথা—চতুর্দশ লুই-এরও নাকি সেই একই ধারণা ছিলো।

বিদেশীদের পক্ষে প্যারিস মাঝে মাঝে একঘেয়ে লাগে, অবশ্য পরিচিতি-পত্র না থাকলে তো কোথাও যাওয়া সম্ভব হয় না। সেদিক

থেকে আমি যথেষ্ট সৌভাগ্যবান বলতে হবে। সেইজন্যে পনেরো দিনের মধ্যেই অভিজাত সমাজে আমার অবাধ গতিবিধি হোয়েছিলো।

একবার আমার সঙ্গে 'রয়েল একাডেমী অফ মিউজিকের' সদস্যা এবং জনপ্রিয় অভিনেত্রী মাদাময়জেল লা ফেল-এর পরিচয় হোয়েছিলো। একদিন তাঁর বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি, তিনি তিনটি ফুলের মত সুন্দর শিশুর সঙ্গে খেলা করছেন।

"আমি ওদের ভারী ভালবাসি"—তিনি বললেন—

—"আপনার ভালবাসার ওরা সম্পূর্ণ যোগ্য। অপূর্ব সুন্দর ওদের দেখতে কিন্তু তিন জনেই তিন রকম দেখতে—"

—"আশ্চর্য নয়—শান্ত স্বরে উনি বললেন—বড়টি একজন ডিউকের ছেলে, মেজোটি কঁতে দ্য এগমণ্ড এর ছেলে আর ছোটোটি মঁসিয়ে দ্য মেসেঁাক্সজের ছেলে সম্প্রতি মাদাময়জেল দ্য রোমেঁাভিলের সঙ্গে ওর বিয়ে হোয়েছে—"

—"মাফ করবেন, আমি ভেবেছিলাম আপনারই ছেলে ওরা—"

—"ঠিকই ভেবেছেন।"

হতভম্ব হোয়ে গেলাম শুনে আর ধিক্কার দিলাম নিজেকে ঐ বোকার মত প্রশ্ন করার। প্যারিসে নতুন এসেছি, এখানের হালচালও ভালো জানিনা তখন। পরে দেখলাম এ ধরনের ব্যাপার হামেশাই ঘটছে এখানে। দুই বিখ্যাত লর্ড—বুফার্স আর লুক্সেমবুর্গ খুব স্বাভাবিক ভাবেই নিজেদের স্ত্রী বদল করলেন—বাচ্ছারাও বদল করলো তাদের পদবী। বুফার্সরা হোলো লুক্সেমবুর্গ আর লুক্সেমবুর্গরা হোলো বুফার্স।

ফন্টেনব্লুতে পৌছবার পরদিন আমি পঞ্চদশ লুই-এর রাজসভাতে গিয়েছিলাম। পঞ্চদশ লুই-এর চেহারার মধ্যে সবচেয়ে চমৎকার

ওঁর মুখের প্রকাশভঙ্গি, কি অপূর্ব। আমার মনে হোয়েছিলো সত্যিকারের রাজকীয় সৌন্দর্যই আমি দেখলাম। একটুও সন্দেহ রইলো না মাদাম গু পম্পাডুরের কাহিনীতে, যে প্রথম দর্শনেই উনি রাজার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন আর তারপর আসতে চেয়েছিলেন রাজার কাছে। সত্যি না ও হোতে পারে, কিন্তু পঞ্চদশ লুইকে দেখার পর সব রটনা মন সহজেই সত্যি বলে মেনে নেয়।

রাজভবনের ভিতরের মহলে দেখতে দেখতে যেতে এক জায়গায় দেখলাম বারো জন কুরূপা মহিলা এগিয়ে আসছেন—তাঁরা হাঁটছেন বললে ভুল বলা হয়, এমন বিশ্রী ভঙ্গিতে দৌড়াচ্ছেন যে মনে হোলো এই বুঝি মুখ থুবড়ে পড়েন। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম ওঁরা কারা, আর অমন করে দৌড়াচ্ছেনই বা কেন? শুনলাম ওঁরা রাণীর খাস পরিচারিকার দল। ওঁদের জুতার হিল পুরো ছ'ইঞ্চি লম্বা তাই ওঁরা পড়ে যাবার ভয়ে অমন করে চলেছেন।

—"নীচু হিলের জুতো পরলেই পারেন"—

—"তাই কি হয়। উঁচু হিলই যে ফ্যাশন"

কি বেয়াড়া ফ্যাশন রে বাবা! এগিয়ে যেতে যেতে বিরাট সুসজ্জিত একটি হলে পৌছলাম। দেখলাম জন বারো সভাসদ ঘুরে বেড়াচ্ছেন আর হলের মাঝখানে বিরাট টেবিলে বিপুল আহারের আয়োজন। কিন্তু কার জন্য এত আয়োজন? উত্তর পেলাম রাণীর জন্য, এখনি তিনি আসছেন। ফ্রান্সের রাণী এসে ঢুকলেন হলটায়। খুবই সাদাসিধে পোষাক, মাথায় মস্ত টুপি, গালে অবধি এতটুকু রঙ লাগানো নেই। টেবিলে গিয়ে বসতেই বারো জন সভাসদ টেবিল থেকে দশ পা' পেছিয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ালো।

আমিও তাদের পাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম। রাণী কোনো দিকে না চেয়ে খেতে লাগলেন। যেটা ভালো লাগলো সেটা আবার চেয়ে নিলেন। তারপর চোখ তুলে সামনে সভাসদদের দিকে চাইলেন—ভাবখানা যেন কার সঙ্গে খাদ্যদ্রব্যের ছোটোখাটো বিষয়ে আলোচনা করবেন দেখে নিচ্ছেন। দেখার শেষে ডাকলেন।

—"ম্যঁসিয়ে দ্য লাওওেল?"—অপূর্ব-দর্শন এক রাজপুরুষ এগিয়ে এসে অভিবাদন জানালেন।

—"মাদাম?"

—"আমার মনে হয় এটা খুব উপাদেয় মুরগীর 'ফ্রিকাসে'।"

—"আমারও সেই একই মত মাদাম"—এই বলে অটল গাম্ভীর্যের সঙ্গে মার্শাল লাউওেল পিছিয়ে এসে নিজের জায়গায় দাঁড়ালেন।

'বার্গ—অপজুম' এর বিখ্যাত বিজয়ীকে স্বচক্ষে দেখে যেমন পুলকিত হোলাম ততখানি ক্ষুব্ধ হোলাম এই দেখে যে, অত-বড় বীরপুরুষকেও সামান্য মুরগীর রান্নার উপর অভিমত দিতে বাধ্য হোতে হোয়েছে—তাও এমন ভাবে যেন রাজ্য পরিচালনার কোনো গুরুতর বিষয়ে মতামত জানানো হচ্ছে। মনে মনে ভাবলুম, আমার সৌভাগ্য যে রাণীর আতিথ্য নিতে হয়নি।

* * * * *

একদিন আমার এক বন্ধুকে নিয়ে সেণ্টলরেণ্টের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে বন্ধুটি ঝোঁক ধরলে একটি ফ্লেমিশ অভিনেত্রীর সঙ্গে খেতে হবে। অভিনেত্রীর নাম 'মরফি'। মেয়েটি আমাকে কিছুমাত্র আকর্ষণ করেনি। কিন্তু বন্ধুকে এড়ানো শক্ত। গেলাম সঙ্গে। খাওয়ার পর্ব সারা হোলে বন্ধুটি রাতটিকেও একটু লোভনীয় করে তোলার তালে রইলো। আমাকেও এদিকে ছাড়বে না, আমি

জিজ্ঞাসা করলাম, ঘুমোবার মত একটা সোফা-টোফা অন্ততঃ জুটবে তো?

'মরফি'র একটি ছোটো বোন ছিলো—বছর তেরো বয়সের কিশোরী মেয়ে। সে বললে যে কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে ওর বিছানাটি আমায় ছেড়ে দিতে পারে। রাজী হলাম। ওই মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো ঘরে ঢুকে দেখি, টুকরো কাঠের উপর একটা মাদুর পাতা।

—"এটাকে তুমি বলছো বিছানা?"

—"ম্যঁসিয়ে! এছাড়া আর আমার বিছানা বলতে কিছু নেই—"

"—না; এ আমার চাই না—আর টাকাও তুমি পাবে না।"

—"আপনি কি কাপড়-জামা ছেড়ে শোবেন?"

—"নিশ্চয়ই—"

—"সে কি করে হবে! আমাদের তো বিছানার কোনো চাদর নেই?"

—"তাহলে তোমরা জামা-কাপড় পরেই শোও?"

—"মোটেই না।"

—"বেশ কথা, যেমন করে তুমি রোজ শুতে যাও তেমনি করে শুয়ে পড়। টাকাটাও তাহলে পাবে।"

—"কেন বল তো?"

—"কেমন তোমায় দেখায়, আমি দেখতে চাই।"

—"কিন্তু তুমি আমার কিছু ক্ষতি করবে না তো?

—"বিন্দুমাত্রও না।"

মেয়েটি ওই নোংরা মাদুরে শুয়ে পড়লো, গায়ে একটা ছেঁড়া পর্দা ঢাকা দিয়ে। সেই অবস্থায় ওর আবরণের তুচ্ছতা মনেও পড়লো না,

শুধু দেখলাম অপরূপ সৌন্দর্যরাশি। ওর নিরাবরণ প্রকৃত রূপটি দেখার জন্যে ব্যগ্র হোয়ে উঠলো সারা মন। সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করবার চেষ্টায় বাধা দিলে মেয়েটি—কিন্তু আরও কয়েকটি মুদ্রায় বাধা গেল সরে। দেখলাম ওর সৌন্দর্যে খুঁত নেই কোথাও, শুধু পরিচ্ছন্নতার নিদারুণ অভাব। নিজের হাতে ধুইয়ে দিলাম ওর সমস্ত মালিন্য।

পরদিন সেই ছোট্টো হেলেন ওর দিদির হাতে সমস্ত মুদ্রাগুলি তুলে দিলে একটিও না গোপন রেখে—কেমন করে উপায় করেছে তার বিবরণও দিলে। আমার খাবার আগে মরফি জানালে, ওদের বড় টাকার অভাব। আর আমার যদি মেয়েটার উপর নজর পড়েই থাকে ও না হয় টাকাটা কমিয়েই নেবে। আমি হেসে ফেলে বললাম, পরদিন আবার আমি ওকে দেখতে আসবো।

আমি বন্ধুটিকে ওর রূপের কথা জানাতে বন্ধুটি বাড়াবাড়ি বলে উড়িয়ে দিলে। কিন্তু সত্যিকারের জহুরী বলে নিজের গর্ব অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যেই আমি জোর করলাম বন্ধুটিকে হেলেনকে দেখার জন্যে —যেমন করে আমি দেখেছি। দেখবার পর বন্ধুটি স্বীকার করলে যে শ্রেষ্ঠ চিত্রকরও তুলির টানে ঐ সুষমা ফোটাতে পারে না। ও যেন শিল্পীর সাধনা···প্রকৃতির পরম বিস্ময়। ওর বৃষ্টিধোয়া ফুলের মত মুখখানি শুধু দৃষ্টিকেই মুগ্ধ করে না, আত্মাকেও ভরে তোলে অনাবিল আনন্দে, প্রশান্ত মাধুর্যে। ও শুধু সুন্দর নয় · অপরূপ। ওর নীল-আকাশের মত দু'টি আঁখি-তারায় কালো হরিণচোখের সব বিদ্যুতই স্থির হোয়ে আছে!

পরদিন আবার গেলাম ওকে দেখতে। ওর দিদিকে বললাম, আমি ওর বাড়িতে যত বার হেলেনকে দেখতে যাবো বারো ফ্রাঙ্ক

করে দেবো। ছ'শ ফ্রাঙ্ক আমার কাছে অত্যধিক মনে হোয়েছিলো, এই নিয়ে দর কষাকষি করে ঠিক হোলো আসা-যাওয়াই করবো যত দিন না মনে করি ছ'শ ফ্রাঙ্ক দিয়ে ওর উপর পূর্ণ আধিপত্য নেবার যোগ্যতা ওর আছে। এসব হীন দর কষাকষি ছাড়া উপায়ও ছিল না। কারণ, মরফি এমন শ্রেণীর মেয়ে যাদের নীতির কোনো বালাই নেই। অত টাকা দিতে আমার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কারণ ওর পশারিণী রূপের প্রতি আমার একটুও আকর্ষণ ছিল না—আমি ওর কাছে লালসা তৃপ্তির ক্রেতা হোয়ে যাইনি···সৌন্দর্যের পূজারী আমি, তাইতেই আমার সব পাওয়া হোয়েছিল।

ওর দিদি ভাবতো আমাকে খুব সহজেই প্রতারিত করেছে। দু'মাসে শুধু দৃষ্টির আনন্দেই তিন শত ফ্রাঙ্ক আমার খরচ হয়। ঐ অপরূপ দেহবল্লরী তুলির টানে রূপায়িত করার জন্যে আমার প্রবল আগ্রহ হোলো। একজন জার্মাণ চিত্রকরকে ছয় লুই দিয়ে আমি ওর ছবি আঁকিয়ে নিলাম। কি লীলায়িত ভঙ্গী! রক্তের মধ্যে যেন নেশা লাগিয়ে দেয়···উপাধানে ভর রেখেছে পেলব দুটি বক্ষের, এলিয়ে রয়েছে কমনীয় দু'টি বাহু, বিশ্বের মাধুর্য বুঝি একত্রিত হোয়েছে ওর দেহের নমনীয় কোমল কান্তিতে···আর কী অপরূপ গ্রীবাভঙ্গি! রাজহংসীর দর্পও চূর্ণ হোয়ে যায়। প্রতিভা আছে, রুচি আছে সেই চিত্রকরের, প্রতিটি তুচ্ছ রেখাও যেন তুলির টানে জীবন্ত হোয়ে উঠেছে···সৌন্দর্যের এমন পূর্ণ প্রকাশ বুঝি কল্পনাও করা যায় না। মুগ্ধ-বিস্ময়ে ছবিখানির তলায় আমি লিখে দিলাম—'ও-মরফি' যার অর্থ 'সুন্দর'।

কিন্তু ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুকানো থাকে কেউ কি জানতে পারে?

আমার সেই পুরাতন বন্ধুটি ছবির একখানি প্রতিলিপি চেয়ে পাঠালেন। বন্ধুর এই সামান্য অনুরোধ রাখতে আমি চিত্রকরটিকে আর একটি এঁকে দেবার জন্য জানালাম।

কিন্তু এই চিত্রকরটি ভার্সাইতে ডাক আসাতে সেখানে গিয়ে অন্য ছবির সঙ্গে ওই ছবিটিও প্রদর্শনীতে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেখানে মঁ্যসিয়ে দ্য সেণ্ট কুইণ্টিন ছবিটি দেখেন, এবং স্বয়ং রাজাকে দেখান। সবাই জানে, পঞ্চদশ লুই একজন প্রকৃত অনুরাগী সৌন্দর্যের। ছবিটি দেখে তিনি এত মুগ্ধ হোলেন যে, আসলটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চাইলেন। সেণ্ট কুইণ্টিনের উপরই তার ব্যবস্থাপনার ভার পড়লো।

বড় বোনের কাছে প্রস্তাবটি পাঠানো হোলো। মরফি তো সেই মুহূর্তেই উঠে-পড়ে লেগে গেলো বোনকে সাজাতে গোছাতে। দু'তিন দিনের মধ্যেই ওরা ভার্সাই যাত্রা করলো। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিলো মরফি। চিত্রকরটি তাদের সঙ্গে নিয়ে এলো। পৌঁছবার পর রাজার নির্দেশ মত দুই বোনকে প্রাসাদের অন্তর্গত একটি বাড়িতে রাখা হোলো আর চিত্রকরকে রাজার অতিথিশালায়। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর রাজা এলেন। একলাই এলেন। এসে পকেট থেকে ছবিটি বার করে 'ও-মরফি'র দিকে চাইলেন—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বার বার ওর আপদমস্তক লক্ষ্য করলেন আর ছবিটি দেখলেন। তারপর সহর্ষে বলে উঠলেন—"এমন আশ্চর্য মিল আমি কখনো দেখিনি।"

তারপর আসনে উপবেশন করে ও-মরফিকে ওঁর জানুর উপর বসালেন, আদর করলেন, চুম্বন করলেন।

আর ও-মরফি সারাক্ষণ ওঁর দিকে চেয়ে রইলো আর মুখ টিপে-টিপে হাসতে লাগলো।

—"হাসছো কেন তুমি ?"

—"হাসছি, কারণ আপনি ঠিক সেই বারো ফ্রাঙ্কের মতন দেখতে—"

ওর সেই সরল স্পর্দ্ধায় রাজা উদাসিন ভাবে হেসে উঠলেন। তারপর জানতে চাইলেন যে, ও ভার্সাইতে থাকতে চায় কি না।

ও-মরফির নিঃসঙ্কোচ উত্তর। "দিদি যা বলবে তাই হবে—"

দিদি তো তখুনি রাজী। সবিনয়ে জানালে এর চেয়ে সুখের বিষয় সে আর ভাবতেই পারে না। রাজা যাবার সময় ওদের বন্ধ করে রেখে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই সেণ্ট কুইণ্টিন এসে ছোটো বোনকে একটা মহলে নিয়ে গেল। আর মরফিকে জার্মাণ চিত্রকরটির কাছে।...চিত্রকরটিকে যাবার সময় ছবিখানির জন্য পঞ্চাশ লুই দিয়ে গেল। আর মরফিকে কিছু না দিয়ে ওদের ঠিকানা নিয়ে গেল। পরদিন মরফি হাজার লুই পেলে। চিত্রকরটি আমাকে পঁচিশটি লুই দিলে ছবিখানির দরুণ আর প্রতিজ্ঞা করলে, আমার বন্ধুর কাছের ছবিখানি দেখে সমস্ত মন দিয়ে অনুরূপ ছবি এঁকে দেবে। তাছাড়া বললে যত মেয়ের ছবিই আমি আঁকাতে চাই সব সে বিনা অর্থে এঁকে দেবে। সাধু প্রকৃতির সন্দেহ নেই।

অবশ্য হাজার লুই হাতে পেয়ে খুশীতে উপছে পড়া মরফিকে দেখেও কম আনন্দ পাই নি। অর্থের প্রাচুর্যে, আর আমাকেই তার একমাত্র উপলক্ষ ভেবে, আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেল না মরফি।

'কিশোরী সুন্দরী ও-মরফি'—রাজা এই বলেই ডাকতেন ওকে—রাজাকে ও মুগ্ধ করেছিলো ওর সরলতায়, স্পষ্টবাদিতায় ওর আশ্চর্য রূপের চেয়ে ওর মিষ্টি চালচলন আরও বেশী মনোহরণ করেছিলো রাজার।

'ডিয়ার-পার্কে'র একটি মহলে ওকে রেখেছিলেন—এটা ছিলো পঞ্চদশ লুইএর হারেম। রাজা ছাড়া কারো প্রবেশাধিকার ছিল না সেখানে। অবশ্য যে-সব মহিলারা রাজসভাতে উপস্থিত হোতেন তাঁদের যাবার অনুমতি ছিলো। একটি বছর পরে 'ও-মরফি'র একটি ছেলে হোলো। কিন্তু আর সবার মত তার দশাও যে কি হোলো—কেউ তা' জানে না। কারণ যত দিন রাণী মেরী বেঁচে ছিলেন তত দিন রাজা পঞ্চদশ লুইএর এই সব সন্তানদের ভাগ্য রহস্যের অন্ধকার গর্ভেই নিমজ্জিত ছিলো।

তিন বছর পরে 'ও-মরফি'র ভাগ্যতরী অতলে ডুবলো—তার মূলে ছিলো মাদাম ত্থ ভ্যালেণ্টাইন—প্যারিসে এই মহিলাটি বেশ পরিচিতই ছিলেন। তাঁর হিংসাই ওর সর্বনাশের মূল। একদিন ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে মাদাম ত্থ ভ্যালেণ্টাইন ওকে বলেন রাজাকে খুশী করতে হলে, হাসাতে হলে জিজ্ঞাসা করতে হয় বৃদ্ধা রাণীটির সঙ্গে রাজা কেমন ব্যবহার করেন। নির্বোধ বালিকা এই প্রতারণার জালে পা দিলে—রাজাকে এই অপমানজনক প্রশ্ন করে বসলো। পঞ্চদশ লুই ক্রোধে জ্ঞানহারা হোয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"বদমাইশ মেয়ে, কে তোমাকে এ প্রশ্ন করতে শিখিয়েছে, তার নাম বল ?"

বেচারী 'ও-মরফি' ভয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রাজার পায়ের তলায় আছড়ে পড়ে সব ঘটনাই খুলে বললো। রাজা চলে গেলেন ওর মহল ছেড়ে। তারপর কখনো আর ওর মুখদর্শন করেন নি। মাদাম ত্থ ভ্যালেণ্টাইনকেও রাজসভা থেকে বহিষ্কৃত করা হয়। এবং দুই বছরের মত প্রবেশ নিষেধ করে দেওয়া হয়। রাজা পঞ্চদশ লুই ভালো ভাবেই জানতেন রাণীর প্রতি কতখানি অন্যায় তিনি করেছেন। কিন্তু রাণীর প্রাপ্য সম্মান দিতে এতটুকু ত্রুটি করেন নি।

অন্যে রাণীর প্রতি একটুও অসম্মান দেখালে তিনি কখনো তা সহ্য করেন নি।

'ও-মরফি'কে সাড়ে চারশ' হাজার ফ্রাঙ্ক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পরে একজন ব্রেটন অফিসারের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়।

বহু কাল পরে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে, একবার ফন্টেনব্লুতে একটি সুশ্রী সুন্দর তরুণ যুবকের সঙ্গে পরিচয় হোলো। পরিচয়ে বুঝলাম 'ও-মরফি'র বিবাহিত জীবনের পূর্ণতার প্রতীক ওই যুবক। মায়ের সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য—যদিও মায়ের পূর্ব-ইতিহাস সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমিও তাকে এ বিষয়ে কিছুই জানাতে চাইলাম না। শুধু ওর অটোগ্রাফ-বইতে আমার নামটি লিখে বললাম, ওর মাকে আমার শুভেচ্ছা জানাতে।

পঞ্চদশ লুই-এর সঙ্গে 'ও-মরফি'র যখন বিচ্ছেদ ঘটলো সে সময়ে আমি প্যারিসের জীবনে আরও বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করছিলাম। এ সময় আমার গূঢ় বিদ্যার বলে সব প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিতে পারি বলে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করছিলাম। ক্যামিলি নামে একটি মহিলা আমার এই বিদ্যায় মুগ্ধ হোয়ে আমার সঙ্গে 'ডাচেস দ্য শাড্‌র' পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে তিনি আমাকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন যে, তাঁর আরও অনেক কিছু জানবার আছে আর এই গূঢ় বিদ্যার শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছাও আছে। আমি তাঁকে বললাম, যদি উনি লিখে জানান ওঁর প্রশ্নগুলি তাহলে তিন ঘণ্টার ভিতরই উত্তর দিতে পারি। উনি রাজী হলেন আর বার বার আমাকে শপথ করিয়ে নিলেন কোনো দ্বিতীয় প্রাণী যেন এ সম্বন্ধে কিছু না জানতে পারে—আর উত্তর লিখে এনে যেন ওঁর হাতেই দিয়ে যাই।

ডাচেসের বয়স ছাব্বিশ বছর। প্রাণোচ্ছ্বাস আর চঞ্চলতায় ভরা। অত্যন্ত আমোদপ্রিয় আর রসিকা বলেও ওঁর খ্যাতি ছিলো। এক কথায় মনোহারিণী···কিন্তু একটি ত্রুটি ওঁর থেকে গিয়েছিলো, সমস্ত মুখময় ব্রণের দাগে ভর্তি। যতগুলি প্রশ্ন উনি লিখেছিলেন সবই ওঁর প্রণয় সংক্রান্ত আর বর্ণের উজ্জ্বলতা আর মসৃণতা সংক্রান্ত। দাগগুলি সারাবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন তিনি।

পরদিন আবার 'প্যালেস রয়্যাল' এলাম ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, প্রশ্নের উত্তর জানাতে। প্রথম প্রণয় ঘটিত প্রশ্নটির উত্তরে স্রেফ অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়লাম। দ্বিতীয়টিতে হজমের গোলমালে নিজেই ভুগে ব্রণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই ছিলো আমার। আর আমার ডাক্তারী বিদ্যার ফলেও জানতাম, কোনো জোরালো প্রলেপ কিম্বা ওষুধে ও সারে না।

আমি নিঃসঙ্কোচেই বললাম, যদি সাত দিন আমার কথা মত চলেন তবে ঐ দাগ মিলিয়ে যাবে—আর যদি এক বছর চলেন তবে স্থায়ী ভাবেই সেরে যাবে।

উনি নিয়মিত, আর আমার নির্দেশ মত পানাহার সুরু করলেন, সমস্ত রকম প্রসাধন ত্যাগ করলেন আর সকালে, সন্ধ্যায় কলাপাতার নির্যাসে মুখ ধুতে লাগলেন। আট দিন পর ওঁকে দেখলাম বাগানে বেড়াচ্ছেন, উজ্জ্বল মসৃণ হোয়ে উঠেছে চামড়া আর একটিও ব্রণ নেই। আমাকে দেখে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। কিন্তু পরদিনই আবার ব্রণ দেখা দিল। তক্ষুণি আমার জরুরী তলব এলো। আমি গিয়ে বললাম, আমার গুপ্ত গণনার ফলে জেনেছি যে আপনি আমার দেওয়া নির্দেশ ঠিক মত মানেন নি। তখন তিনি স্বীকার করলেন যে একটু সুরা আর শূকরমাংস খেয়েছিলেন।

এই ভাবে ডাচেস প্রায়ই আমাকে ডেকে পাঠাতেন, অবশ্য ব্রণর চিকিৎসা করবার জন্যে নয়। কারণ আমার বিধি-নির্দেশ মেনে চলার মত ধৈর্য তাঁর আর ছিল না। মাঝে মাঝে পাঁচ, ছয় ঘণ্টাও একসঙ্গে দু'জনে বসে গল্প করেছি। রাতের খাওয়া, দুপুরের খাওয়াও বহুদিন ওখানেই সারতে হোয়েছে। আমি সত্যি বলতে কি ডাচেসের প্রেমেই পড়েছিলাম—কিন্তু সে কথা প্রকাশ করতে আমার আত্মসম্মানে বাধতো। একদিন ডাচেস এসে বললেন, আমার ঐ গূঢ় বিদ্যা দিয়ে আমি মাদাম দ্য পপিলিনেয়ারের বুকের দুরারোগ্য ক্যানসার সারাতে পারবো কি না।

তখনি আমি উত্তর দিলাম যে, ঐ ক্যানসারটা সম্পূর্ণ কাল্পনিক। মহিলাটি সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে আছেন।

—"কিন্তু সারা প্যারিসে জানে, উনি একের পর এক ডাক্তার দেখাচ্ছেন। কিন্তু তা' সত্ত্বেও আপনার কথাও আমি বিশ্বাস করছি।"

উনি গিয়ে ডিউক দ্য রিশেল্যুকে জানালেন যে ওঁর দৃঢ় বিশ্বাস মাদাম দ্য পপিলিনেয়ার সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। ডিউক সজোরে প্রতিবাদ জানালেন। তখন ডাচেস এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক বাজী রাখলেন, কিন্তু ডিউক তার বেলায় রাজী হোলেন না।

কয়েক দিন পর, ডাচেস বিজয় গর্বে আমার কাছে জানালেন যে ডিউক স্বীকার করেছেন যে ক্যানসারটা সত্যিই ভান। ম্ঁ্যসিয়ে দ্য পপিলিনেয়ারের করুণার উদ্রেক করার জন্যে যাতে তিনি স্ত্রীকে ক্ষমা করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন। ডিউক তা ছাড়াও বলেছেন, তিনি আনন্দের সঙ্গেই এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক দিতে রাজী যদি মাদাম দ্য শাড্ কোন গুপ্ত বিদ্যার বলে জেনেছেন সেটা প্রকাশ করেন।

—"যদি আপনি কিছু টাকা উপায় করতে চান তো বলুন আমি ওঁকে জানাই"—ডাচেস বললেন।

আমি ধরা পড়বার ভয়ে রাজী হলাম না। আমি জানি ডিউক অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অতএব টাকার মায়া না করাই ভালো। তা ছাড়া লা পপিলিনেয়ারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথা সবাই জানে।

এই সময় আমার ভাই ফ্রাঁসোয়া কয়েকটা চমৎকার ছবি এঁকে এনেছিল। ল্যুভার প্রদর্শনীতে দেবার জন্যে অনেক তদ্বিরের পর আমরা একসঙ্গে একখানা যুদ্ধের ছবি নিয়ে একটা নির্দিষ্ট ঘরে রাখলাম। নিজেরাও কাছেই বসেছিলাম। ক্রমেই দর্শক সমাগম হোলো। প্রথমেই একটি লোক ছবিটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে মন্তব্য করলে বাজে আঁকা হোয়েছে। তারপরই দু'তিনজন এসে ছবিটি দেখে হেসে বললে বোধহয় কোনো স্কুলের ছেলের আঁকা। ক্রমে ক্রমে প্রচুর দর্শক সমাগম হোলো আর প্রত্যেকেই ছবিটা নিয়ে এত হাসি ঠাট্টা সুরু করলেন যে ফ্রাঁসোয়া আর না সহ্য করতে পেরে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমরাও ওর সঙ্গে বাড়ি ফিরলাম—আমাদের চাকরটাকে বলে এলাম ছবিটা বাড়িতে নিয়ে আসতে। ছবিটা আসতেই ফ্রাঁসোয়া সেটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের তরবারি দিয়ে সেটাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ফেললো। তখনি ঠিক করেও ফেললে যে প্যারিস ছেড়ে চলে যাবে। অন্য কোথাও গিয়ে ভালো করে শিখবে, চর্চা করবে ওর পছন্দ মত শিল্পের। আমরা ঠিক করলাম ড্রেসডেন যাব। অগাষ্টের মাঝামাঝি প্যারিস ছেড়ে মাসের শেষাশেষি ড্রেসডেন পৌছলাম। সেখানে মা ছিলেন, বহুকাল পরে আমাদের দুই ভাইকে দেখে উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমাদের বুকে টেনে নিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ড্রেসডেন থেকে সোজা ভিয়েনা। কিন্তু ভিয়েনার নিরঙ্কুশ, বৈচিত্র্যহীন মন্থর দিনগুলি অসহ্য হোয়ে উঠলো এই জন্ম-যাযাবরের।

মনে পড়ে গেল নিজের দেশের কথা—পুরানো দিনগুলি পুরানো বন্ধু-স্বজনদের স্মৃতি নিয়ে জেগে উঠলো। পাড়ি দিলাম ভেনিসের পথে—

দীর্ঘ তিনটি বছর পর আবার দেখা হোলো পিতৃসম অভিভাবক, বান্ধব ম্যঁসিয়ে ছ্য ব্রাগাদাঁর সঙ্গে। দেহে মনের মাধুর্যে কোথাও এতটুকুও ফাটল ধরেনি—ঠিক আগের মতই অকৃত্রিম আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন আমাকে পেয়ে। আর তার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু দুটি বারবারো আর ডাণ্ডালোও কিছু কম খুশী হোলেন না—এই সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষে আমাকে অর্থে-সামর্থ্যে স্বচ্ছন্দ আনন্দের সঙ্গে ফিরতে দেখে।

আমার এইবারের গৃহে প্রত্যাগমন মোটের উপর শুভই হোয়েছিলো। রীতি-নীতি আর লোকচরিত্রে ইতিমধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাই অর্জন করেছিলাম। নম্র ভদ্র ব্যবহার, আভিজাত্যপূর্ণ সম্মানবোধ সবই আমার আয়ত্তে। আর তার সঙ্গে সাধারণের চেয়ে নিজেকে একটু উঁচুদরের বলে মনে করাটা তো আমার স্বভাবেই ছিলো—সেই পুরানো সবজান্তা ভাবটাও যে মনের মধ্যে সুড়সুড়ি দিত না তা নয় কিন্তু মনে মনে এবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হোয়েছিলাম, খুব সংযত আর গম্ভীর হোয়ে থাকবো!

ম্যঁসিয়ে ছ্য ব্রাগাদাঁর বাড়িতে আমার নিজের ঘরখানিতে এই তিনটি বছর পরে ঢুকে কি যে ভালো লাগলো! যেখানে

যেটি যেমন ভাবে রেখেছিলাম তেমনি ভাবেই রয়েছে। নড়চড় হয়নি কোথাও। আমার কাগজপত্রের উপর এক ইঞ্চি পুরু ধুলো দেখে বুঝলাম, কেউ সে-সবে হাত দেয়নি, সরায়নি। আমি বাড়ি ফিরবার কয়েক দিনের মধ্যেই আড্রিয়াটিক সাগরের সঙ্গে বাৎসরিক মিলনোৎসব স্থরু হোলো। ম্যঁসিয়ে গু ব্রাগাদঁা অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির আর নির্জনতাপ্রিয় ছিলেন। তাই এই উৎসবমত্ত দিনগুলি এড়াবার জন্যে কয়েক দিনের মত পাদুয়াতে থাকবেন ঠিক করলেন। আমিও তাঁর সঙ্গী হোলাম। পাদুয়াতে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে দু'একদিন পরেই শনিবারের একটা ডাকগাড়ীতে করে আমি ভেনিসের পথে ফিরলাম। কিন্তু এখানেও সেই কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবীর অদৃশ্য অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘটলো আর এক বিপর্যয়। যদি এক মিনিট আগে কি পরে বেরোতাম তাহলে হয়তো নির্বিঘ্নে যাত্রাই হোতো। কিন্তু জীবনের প্রতিটি বাঁকেই বৈচিত্র্য যার জন্যে অপেক্ষা করে তার জন্যে মসৃণ পথ কোথায়?

ওরিয়োগার কাছাকাছি আসতেই দেখলাম, একটা সুসজ্জিত ঘোড়ার গাড়ী অত্যন্ত দ্রুতবেগে আসছে। আমার গাড়ীর পাশ কাটিয়ে যেতেই দেখলাম, গাড়ীর মধ্যে অপূর্ব সুন্দরী একটি মহিলা আর জার্মাণ অফিসারের পোষাকে এক ভদ্রলোক রয়েছেন। কিন্তু পলকমাত্র—পরমুহূর্তেই আমার চোখের সামনে গাড়ীটা গতির বেগ সামলাতে না পেরে উল্টে গেলো আর মহিলাটি সজোরে ছিটকে গিয়ে নদীর পাড়ে পড়ে গেলেন—সেখান থেকে একেবারে নদীর বুকে গড়িয়ে যাচ্ছেন দেখে আমিও লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে ছুটে গেলাম মহিলাটিকে বাঁচাতে। আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে মহিলাটি কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন,

তারপর সম্বিত ফিরে পেয়ে চমকিত হোয়ে উঠলেন নিজের অসম্বৃত বেশবাস লক্ষ্য করে। অত্যন্ত লজ্জিত হোয়ে দ্রুততার সঙ্গে বেশবাস সংযত করে বার বার আমাকে ধন্যবাদ দিতে লাগলেন ওঁর ত্রাণকর্তা রক্ষাকর্তা বলে। ইতিমধ্যে ওঁর সঙ্গী ভদ্রলোকটিও উঠে এলেন, তিনি বিশেষ আহত হননি। পরস্পর ধন্যবাদের পালা শেষ করে আবার আমরা গাড়ীতে গিয়ে বসলাম—ওঁরা গেলেন পাদুয়ার দিকে আমি ভেনিসের দিকে।

পরদিন ভোরবেলা ছদ্মবেশে উৎসবে যাবার জন্য মুখোশে মুখ ঢেকে ব্যুশাঁতোর শোভাযাত্রায় যোগ দিতে গেলাম। আড্রিয়াটিকের বিবাহোৎসবের সমস্ত কৌতুকটাই নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। এই অদ্ভুত কৌতুক-উৎসব সারা ইউরোপের কাছে এক অভিনব ব্যাপার। স্বয়ং নৌ-সেনাপতি নিজের জীবন বাজী রাখেন আবহাওয়ার সঠিক খবর দেবার জন্যে। কারণ, আবহাওয়ার একটু ইতর-বিশেষেই জলযানটি উল্টে যাবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আর সেই সঙ্গে সমস্ত রাজ-কর্মচারী, বিভিন্ন রাষ্ট্রদূত, উচ্চবংশীয় বিশেষ সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায় সর্বসমেত 'দোজ' অর্থাৎ প্রধান শাসনকর্তার সলিল সমাধি অনিবার্য। আর সেই একান্ত শোকাবহ ঘটনা দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি ঘটে, তা' সত্ত্বেও সমস্ত ইউরোপই বিদ্রূপের হাসি হাসবে—বলবে, শেষ অবধি 'দোজ' অ্যাড্রিয়াটিকের সঙ্গে বিবাহটা পুরোপুরি সার্থক করতেই গেলেন!

টেবিলের উপর মুখোশটা রেখে এক জায়গায় বসে একটু কফি খেয়ে নিচ্ছিলাম—এমন সময় একটি মুখোশাবৃতা মহিলা এসে তাঁর হাতের পাখাখানা দিয়ে আমার কাঁধের উপর মৃদু আঘাত করে চলে গেলেন। মহিলাটিকে অচেনা দেখে আমি আরও বিষয়ে বিশেষ নজর না দিয়ে কফি শেষ করে মুখোশটা এঁটে বেরিয়ে

পড়লাম। জেঠির ধারে বেড়াতে বেড়াতে দেখি, ম্যঁসিয়ে স্ত ব্রাগাদাঁর গণ্ডোলা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আরও একটু গিয়ে 'লা পাই' এর সেতুর কাছে দেখি, সেই মুখোশটানা মহিলাটি খুব মন দিয়ে ভানুমতীর খেল দেখছেন। দশটি করে 'স্যু' দিলেই খেল দেখাচ্ছে। আমি এগিয়ে গেলাম মহিলাটির কাছে। পাশে এসে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে তখন অমন করে পক্ষ সঞ্চালনে তাড়না করার অধিকারটা তাঁর কোথা থেকে হোলো।

"ওটা হোলো একবার আমার প্রাণরক্ষা করে তারপর আমাকে না চেনার শাস্তি।"

মনে পড়লো সেদিন গাড়ী থেকে ছিটকে যাওয়া যে মহিলাটিকে বাঁচিয়েছিলাম তিনিই। উপযুক্ত অভিবাদনের পর জিজ্ঞাসা করলাম, ব্র্যশাঁতোর উৎসবে যেতে রাজী আছেন কি না।

—"খুব রাজী—অবশ্য যদি একটা নিরাপদ গণ্ডোলা পাই।"

—"আমার গণ্ডোলাতেই চলুন না, যদি আপত্তি না থাকে। এটা সব চেয়ে বড়ো গণ্ডোলা—"

সঙ্গের ভদ্রলোকটিব সঙ্গে পরামর্শ করে মহিলাটি সম্মতি জানালেন। যেমনি ওঁর গণ্ডোলাতে পা দিলেন, অমনি আমি অনুরোধ করলাম ওঁদের মুখোশগুলি খুলে ফেলতে। ওঁরা বললেন, বিশেষ কারণে ওঁরা লোকের কাছে অপরিচিতই থাকতে চান। তবে তাঁরা যে ভেনিসেরই লোক এটুকু নিশ্চিত ভাবেই জানালেন। আমি মহিলাটির পাশেই বসেছিলাম এবং পাশে বসার সুবিধাটুকু পুরোপুরি উপভোগ করার জন্য কিছু অগ্রসরও হোতে গিয়েছিলাম। কিন্তু প্রতিবারই মহিলাটি সরে বসে আমার উৎসাহকে নিবৃত্ত করছিলেন। উৎসব যাত্রার শেষে আমরা আবার ভেনিসে ফিরে

এলাম। অফিসার ভদ্রলোকটি আমাকে রাত্রে আহারের জন্য সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানালেন। রাজী হোলাম—কারণ মহিলাটির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে অত্যন্ত উৎসুক হোয়ে উঠেছিলাম। অবশ্য প্রথম দিনের সেই চকিতে দেখা রূপলাবণ্যই আমার মুগ্ধতার কারণ। অফিসারটি আমাদের দু'জনকে রেখে আহারের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

এই নিভৃত ক্ষণটুকুর প্রথম সুযোগেই আমি মহিলাটিকে জানালাম যে আমি ওঁর প্রেমে পড়েছি—মুখোশে মুখ ঢাকা থাকাতে এতটুকু দ্বিধা হোলো না বলতে—সেই সঙ্গে জানিয়ে দিলাম যে অপেরাতে আমার নিজস্ব একটি বক্স সংরক্ষিত আছে। আর—আর বেশী খোশামোদ না করে যদি মহিলাটির কাছে আশা পাই তবে কার্নিভ্যালের শেষ হওয়া পর্যন্ত ওঁর কাছে বহাল থাকতে রাজী।

—"আমার প্রতি নিষ্ঠুরতাই যদি আপনার মনোগত ইচ্ছা, তবে সেটা খুলে বলুন।"

"আপনিও খুলে বলুন, কার সঙ্গে কথা বলছেন বলে আপনার মনে হয়।"

—"একটি অতি মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে—তা' সে রাজকুমারীই হোক আর গরীব ঘরের মেয়েই হোক। আশা করি অন্ততঃ আজ থেকেও আপনার মাধুর্যের প্রমাণ পাবো, না হয়তো বলুন আহারের পরই নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিই।"

—"যা ইচ্ছে আপনি করুন, কিন্তু আমিও আশা করি আহারের পর থেকে আপনিও আপনার কথার ভঙ্গীটুকু পরিবর্তন করবেন—অমন কথার ভঙ্গীতে কি আকর্ষণ করা যায়? আমার মনে হয় এমন একটা বোঝাপড়া হবার আগে আমাদের পরিচয় হওয়া দরকার, বুঝতে পেরেছেন?"

—"হ্যাঁ বুঝেছি কিন্তু প্রতারিত হবার ভয়ও যে মনে রয়েছে।"

—' আশ্চর্য বৈশিষ্ট্য! যে ভয়ের সুরুতে এই ব্যাপারে যবনিকা পতন হোতো সেই ভয়ই তোমাকে আমার চোখে নূতন করে তুললো।"

"—আজ একটু আশার বাণী পেলে আমিও নতুন মানুষ হবো। কোমল নম্র মাধুর্যে আমিও ভরে উঠবো। এই অসম্বন্ধ প্রলাপও আর আপনাকে শুনতে হবে না"—

—"এই চুপ"—

দরজার প্রান্তে দেখা গেল অফিসারটিকে। তাঁর সঙ্গে আমরা হোটেলের নির্দিষ্ট খাবার ঘরটিতে গেলাম। ঘরে ঢুকতেই মহিলাটি মুখোশ খুলে ফেললেন। সেদিনের চেয়ে ওকে আরও সুন্দরী লাগলো। এবার মনে হলো যে প্রথমেই জানা দরকার অফিসারটির সঙ্গে মহিলাটির কি সম্বন্ধ। কারণ সেই বুঝেই আমাকে এগোতে হবে। খাবার পর ওদের নিয়ে অপেরায় গেলাম, সেখান থেকে আবার আমারই গণ্ডোলাতে ওঁদের বাড়ি পৌছে দিলাম। বিদায় নেবার সময় অফিসারটি আমাকে বললেন, কাল আপনার সঙ্গে দেখা করবো।"

—"কোথায়? কখন?"

—"সে তো দেখতেই পাবেন।"

পরদিন ভোর বেলাই তিনি এসে হাজির। প্রাথমিক সম্বর্ধনা জানানোর পর আমি তাঁর আসল পরিচয় জানতে চাইলাম অবশ্য খুবই সবিনয়ে। তিনি স্বচ্ছন্দেই সমস্ত পরিচয়ই দিলেন কিন্তু একটি বারও চোখ না তুলে। তিনি বললেন যে আমার নাম পি, সি। আমার বাবা একজন বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত ধনী; কিন্তু তাঁর সঙ্গে বিবাদ

করেই আমি চলে আসি। যদিও বাবার অজ্ঞাতসারে তাঁরই বাড়িতে একটি মহলে আমি থাকি। যে মহিলাটিকে আপনি দেখেছেন তিনি হলেন এজেণ্ট সি'র স্ত্রী। মাদাম'সি'রও তাঁর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটে, অবশ্য তার মূল আমিই—আমিও মাদাম 'সি'র জন্যেই বাবার সঙ্গে বিবাদ করেছি। আমি এই অফিসারের পোষাক পরি কারণ অষ্ট্রিয়ার সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন হিসাবে সে অধিকার আমার আছে—কিন্তু আমি কোনো দিনই কাজ করিনি। ভেনিসেতে গৃহপালিত পশু সরবরাহ করাব ভার আমি পেয়েছি—সাধারণতঃ হাঙ্গেরী থেকেই ওগুলি পাঠানো হয়। এই ব্যবসাতে বছরে প্রায় দশ হাজার ফ্লোরিন (ইতালীয় টাকা) লাভ থাকে। কিন্তু হঠাৎ অনেকগুলি কারণে অত্যন্ত অর্থসঙ্কট দেখা দিয়েছে—চার বছর আগেই আমি আপনার নাম শুনেছি—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছাও আমার অনেক দিনের। মনে হয় পরশুর ঘটনায় নিশ্চয়ই ঈশ্বরের হাত ছিলো—তাই আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। আমার একটি বিশেষ প্রয়োজনের জন্য আপনাকে অনুরোধ করতে দ্বিধা করবো না। এর ফলে আমাদের বন্ধুত্বও গাঢ় হয়ে উঠবে। আমাকে সাহায্য করলে আপনার কোন ক্ষতি হবে না। আপনি যদি আমাকে এখন অর্থ সাহায্য করেন তাহলে আপনার চিন্তার কিছু নেই ; কারণ এক বছরের জন্য আমার পশু সরবরাহের ব্যবসা আপনার হাতেই তুলে দেবো, তাইতে আমি টাকা শোধ না করতে পারলেও ঐ ব্যবসার আয় থেকেই আপনার প্রচুর লাভ হবে।

এই দীর্ঘ বক্তৃতাসহ আবেদনের ফল যে এমন করে মাঠে মারা যাবে, সে কথা বোধহয় ভদ্রলোকটি ভাবতে পারেননি। অত্যন্ত বিরক্ত ভাবেই আমি সোজাসুজি তার আবেদন প্রত্যাখ্যান করলাম।

ফলে তাঁর বক্তৃতাস্রোত দ্বিগুণ উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলো, কিন্তু আবার তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললাম যে, তাঁর এত জানাশোনা আত্মীয় থাকা সত্ত্বেও মাত্র দু'দিনের পরিচিত আমার প্রতি এই অনুগ্রহ-বর্ষণ কেন? কিছুমাত্র বিচলিত না হোয়েই তিনি বললেন,—"দেখুন, আপনার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর বুদ্ধিমত্তার কথা সুপরিচিত। সেই জন্মেই আপনার কাছে এসেছি, কারণ আপনিই ঠিক বুঝতে পারছেন যে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করলে কতখানি সুবিধা আর লাভ হবে।"

—"সবই বুঝেছি। সেই সঙ্গে এটাও বুঝেছি যে, আপনার প্রস্তাবে রাজী হলে আপনি নিজেই আমাকে একটি গর্দভ ছাড়া আর কিছু ভাববেন না।"

ভদ্রলোকটি চলে গেলেন। অবশ্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। যাবার আগে জানিয়ে গেলেন, সেণ্টমার্ক স্কোয়ারে মাদাম'সি'র সঙ্গে আজ সন্ধ্যায় তিনি আসবেন, আমার উপস্থিতিও সেখানে আশা করেন। তাছাড়া যে জায়গায় তিনি আছেন সেখানের ঠিকানাও আমাকে দিয়ে গেলেন—বোধহয় আশা করেছিলো তাঁর আসার পর সৌজন্য রক্ষার্থে আমিও যাবো। কিন্তু মনে মনে ভাবলাম, একটু বুদ্ধি থাকলে সেখানে যাচ্ছি না। লোকটির ছলনাতে অত্যন্ত বিরক্ত হোয়ে মহিলাটির প্রতিও আমার সব আকর্ষণ চলে গিয়েছিলো। সত্যিই আর বোকা বনবার ইচ্ছা ছিল না। তাই ইচ্ছা করেই সন্ধ্যায় সেই সেণ্টমার্ক স্কোয়ারে গেলাম না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা আমার সেই কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবীর ইঙ্গিতেই বোধহয় খালি মনে হোলো, ভদ্রতার খাতিরেও একবার দেখা করা উচিত বৈ কি! শেষ অবধি চলেই গেলাম।

একজন চাকর আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলো। অফিসার ভদ্রলোকটি আমাকে দেখে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। সন্ধ্যায় যাইনি বলে মৃদু অনুযোগও করলেন। তারপরই আবার সুরু করলেন ব্যবসার কথা—রাশীকৃত কাগজপত্র বেরোলো—আবার আমার মনটা তিক্ত হোয়ে উঠলো। অজস্র লোভ দেখানো যখন অসহ্য হোয়ে উঠলো তখন বাধ্য হোয়ে বললাম, এ-সব সম্বন্ধে আর একটি কথাও আমি শুনতে চাই না। এই বলে আমি যেই বিদায় নেবার জন্যে উঠলাম তখনি ভদ্রলোকটি জানালেন যে, তাঁর মা আর বোনের সঙ্গে আমাকে পরিচিত করাতে চান। এই বলে বেরিয়ে গেলেন, মিনিট দুইয়ের ভিতরই তাঁদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মায়ের দিকে দেখলাম আভিজাত্যে, স্নেহে, সরলতায় প্রকৃত মাতৃমূর্তি। আর মেয়ে? শুধু সুন্দরী নয়—সৌন্দর্যের আদর্শ ছবি। সে রূপের দিকে চেয়ে শুধু মুগ্ধ নয়—স্তম্ভিত হোয়ে গেলাম।

একটু পরেই মা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে গেলেন—মেয়েটি রইলো। মাত্র আধ ঘণ্টা—এটুকু সময়ের মধ্যেই ওর রূপ আর গুণের নিখুঁত পরিচয় পেয়ে মনে মনে স্বীকার করলাম স্বেচ্ছাবন্দী দাসত্বের। বনহরিণীর মত ওর প্রাণচঞ্চলতা, সরল আনন্দের উচ্ছলতা অনাঘ্রাত ফুলটির মত নিষ্পাপ পবিত্র চিন্তাধারা··· অনাবশ্যক সঙ্কোচহীন সহজ মাধুর্য আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নূতন সৌন্দর্যের দ্বার খুলে দিলে। সবার উপরে ওর আশ্চর্য রূপ। সে যেন এক পরম বিস্ময়!

মাদমোয়াজেল 'সি সি' মায়ের সঙ্গে ছাড়া কখনও বেরোয় না। অত্যন্ত বাধ্য মেয়ে। বাবার বেছে দেওয়া বই ছাড়া অন্য বইও পড়ে না—যদিও উপন্যাসের প্রতি প্রচণ্ড লোভ। ভেনিসকে ভালো

করে দেখার জানার প্রবল ইচ্ছা। বাড়িতে কেউ বেড়াতেও আসে না—তাই আজ অবধি লোকমুখে নিজের আশ্চর্য রূপের প্রশংসা শুনে সচেতন হোতে শেখেনি।

মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথা কইলাম। কথা বলার চেয়ে তার অনর্গল অজস্র প্রশ্নের উত্তরই দিয়েছি বললে ভালো হয়। তাও তার অজস্র জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করতে পারিনি। ওর মনটি যেন মুদিত শতদল—আলোর কিরণে সদ্য পাপড়ী মেলেছে—চোখে লেগে আছে মুগ্ধতার আবেগ—মনটিকে ঘিরে আছে বিচিত্র বিস্ময়। আমি ওকে বলতে পারলাম না—সৌন্দর্যলক্ষ্মী, আমার সমস্ত মন তোমার বন্দনাগানে মুখর হয়ে উঠেছে—যে স্তুতিগান বহুবার বহু নারীর কানে কানে গুঞ্জন করেছি—যে আবেদন-নিবেদনে তাদের মুগ্ধ করেছি—সে সবই যেন অর্থহীন হোয়ে উঠলো—মিথ্যায়, ছলনায় ওই সরল নিষ্পাপ মাধুর্যকে মলিন করতে মন সায় দিলে না—ও যে একক, ও যে অনন্যা।

ওদের বাড়ি থেকে সেদিন ফিরলাম ভারাক্রান্ত, অতৃপ্ত মনে। মাধুর্য আর সৌন্দর্যের এই অপরূপ বিকাশ আমার সমস্ত মনকে দুর্বার চঞ্চল করে তুলছিলো। বাড়ি এসে প্রথমেই প্রতিজ্ঞা করলাম, আর ওখানে যাবো না। ওকে দেখলে আমার মন কখনই ধৈর্য ধরতে পারবে না—কিন্তু ওকে বিয়ে করে এই স্বাধীন স্বচ্ছন্দ জীবনকে শৃঙ্খলিত করতে আমি চাই না—আমি যে জন্ম-যাযাবর। তবুও মনে মনে বার বার স্বীকার করলাম, আমার জীবনে সুখের আনন্দের অমৃতধারা-সিঞ্চন শুধু ও-ই করতে পারবে।

দু'দিন কেটে গেলো। তৃতীয় দিনে আমার সঙ্গে রাস্তায় অফিসার ভদ্রলোকটির দেখা হোলো। দেখা হোতেই 'পি, সি,'

বললেন যে, তাঁর বোন না কি সারাক্ষণ আমার কথা বলে। সেদিন আমার সঙ্গে যা কিছু হোয়েছিলো সব ও মনে রেখেছে…প্রায়ই সে সব বলে। তাঁর মা-ও না কি আমাকে দেখে আমার সঙ্গে আলাপ করে অত্যন্ত আনন্দিত হোয়েছেন। আরও বললেন, আমার বোনের সঙ্গে আপনার বিয়ে হলে কিছু খারাপ হবে না। ওর বিয়ের জন্য দশ হাজার মুদ্রা যৌতুক আছে। আমাকে আবার পরদিন চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বললেন, তাঁর মা আর বোনের সঙ্গেও দেখা হবে আবার।

নাঃ, আমি কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম কিছুতেই আর না যাবার। কিন্তু হায় রে প্রতিজ্ঞা! এ সব ক্ষেত্রে প্রতিজ্ঞাও তো পদ্মপত্রে জলবিন্দু!

তিনটি ঘণ্টা কোথা দিয়ে কেটে গেল আমার মানস-লক্ষ্মীর সাহচর্যে! কি মধুর তৃপ্তিতেই না মন ভরে উঠেছিলো সেদিন ফেরার পথে! আসার সময় 'সি সি'কে বলেছিলাম সেই ভাগ্যবান পুরুষকে আমার হিংসা হয়, যে তোমাকে পাবে তার জীবন-সঙ্গিনীরূপে। প্রথম…ওর জীবনে এই প্রথম পুরুষের কাছ থেকে পেল মুগ্ধতার পরিচয়—প্রথম শুনলো মুগ্ধ প্রশংসার বাণী। চকিত লজ্জায় দুই হাতে মুখ ঢেকে ফেললে—সারা মুখের সে আবীর-ছড়ানো গাঢ় রক্তিমাভা আমার দুই চোখ আচ্ছন্ন করে দিলো।

ফেরার পথে সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে নিজের মনকে যাচাই করতে লাগলাম। আর নিজের মনের প্রকৃত স্বরূপ যতই ধরা দিতে লাগলো ততই মন ভরে উঠতে লাগলো আশঙ্কায়। ওকে জীবনসঙ্গিনী করার দুর্বার প্রলোভনকে যেমন সংযত রাখতে পারছি না—তেমনি ওকে দু' দিনের বিলাসসঙ্গিনী করার ইঙ্গিতও যদি কেউ করে তবে

তাকে সেই মুহূর্তে খুন করার মত প্রচণ্ড ক্রোধকেও সম্বরণ করার মত জোর পাচ্ছি না। আমার সমস্ত মন এই দুই ধারার মাঝে পড়ে দিশাহারা হোলো। অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় জুয়াখেলা ধরলাম—হৃদয়-রোগের অব্যর্থ ওষুধ বলেই জানতাম জুয়াখেলাটাকে।

পরদিন আবার ‘পি, সি’ এসে হাজির। খুব উৎফুল্ল ভাবে জানালে যে, ওর মা ওর বোনকে নিয়ে অপেরা দেখতে যেতে অনুমতি দিয়েছেন। আর, ‘সি, সি’ও ভারী খুশী, জীবনেও এ-সব দেখেনি বলে।

আরও বললে যে, যদি ইচ্ছা করি তবে আমিও ওদের সঙ্গে যে কোনো জায়গাতেই দেখা করতে পারি।

—“আপনার বোন কি জানে যে, আমিও আপনাদের সঙ্গী হবো?”

—“নিশ্চয়ই···আর তাই তো অত খুশী হোয়ে উঠেছে।”

—“আর আপনার মা?—তিনি জানেন তো?”

—“না, কিন্তু একথা শুনলে একটুও রাগ করবেন না বরং খুশীই হবেন। ইতিমধ্যেই আপনার উপর মায়ের বিশ্বাস আর আস্থা যথেষ্ট হোয়েছে।”

—“আচ্ছা, আমি একটা ‘বক্স’ নেবার চেষ্টা করবো।”

—“খুব ভালো—আর একটা জায়গা ঠিক করে বলবেন, সেখানেই আমরা আসবো।”

শয়তানটা সেদিন ওর ব্যবসার কথা মোটেই তুললে না। আর যেই দেখেছে আমি ওর প্রেমিকাটির প্রতি নজর না দিয়ে ওর বোনকে দেখে রীতিমত মুগ্ধ হোয়েছি, তখনি মনে মনে আঁচ করেছে, আমার ভালোবাসার সুযোগ নিয়ে আমার কাছে বোনটিকে বিক্রী

করার। তাই এত প্রলোভন। সমস্ত মনটা ব্যথায় ভরে উঠলো—এই শয়তানটাকে দুটি নিষ্পাপ সরলা নারী সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, স্নেহ করে। কিন্তু হায় রে মুগ্ধ প্রেম! তা সত্ত্বেও পারলাম না শয়তানটার আমন্ত্রণ এড়াতে…তবু তো আবার তার সঙ্গ পাবো…সেই ক্ষণ-মাধুযের কামনায় সমস্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই ভেসে গেল। মনকে বোঝালাম, আমি ওকে ভালোবাসি, ওর সমস্ত বিপদ থেকে ওকে রক্ষা করাই তো আমার কর্তব্য। ভালোবাসি বলেই তো সরে দাঁড়াতে পারি না…যদি আর কোনো শয়তান, দুশ্চরিত্র লোকের কবলে পড়ে ওর সর্বনাশ হয়!…সে চিন্তাটাই যে আমার কাছে অসহ্য। মনে হোলো, আমার সঙ্গে থাকলে ওর বুঝি কোনো ভয়-আশঙ্কাই নেই। আমার কাছে ওর কোনো অনিষ্ট সাধনই হোতে পারে না।

সেন্ট স্যামুয়েল অপেরাতে একটি 'বক্স' কিনলাম। তার পর বহু আগেই এসে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওরা যখন এলো, তখন আমার কিশোরী মানসীটিকে দেখেই আমার সমস্ত মন ভরে উঠলো। সুন্দর জমকালো ছদ্মবেশে সেজেছিলো 'সি, সি' ভাইয়ের পরনে সেই অফিসারের পোষাক। আমার গণ্ডোলাতেই ওদের আসতে বললাম। পথে ওর ভাই সেই মহিলাটির বাড়িতে নেমে গেল। জানালে মাদাম-সি—অত্যন্ত অসুস্থ তাই সে দেখা করতে যাচ্ছে, পরে এসে আমাদের সঙ্গে মিলবে। আমি অবাক হোলাম যে, 'সি সি' এতটুকু বিস্ময় কিম্বা অনিচ্ছা প্রকাশ করল না, আমার সঙ্গে একটা গণ্ডোলাতে যেতে। ভাইটি চোখের আড়াল হোতেই আমি বুঝলাম যে, শয়তানটা বোধ হয় এই মতলব ইচ্ছা করেই করেছে—লাভের আশায়।

আমি 'সি সি'কে বললাম, অপেরা সুরু হবার সময় অবধি আমরা গণ্ডোলাতেই বেড়াই। আরও বললাম, এত গরমে মুখোশে কষ্ট হবে, ওটা খুলে ফেলাই ভালো। একটুও আপত্তি না করে 'সি সি' তখন মুখোশটা খুলে ফেললো।

ওকে সম্মান জানানোর, ওর প্রতি কর্তব্যের যে প্রতিজ্ঞা আমার মনে ছিলো—ওর দেহের সেই শান্ত, মধুর, পবিত্র সৌন্দর্য···ওর আশ্চর্য সরল বিশ্বাসে ভরা মন···ওর নির্দোষ খুশী-ভরা ব্যগ্র-চঞ্চল ব্যবহার ··সব মিলিয়ে যেন আমার বুকের মধ্যে ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলো।

কি কথা ওকে বলবো, ভেবে পাচ্ছিলাম না···মনের মধ্যে যে অজস্র কথা মাথা কুটে মরছিলো, সেকথা কি ওকে শোনানো যায়? সে তীব্র অনুভূতি, সে আবেগ-চঞ্চল ভালোবাসার প্রকাশ কি ও সইতে পারবে?···স্তব্ধ হোয়ে শুধু ওর অপরূপ লাবণ্যে ঢলঢল মুখখানির দিকে চেয়ে রইলাম···ওর ওই সুঠাম দেহের সুষমায় ভরা বর্ণচ্ছটার দিক হোতে দৃষ্টি ফিরিয়ে। পাছে আমার কামনা-দৃষ্টিতে ম্লান হোয়ে পড়ে ওই আনন্দ-শতদল।

—"কিছু কথা বলুন···শুধু আমার দিকে চেয়েই রয়েছেন তখন থেকে, একটি কথাও না বলে। আজ আপনার সময়টা মিথ্যে নষ্ট হোলো আমার জন্যে···তাই না? দাদার সঙ্গে আপনি তো যেতে পারতেন তা নাহলে দাদার বান্ধবীর কাছে ··শুনেছি ·অপ্সরার মত সুন্দরী সে।"

—"আমি দেখেছি তাঁকে।"

—"উনি খুব বুদ্ধিমতী না?"

—"হোতে পারে···সেটা জানার সুযোগ হয়নি আমার। আমি তাঁর বাড়ি কখনও যাইনি···যাবার বাসনাও নেই। কিন্তু ওগো

সুন্দরী 'সিসি', তার জন্যে তোমার একটুও চিন্তা করার দরকার নেই···আমার সময় এতটুকুও বৃথা যায়নি"—

"আমার কিন্তু তাই মনে হোয়েছিলো। সারাক্ষণ আপনি একটিও কথা বলছেন না দেখে আমি ভেবেছিলাম আপনি মনে মনে দুঃখিত হোয়েছেন।"

—"কেন কথা বলিনি বুঝবে কি? বলতে পারিনি···তোমার মধুর, অমলিন সান্নিধ্য আমার সমস্ত সত্তাকে নিবিড় সুখে মূর্ছাতুর করে তুলেছে—সে গভীর অনুভূতির অনুরণন ভাষায় ফোটে না"···

—"আমারও ভারী ভাল লেগেছে আপনাকে···শুধু ভাল লাগা নয়, আপনার উপর নিশ্চিন্ত নির্ভর আর বিশ্বাস আমার মনে জেগেছে। সত্যি দাদার সঙ্গে থাকার চেয়ে আপনার সঙ্গে আমি যেন অনেক নিরাপদ অনেক নিশ্চিন্ততা অনুভব করছি। মা বলেন, আপনাকে কেউ ভুল করতে পারে না—আপনি নিশ্চয়ই খুব সম্ভ্রান্ত লোক। তাছাড়া আপনি বিবাহিতও নন। এই কথাটাই আমি মাকে সবার আগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। মনে আছে আপনার··· একদিন বলেছিলেন, আমাকে যে বিয়ে করবে তাঁর ভাগ্যকে আপনি হিংসা করেন? সেই সময় আমিও বলেছিলাম আপনাকে যে স্বামী-রূপে পাবে, সারা ভেনিসে সেই সবচেয়ে সুখী নারী।"

কী অদ্ভুত সরলতা, আর অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে ভরা কথাগুলি। ওর গলার মিষ্টি রিনরিনে স্বরটি অবধি যেন মনের সব ক'টি তার ছুঁয়ে যায়। ওর কোমল কিশলয়ের মত পেলব রক্তিম দুটি ওষ্ঠে আমার অনুরাগের চিহ্ন এঁকে দেবার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা প্রাণপণে দমন করলাম।···না পাওয়ার বেদনাকে ছাপিয়ে উঠলো আর এক পাওয়ার তীব্র মধুর অনুভূতি···আ ম পেয়েছি আমার মানস-লক্ষ্মীর

স্বীকৃতি···জেনেছি তার ভালোবাসা আমাকে ঘিরেই ভালোবাসার রূপ পেয়েছে।

"মানসী আমার! দু'জনার মনই যখন একই সুরে বাঁধা তখন অভেদ বন্ধনের মধ্যেই আমরা সুখের উৎস খুঁজে পাবো—মিলনেই ভরে উঠবে আমাদের সব শূন্যতা। কিন্তু হায় রে, সবচেয়ে বড় বাধা যে আমার বার্ধক্য। আমি তোমার বাবার বয়সী হবো প্রায়—"

—"বাবার বয়সী! কি ভাবছেন? জানেন আমার বয়স চোদ্দ পূর্ণ হোয়ে গেছে?"

—"আর আমি যে চোদ্দ দু'গুণে আটাশ!"

—"আচ্ছা বেশ! দেখান তো একজনকেও অন্ততঃ যার আটাশ বছরে আমার বয়সী মেয়ে আছে? আপনি বাবার বয়সী ভাবলেও যে হাসি আসছে আমার।"

থিয়েটারের সামনে এসে আমরা গণ্ডোলা থেকে নেমে পড়লাম। অপেরাতে ঢুকে বক্সে গিয়ে বসলাম···মুখোশ চশমাতে 'সিসি'র মুখ প্রায় ঢেকে গিয়েছিলো। ওর দাদার দেখা নেই—শেষ হবার একটু আগে এসে পৌছালো। বুঝলাম এটাও ওর মতলবেরই অংশ।

এবার আমিই ওদের আহারের নিমন্ত্রণ জানালাম কিন্তু আহারের সমস্ত সময়টা সদ্য-জাগ্রত তীব্র প্রেমের অনুভূতি আমাকে এমন করে গ্রাস করেছিলো যে একটি কথাও আমি বলতে পারলাম না। দাঁতের ব্যথার ভান করলাম। ওরাও আমার নীরবতার এই ছলনায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলে। আহারের শেষে 'পি, সি' ওর বোনকে জানালে যে আমি ওকে ভালোবাসি, আর তাই ওকে আলিঙ্গন করলে আমার ব্যথার উপশম হোতে পারে। 'সি সি' তখনই এগিয়ে এলো আমার কাছে···এসে ওর হাস্যোজ্জ্বল রক্তিম মধুর ঠোঁট দু'খানি আমার মুখের

দিকে তুলে ধরলে···সে আমন্ত্রণে আমার রক্তে যেন আগুন জ্বলে উঠলো।···কিন্তু ওর ওই নিষ্পাপ পবিত্র সরল মূর্তি আমার সমস্ত কামনার উপর যে শ্রদ্ধার আসন পেতেছিলো তারই জয় হোলো শেষ পর্যন্ত। তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় অস্থির হোয়েও শান্ত ধীর ভাবে ওর ললাটে এঁকে দিলাম একটি স্নেহ চুম্বন।

—"এ কী! এ কেমন চুম্বন? যান ওকে প্রকৃত প্রেমিকের মত চুম্বন করুন।"

ওর কথা শুনেও শুনলাম না। 'পি, সি'র এই ওপর-পড়া ভণ্ডামিতে আমার যথেষ্ট বিরক্তি ধরেছিলো। কিন্তু ওর বোন মুখখানি ফিরিয়ে অভিমান-ক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলো—"ওঁকে জোর কোরো না দাদা! আমি হয়তো ওঁকে সত্যিকারের আনন্দ দিতে পারিনি।"

আমার ভালোবাসা যেন মুহূর্তে সচেতন হোয়ে উঠলো প্রবল প্রতিবাদে। আর আত্মসম্বরণ অসম্ভব—কী? কি বলছো—তুমি সি···জান না তুমি আমার সমস্ত মন ভরে রয়েছো—আমার সমস্ত কল্পনাকে রূপ দিয়েছো···আমার এই কঠিন আত্মসংযমকে তুমি ভুল বুঝলে? তুমি বিশ্বাস করতে পারলে যে আমি তোমাতে তৃপ্ত নই? বেশ যদি চুম্বনই আমার ভালোবাসার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারে তবে নাও, আমার সমস্ত ভালোবাসার গভীরতা নিবিড় হোয়ে ফুটে উঠুক আমার চুম্বনে।

প্রসারিত দুটি বাহুর মধ্যে বন্দিনী হোলো আমার মানস-প্রতিমা। ওর সুঠাম তনুলতা আমার তৃষিত ব্যাকুল বক্ষের উপর টেনে নিলাম ···এঁকে দিলাম অনুরাগের গাঢ় চুম্বন, কামনার রক্তরেখা দু'টি কোমল বিহ্বল ওষ্ঠে···। কিন্তু অনুভব করলাম সেই বলিষ্ঠ, লুব্ধ আলিঙ্গনের আড়ালে ভীরু কপোতীর থরথর কম্পিত হৃৎস্পন্দন।···

ধীরে ধীরে নিজেকে আমার আলিঙ্গনমুক্ত কোরে নিলেও...দুটি চোখে নির্বাক বিস্ময়...সে কি আমার প্রেমের এই দুরন্ত উচ্ছ্বাসের পরিচয় পেয়ে ?

ধীরে ধীরে নিজের মুখোশটা পরে নিলে 'সিসি', মনের ভাবকে গোপন করার জন্যেই। আমি তবু জিজ্ঞাসা করলাম, এখনও সন্দেহ আছে কিনা, আমাকে সুখী করতে পারেনি এই চিন্তায় ?

—"না, সব সন্দেহ আপনি ঘুচিয়ে দিয়েছেন।"

এইবার পরস্পরের কাছে আমরা বিদায় নিলাম। যাবার সময় মুখোশটা পরে নিলাম। পথে ওদের নামিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ভালোবাসার তীব্র মধুর অনুভূতিতে তখন আমার সমস্ত মন ভরে আছে—তবু মনের কোণে কোথায় যেন একটু বিষাদের ছোঁয়া লেগেছিলো।

পরদিন 'পি, সি' আমার ঘরে এসে হাজির, রীতিমত বিজয়ীর ভঙ্গীতে। বললে, ওর বোন নাকি মায়ের কাছে জানিয়েছে যে আমরা পরস্পরকে ভালোবাসি আর যদি বিয়ে করতেই হয়, তবে শুধু আমাকে পেলেই ওর জীবনে সুখী হওয়া সম্ভব হবে।

—"ওর সাহসের প্রশংসা করি। কিন্তু আপনার কি মনে হয়, আপনার বাবা আমার হাতে ওকে সমর্পণ করতে রাজী হবেন ?"

—"আমি জানি না—তবে তাঁর বয়সও বেশ হোয়েছে। যাই হোক, আপনার ভালোবাসায় আশঙ্কার কিছু নেই। আজ সন্ধ্যাতেও মা 'সিসি'কে আমাদের সঙ্গে অপেরা দেখতে যাবার অনুমতি দিয়েছেন।"

—"বেশ তো তাহলে আমরা যাবো।"

—"কিন্তু একটা কথা, অনুগ্রহ করে আমার একটা কাজ করবেন ?"

—"আদেশ করুন।"

—"খুব ভালো সাইপ্রিয়ান মদ বিক্রী আছে খুব সস্তায়। আমি হ্যাণ্ডনোটে এক পিপে পেতে পারি, মাসিক কিস্তিতে ছ'মাসে শোধ করলেই হবে। আর ঐ মদ এক্ষুনি রীতিমত চড়া দামে বিক্রী হোয়ে যাবে, এ আমি জোর গলায় বলতে পারি। কিন্তু ব্যবসাদারটি একটু কড়া, একটা জামিন চায়। আপনি যদি রাজী হন সই করতে, তাহলেই ও দেবে।"

—"আনন্দের সঙ্গেই রাজী।"

আমি হ্যাণ্ডনোটে সই করে দিলাম একটুও দ্বিধা না করে। কারণ প্রেমিকের মনে যে সদাই ভয়—যদি আপত্তি করলে ও আমার প্রেমের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে তার শোধ তোলে? সন্ধ্যায় ওদের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে সেটা ঠিক করে নিয়ে বিদায় নিলাম। বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরী হোয়ে কি মনে করে সোজা দোকানে গেলাম। সেখান থেকে এক ডজন দস্তানা, রাশীকৃত রেশমী মোজা কিনলাম আর একটি সুন্দর এমব্রয়ডারী করা সোনার ক্লিপ দেওয়া গার্টার কিনলাম, আমার নতুন পাওয়া মনভরানো বান্ধবীর হাতে প্রথম উপহার তুলে দেবার আনন্দে উৎফুল্ল হোয়ে উঠলাম।

আমি ঠিক সময়েই আমাদের নির্দিষ্ট জায়গাটিতে পৌছলাম—কিন্তু দেখি ওরা আগেই এসে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। আমি যেতেই 'পি, সি' জানালে যে ওর কাজ আছে, তাই বোনকে আমার কাছে রেখে ওকে এখনি চলে যেতে হবে, একেবারে অপেরাতে এসে আমাদের সঙ্গে দেখা করবে। ও চলে যেতে আমি 'সি সি'কে বললাম, "যতক্ষণ না অপেরা সুরু হয় ততক্ষণ গণ্ডোলাতে করে একটু বেড়ানো যাক।"

—"না, তার চেয়ে জুক্কার বাগানে একটু বেড়িয়ে আসি চলুন।"

—"খুব রাজী আমি।"

আমি একটা সাধারণ গণ্ডোলা ভাড়া করলাম। তারপর সেণ্ট ব্লেজের একটি বাগানের দিকে চললাম—আমি জানতাম ঐ বাগান এক সেকুইনে (ইতালীয় মুদ্রা) সারাদিনের জন্যে ভাড়া পাওয়া যায়, আর কেউ ঢুকতে পাবে না! সেখানে গিয়ে দেখলাম আমাদের দু'জনার কারোই খাওয়া হয়নি! অতএব একটি বেশ উপাদেয় ভোজের অর্ডার দিয়ে সোজা বাগানবাড়ির ভিতর ঢুকে পড়লাম। সেখানে মুখোশ ইত্যাদি খুলে দু'জনেই বাগানে নেমে এলাম। 'সিসি' একটি তাফেতার ব্লাউস আর ওরই একটি হ্রস্ব স্কার্ট পরেছিলো। কিন্তু এই স্বল্প আবরণে ওর দেহের লাবণ্য যেন উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠেছিলো। আমার গভীর অনুরাগের দৃষ্টি ওর আবরণ ভেদ করে ওর পূর্ণ প্রকাশকে নন্দিত করলে—সমস্ত অন্তর মথিত করে বেরিয়ে এলো দুর্বার কামনা আর প্রচণ্ড সংযমের মিলিত দীর্ঘশ্বাস।

সবুজ ঘাসে পা দিয়েই আমার কিশোরী লীলাসঙ্গিনী বন কুরঙ্গীর মত চঞ্চল হোয়ে উঠলো, দিনের পর দিন অন্তঃপুরের আড়ালে থেকে এমন অবাধ মুক্তির হাওয়ায় ও যেন নিজেকে আর ধরে রাখতে পারছিল না। প্রজাপতির মত উচ্ছল আনন্দে এদিকে সেদিকে সমানে ছুটোছুটি করতে লাগলো। শেষকালে হাঁফিয়ে উঠে ছুটে এসে আমার সামনে ধুপ করে বসে পড়লো। তারপরই আমার চোখে সস্মিত স্নেহের মুগ্ধ দৃষ্টি দেখে উচ্চ মধুর কণ্ঠে হেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই আবদার ধরলো আমার সঙ্গে দৌড়ের প্রতিযোগিতা করবে। রাজী হলাম তখনি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওর সঙ্গে একটা বাজী ফেলতে চাইলাম।

—"যে হারবে তাকে কিন্তু যে জিতবে তার সব দাবী মানতে হবে"—,

—"আমি রাজী।"

দু'জনেই সুরু করলাম দৌড়াতে। বেশ বুঝলাম জয় আমার অনিবার্য। কিন্তু তখনি কৌতুহল হোলো, আমি হারলে আমার কাছ থেকে ও কী দাবী করে সেটা জানবার। ইচ্ছে করে পিছিয়ে পড়লাম—তখনও 'সিসি' প্রাণপণে ছুটে চলেছে—চট্ করে ও পৌছে গেল আমার আগেই। দম নিতে নিতে ওর মাথায় কি দুষ্টবুদ্ধি এলো, চট্ করে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে ওর আংটিটা আমাকে খুঁজে বের করতে বললে। আমি টের পেয়েছিলাম আংটিটা ও নিজের কাছেই রেখেছে—এতে ওকে স্পর্শ করবার অধিকার ও আপনিই আমাকে দিলে। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম অন্যায় সুবিধা ওর কাছ থেকে কিছুতেই নেবো না—ওর সরল বিশ্বাসের অমর্যাদা করবো না।

ঘাসের উপর দু'জনেই বসে পড়লাম। আমি ওর পকেট হাতড়ালাম ওর জামার ভাঁজগুলির ভিতর দেখলাম, জুতো খুলে দেখলাম শেষ অবধি ওর গার্টার অবধি খুঁজে দেখলাম। হাঁটুর উপরই গার্টার আটকানো ছিল —কিন্তু সেখানেও পেলাম না। আমি ঠিক জানতাম ওরই কাছে লুকানো আছে তাই ওটা খুঁজে বের করবই, ঠিক করে আরও খুঁজতে লাগলাম। এবার আমি নিঃসন্দেহেই বুঝেছিলাম তন্বী তনুদেহখানির কোন গোপনে সেটি লুকানো আছে। সে কথা ভাবতেই মধুর আবেশে সারা দেহ মন যেন রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠলো। ওর উষ্ণ কোমল সুগঠিত বক্ষের মাঝ থেকেই আংটিটা উদ্ধার হোলো—কিন্তু সেই পেলব স্পর্শে আমার হাতখানি

থরথর করে কেঁপে উঠেছিলো, শিরায় শিরায় ব'য়ে যাচ্ছিল অজানা পুলকের আগুন-জ্বালা স্রোত···

—"অত কাঁপছেন কেন ?"

—"আনন্দে···তোমার আংটিটা অমন করে লুকানো সত্ত্বেও খুঁজে পাবার আনন্দে। কিন্তু আবার তোমাকে ফিরতি প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, এবার কিছুতেই তুমি জিততে পারবে না।—"

আবার ছুটতে স্থরু করলাম। 'সিসি' বেশী জোরে ছুটতে পারছে না দেখে আমিও গতি মন্থর করে দিলাম নিশ্চিন্ত ভাবে। কিন্তু ঠকতে হোলো এইবার, গোড়ার দিকে এই ভাবে দম রেখে, হঠাৎ ও তীরের মত ছুটে এগিয়ে গেল। পরাজয় নিশ্চিত জেনে মাথায় জাগলো দারুণ একটা মতলব—যন্ত্রণায় চিৎকার করে সজোরে পড়ে গেলাম মাটিতে। বেচারী সরলা কিশোরী, আমাকে পড়ে যেতে দেখেই থেমে গেল। তারপর আমাকে তোলবার জন্যে ছুটে আমার দিকে এগিয়ে এলো। যেই আমার হাত ধরে তুলছে সেই মুহূর্তেই আমি সোজা দাঁড়িয়ে উঠে হাসতে হাসতে ছুট দিলাম প্রাণপণে··· অনেক অনেক পিছনে ওকে ফেলে রেখে।

অভিমানিনী কিশোরী অপরূপ ভ্রূভঙ্গী করে ক্ষুব্ধ স্বরে বললে,— "তাহলে সত্যিই আপনার লাগেনি ?"

—"একটুও না—আমি তো ইচ্ছা করেই পড়েছিলাম।"

"ইচ্ছা করে···আমাকে ঠকাবার জন্যে ··আমি ভাবতেই পারি না আপনি ঠকাতে পারেন···না, না জুয়াচুরি করে জেতাটা মোটেই জেতা নয়, আমি মোটেই হারিনি—"

—"নিশ্চয়ই, একশো বার হেরেছো, আমি তো তোমার আগে পৌঁছে গেছি। আর চালাকির বদলে চালাকি করা খুব চলে···বল

সত্যি করে, প্রথমটা আস্তে ছুটে হঠাৎ তীরের মত গতি বাড়িয়ে আমাকে ঠকাবার চেষ্টা করনি ?''

"ওটা খুবই চলে···কিন্তু আপনারটা একেবারেই অন্যরকম···ওটা মোটেই খেলাতে চলে না।"

—"কিন্তু ওইতেই তো জিততে পারলাম আমি।

—জয় জয়ই···প্রতারণা আর সাধুতা–ন্যায় আর অন্যায় যে পথেই তা হোক না কেন ?''

—"হাঁ আমার দাদার মুখে প্রায়ই এই ধরনের কথা শুনি। কিন্তু বাবার কাছে কখনও শুনিনি। আচ্ছা বেশ, মেনে নিলাম আমি হেরেছি···এখন বলুন কি দাবী আপনার···আমি তাই মানবো।"

—"দাঁড়াও। আপাততঃ এখানে বসা যাক, কারণ ভাবতে হবে তো···হোয়েছে, আমার দাবী হোলো তোমার সঙ্গে আমার গার্টার বদল করবো।"

—"গার্টার ? আমারটা দেখেছেন ? বিশ্রী, পুরানো, কিছু কাজে লাগবে না।"

—"তাতে কি হোয়েছে ? দিনে অন্ততঃ দু'বার তো গার্টার খুলতে হবে···দু'বারই মনে পড়বে যাকে ভালবাসি তার মুখখানি ·· আর তুমিও একই সময় আমার কথা ভাবতে বাধ্য হবে।"

—"বাঃ বেশ মজা হবে ! আমি খুব রাজী। নাঃ, আপনি ঠকিয়ে জিতেছেন বলে আর আমার কোন দুঃখ নেই···এই যে আমার বিশ্রী গার্টার দু'টো।"

—"আর এই যে আমারটা।"

—"উঃ কি দুষ্টু আপনি ? কী চমৎকার; কী সুন্দর দেখতে ওগুলি ? সত্যি চমৎকার উপহার ! মা-ও কী খুশী হবেন দেখলে।

নিশ্চয়ই ওটা আপনার উপহারের জিনিস্, একেবারে আনকোরা নতুন দেখছি যে…”

“—নাঃ আমাকে কেউ উপহার দেয়নি। আমিই তোমাকে দেবো বলে কিনেছিলাম…তোমাকে দেবার সুযোগ খুঁজছিলাম এমন ভাবে যাতে তুমি না ফিরিয়ে দিতে পারো। এবার বুঝছো তো, তোমাকে দৌড়তে জিততে দেখে আমি কি রকম হতাশ হোয়ে পড়েছিলাম…তাই তো বাধ্য হোয়ে ছলনার আশ্রয় নিতে হোলো।”

—“কিন্তু আমি নিশ্চয় বলতে পারি তাইতে আমি যে কী কষ্ট পেয়েছি, জানলে আপনি অমন ছলনা কখনই করতে পারতেন না—”

—“আমার সম্বন্ধে তুমি এমন গভীর ভাবে অনুভব করো?”

—“একথা আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্যে আমি কী না করতে পারি? যাক্ আমার কিন্তু ভারী ভালো লেগেছে, খুব পছন্দ হোয়েছে এই সুন্দর গার্টার দু'টো। সাবধানে রাখতে হবে, যাতে দাদার নজরে না পড়ে। তাহলেই চুরি করবে।”

—“সত্যি সত্যি চুরি করতে পারবে?”

—“খুব পারবে বিশেষ করে ক্লিপ দু'টো যদি সোনার হয়--”

“ও দু'টো সোনারই। কিন্তু তুমি ওকে বোলো ও দুটো পিতলের উপর সোনার জল করা।”

—“কিন্তু কেমন করে ক্লিপ দু'টো আটকায় আমাকে শিখিয়ে দেবেন?”

—“নিশ্চয়ই দেবো।”

তখনি দেখিয়ে দেবার জন্যে ও ব্যগ্র হোয়ে উঠলো। ওর মনে কোনো দ্বিধা কোনো সঙ্কোচের লেশ নেই—কোন ছলা-কলা কোনো

চাতুরীই আজও ওর নিষ্পাপ সরল মনটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। চতুর্দশ বসন্তের অনাহত মাধুরী আজও পায়নি সোহাগের আলিঙ্গন, কামনার তপ্ত স্পর্শ। সমাজ আর সঙ্গিনী দুই-এরই অভাব ওকে সচেতন হোতে দেয়নি ওর বিকচোন্মুখ যৌবনের আগমনীতে। যৌবনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা কামনার লেলিহান শিখা কেমন করে ইন্ধন পেয়ে ফুলে ওঠে সে রহস্য আজও ওর অজানা। যখন কুমারী-মনের অনুভূতিতে প্রথম অনুরাগের রঙ জাগলো তখনি প্রথম প্রেমের অসহ পুলকে সমস্ত মনটি নিবেদন করে বসলো—একান্ত বিশ্বাসে সরল নির্ভরতায়। কিছু গোপন কিছু অদেয় থাকবে না···তাইতেই বুঝি ভালোবাসার পরম প্রতিদান দিতে পারবে।

মোজা দু'টো এত ছোট যে হাঁটুর উপর গার্টারের ক্লিপ আঁটা গেল না। তাই দেখে 'সি সি' বললে এবাব থেকে লম্বা মোজা পরবে। তক্ষুনি পকেট থেকে রেশমী মোজাগুলি বার করে ওর সামনে ধরলাম—সস্নেহ অনুরোধ জানালাম ওগুলি গ্রহণ করতে। আনন্দে কৃতজ্ঞতায় উচ্ছ্বসিত হোয়ে ছোট্টো মেয়েটির মত ছুটে এসে আমার কোলের উপর বসে পড়লো, তারপর মনের উচ্ছল খুশীতে আমাকে অজস্র চুম্বনে ভরে দিলে···ঠিক যেমন ভাবে ওর বাবাব কাছ থেকে কোন উপহার পেলে বাবাকে আদর করতো, ঠিক তেমনি সারল্যে তেমনি খুশী ভরা চাঞ্চল্যে। প্রতিদানে আমিও চুম্বন করলাম কামনার তপ্তবাষ্প বুকের মধ্যে চেপে রেখে। ওর কানে কানে অস্ফুটে শুধু বললাম, ওর একটি চুম্বনের জন্য সমস্ত সাম্রাজ্যও বিলিয়ে দেওয়া যায়।

আমার কিশোরী প্রিয়া নিতান্ত অবহেলায় খুলে ফেললো ওর পুরানো মোজা দু'টি। আমার দেওয়া নতুন রেশমী মোজা নিয়ে

স্বচ্ছন্দে পরে নিলে···বেশ লম্বা ছিলো এগুলি, প্রায় ওর উরুর মাঝামাঝি এলো। আমি অবাক হয়ে দেখলাম ওর নিঃসঙ্কোচ আশ্চর্য সরলতা ও যেন আমার সামনে ফাঁদে-পড়া বন্য-হরিণী সম্পূর্ণ আয়ত্তে পাওয়া, ধরা দেওয়া এই মুগ্ধা শিকারকে আক্রমণ করতে আমার সমস্ত পৌরুষ যেন তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলো।

আমরা দু'জনে বাগানে বেড়াতে লাগলাম। প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা অপেরাতে গিয়ে হাজির হলাম—মুখোশ টুখোশ পরে···কারণ থিয়েটারের হলটি বেশ ছোটো—যদি কেউ চিনে ফেলে? 'সিসি' বলেছিলো ওর-বাবা যদি টের পান যে ও এই ভাবে অপেরা ইত্যাদি দেখে তাহলে বাইরে বেরোনোই বন্ধ করে দেবেন। অপেরাতে এসে ওর দাদাকে কোথাও না দেখে দু'জনেই একটু আশ্চর্য হোলাম। আমাদের ডান পাশে বসেছিলেন স্পেনের রাজদূত আর মাদমোয়াজেল বোশো আর বাঁ দিকে মুখোশ ঢাকা এক ভদ্রলোক আর একজন মহিলা। এঁদের দু'জোড়া চোখ সর্বদাই আমাদের অনুসরণ করছিলো। আমি বেশ টের পাচ্ছিলাম কিন্তু 'সিসি' পিছন ফিরে থাকাতে দেখতে পায়নি। অভিনয় দেখতে দেখতে এক সময় 'সি সি' প্রোগ্রামটি নিয়ে বাঁ পাশের বক্সের পার্টিশনের উপর রাখলে। মুখোশ-পরা ভদ্রলোকটি তখনি হাত বাড়িয়ে সেটি তুলে নিলেন। এই দেখে আমার সন্দেহ হোলো এঁরা নিশ্চয়ই পরিচিত কেউ হবেন। 'সিসি'কে ডেকে বলতেই ও পিছন ফিরে দেখলে, দেখেই ওর দাদাকে চিনতে পারলে। পাশের মহিলাটি আর কেউ নন—মাদাম সি।

দ্বিতীয় অঙ্কে ওর দাদা মহিলাটিকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের বক্সে এলেন। অভিনয়ের পর ক্যাসিনোতে আমাদের একত্রে আহারের অনুরোধ জানালেন।

'সিসি' আর মহিলাটি মুখোশ খুলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো। খাবার টেবিলে লক্ষ্য করলাম 'সিসি' মহিলাটির সঙ্গে রীতিমত শ্রদ্ধা আর সম্মানের সঙ্গে কথা বলছে—বেচারী মেয়ে ··দুনিয়ার রীতিনীতি ওর সবই অজানা! মাদাম সি—কিন্তু তাঁর সমস্ত ছলাকলা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেন নি—আমি স্পষ্ট দেখলাম গোপন ঈর্ষার ছায়া ওঁর মুখে চোখে···'সিসি'র অনিন্দিত সৌন্দর্য তাঁর রূপের প্রাখর্যকেও ছাড়িয়ে গেছে, মুগ্ধ করেছে আমায়···সেখানেই যে পরাজয়ের গ্লানি।

আহার-পর্বের শেষের দিকে সুরার মাত্রাধিক্যে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত অবস্থায় 'পি, সি' মহিলাটিকে আলিঙ্গন করলে তারপর আমাকেও উৎসাহ দিতে লাগলো 'সিসি'কে আলিঙ্গন করতে। আমি উত্তর দিলাম মাদমোয়াজেল 'সিসি'র অনবদ্য সৌন্দর্যে আমি মুগ্ধ বটে কিন্তু যতক্ষণ না ওর হৃদয়ের সত্য অধিকার পাই ততদিন কোনো সুযোগই ওর উপর আমি নেবো না। 'পি, সি' এই নিয়ে ঠাট্টা করতে গেলে মাদাম সি—, তৎক্ষণাৎ ওকে থামিয়ে দিলেন। ওঁর এই সূক্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় পেয়ে মনটা কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। পকেট থেকে সেই এক ডজন দস্তানা বের করে ছ'টি নিয়ে তখুনি ওঁকে উপহার দিলাম, বাকী ছ'টি আমার মানসীকে নিবেদন করলাম।

সেই রাত্রে 'পি, সি'র সুরার মাত্রাধিক্য ঘটায় কাণ্ডজ্ঞানের যথেষ্ট অভাব ঘটেছিলো। ওর নির্লজ্জ প্রণয়-লীলার দৃশ্য থেকে 'সিসি'র দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করলাম···ওর ক্ষুব্ধ, লজ্জিত বিরক্ত দৃষ্টির সামনে আমিও অত্যন্ত অস্বস্তি ভোগ করছিলাম। কোনো মতে সময়টা কাটলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ক্রোধে, ঘৃণায়,

তিক্ততায় আমার সমস্ত মনটা ভরে গিয়েছিলো—বেশ বুঝেছিলাম নির্লজ্জ 'পি, সি' ওর এই বীভৎস অশ্লীলতার মধ্য দিয়েই ওর বন্ধুত্বের পরাকাষ্ঠার প্রমাণ দেবার চেষ্টা করছে। পরদিন সকালেই আবার যখন এসে হাজির হোলো তখন আমি আর থাকতে না পেরে ওই ব্যবহারের জন্য ভর্ৎসনা করলাম।

আমি বেশ অনুভব করছিলাম দিনে দিনে তিলে তিলে 'সিসি'র প্রতি আমার অনুরাগ কি গভীর হোয়ে উঠছে। এ অনুরাগ প্রেমে করুণায়, কল্যাণ কামনায় যেন শতবাহু বিস্তার করে ওকে ঘিরে রাখতে চাইছে সমস্ত বিপদ সমস্ত নিষ্ঠুরতা থেকে। যাতে ওর দাদা নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য কোনো চরিত্রহীন সুবিধাবাদী কারো কবলে ওকে না ফেলতে পারে, সেজন্যে আমি জীবন পণ করেছিলাম।

আমি শুনেছিলাম 'পি, সি' লোকটি মোটেই সুবিধার নয়। ওর আকণ্ঠ ঋণে ভরা। ভিয়েনাতে ও দেউলে হোয়ে বসেছিলো—এমন কি সেখানে ওর স্ত্রী-পুত্রও রয়েছে। ভেনিসে ওর কাণ্ড কারখানায় ওর বাবা ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে অবধি বাধ্য হোলেন··· তা সত্বেও বাড়িতে রয়েছে জেনে মনের ঘেন্নায় সে কথা না জানারই ভান করেন। পরস্ত্রীকে তার স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিপক্ষে টেনে আনতেও ওর বাধে না। তারপর সে মহিলাটির ধন-সম্পত্তি সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাকে নিজের কুৎসিত কামনার উপাদান করে রাখতেও ওর দ্বিধা নেই। ওর মা—অন্ধ মাতৃস্নেহে ছেলেকে 'আদর্শ' বলেই মনে করেন। উপযুক্ত ছেলেও মায়ের সমস্ত টাকাকড়ি এমন কি দামী পোষাকগুলি অবধি হরণ করে তার প্রতিদান দিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি।

এবার আমি তাই মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, ওর কথাতে কিছুতেই প্রশ্রয় দেব না। নির্দোষ সরলা কিশোরী বোনকে আমার সামনে প্রলোভনের মত তুলে ধরে ওর দুষ্কর্মের সঙ্গী করবে আমাকে, আর আমার ধ্বংসের কারণ হোয়ে দাঁড়াবে সেই নিষ্পাপ ফুলের মত মেয়েটি—এ চিন্তাও যেন আমি সইতে পারছিলাম না। আমি ওকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম যে, যদি আমাকে বাধ্য হোয়ে ওর বোনের সঙ্গে দেখা করতেই হয় তাহলে ওর সাহায্য ছাড়াই তা আমি করবো আর 'সিসি'কেও বারণ করবো, যাতে ও দাদার সঙ্গে কোথাও না যায়—ওর চোরাবালির ফাঁদে যেন কিছুতেই না পা দেয়।

এ-সব শুনে 'পি, সি' খুবই কাতর ভঙ্গীতে ক্ষমা চাইলে। ওর মাতলামির জন্যে অত্যন্ত অনুতপ্ত হওয়ার ভাবও দেখালো···ক্ষমা চেয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে আমাকে আলিঙ্গনও করলো। আমার মনটা হয়ত ক্ষণিকের জন্য দুর্বল হচ্ছিল, কিন্তু এমন সময় মেয়ের হাত ধরে মা ঘরে ঢুকলেন। আমার উপহারগুলির জন্যে মা আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেন। আমিও সোজাসুজি মাকে জানালাম যে তাঁর মেয়েকে আমি ভালোবাসি আমার ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী করার আশায়, আমার ভালোবাসা তাকে স্ত্রীর মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়। আমি আরও বললাম যে, যখন আমি নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবো, আমার ভাবী স্ত্রীকে স্বাচ্ছন্দ্য দেবার ক্ষমতা অর্জন করবো, তখন আমি নিজেই তাঁর স্বামীর কাছে প্রার্থনা জানাবো তাঁর কন্যার পাণিগ্রহণের।

এই বলে আমি মায়ের হাতখানি চুম্বন করলাম। মনের উত্তেজনায় আর আবেগে আমার চোখ দিয়ে তখন ঝর-ঝর করে জল পড়ছিলো। সেই আবেগের ছোঁয়া মায়ের মনেও লাগলো।

অশ্রুসিক্ত হোয়ে উঠলো তাঁর দুটি আঁখিপল্লব। গভীর স্নেহে আমাকে আশীর্বাদ জানিয়ে মনের আবেগ লুকোতেই বুঝি উঠে গেলেন ঘর থেকে—'সি'কে রেখে। দুনিয়াতে এমন মা বিরল নয়। স্নেহে মমতায় করুণায় কোমলতায় এঁদের অণু-পরমাণু গড়া। সরলতাই এঁদের স্বভাব—দুনিয়া-জোড়া কুটিলতা, হিংস্রতা, লোভ আর ছলনা এদের সন্দেহহীন পবিত্র মনে ঠাঁই পায় না—তাই যাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন, অগাধ বিশ্বাস আর অসীম নির্ভরতায় তাকেই আশ্রয় করেন।

আমার প্রস্তাবের আকস্মিকতায় 'সিসি'ও বিস্ময়ে আনন্দে হতচকিত হোয়ে পড়েছিলো—এ পাওয়া ওর অপ্রত্যাশিত। ওর দাদার মনেও বুঝি অনুশোচনার ব্যথা জেগেছিলো! পরদিন কি একটা পর্বদিন ছিলো। 'পি, সি' জানালে বোনকে নিয়ে আমার কাছে আসবে—আমরা দু'জনে উৎসবে যোগ দিতে যাবো—ও ফিরে যাবে মাদাম 'সি-র' কাছে। উৎসব শেষে আমিই 'সিসি'কে বাড়িতে পৌঁছে দেবো—তাই ওর চাবিটাও আমাকে দিয়ে দিলে।

পরদিন নিদিষ্ট জায়গায় 'সিসি'কে পেলাম। আগেই অপেরাতে একটা বক্স ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু দু'জনে মিলে ঠিক করলাম এখনও অপেরার সাত-আট ঘণ্টা দেরী—অতএব ততক্ষণ আবার জুক্কার সেই বাগানে বেড়াতে যাওয়াই ভালো। 'সিসি' তো খুশীতে উপচে উঠলো। সেদিন প্রচুর উৎসব-মত্ত নরনারীর সমাবেশ বাগানেতে। আমরা আমাদের পুরানো কামরাটিই ভাড়া করে নিলাম।

বাগানে নামার আগে ঘরে এসে ঢুকতেই 'সিসি' উচ্ছল আনন্দে মুখোশটা এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে এসে আমার হাঁটুর উপর

বসে পড়লো। ওর ঝিকিমিকি দুই চোখে হাসির কুহক—স্ফুরিত অধর মদিরায় ভরা। ওর স্পর্শে আমার রক্তে জাগলো আগুনের জ্বালা…ওর সব কথাকে স্তব্ধ করে দিলাম চুম্বনে চুম্বনে—

—"জানো আমার সমস্ত মন ভরে উঠেছে আজ তোমার কথায়"…

—"আমার কথা?"

—"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, মায়ের কাছে তুমি যে প্রস্তাবটি করলে সেই কথায়। তুমি কত বড়, তুমি কত মহৎ…তুমি আমাকে এমন করে ভালোবাসো? ঠিকই বলছো তুমি, যত দিন না আমাদের প্রকৃত মিলন হয় তত দিন কোনো উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রশ্রয় দেব না আমরা… আমার বড় ভয় করে দাদার ঐ উন্মত্ত স্বেচ্ছাচারিতা। তোমার ভালোবাসায় আমার যেন সব অভাব মিটে গেছে, সব চাওয়া শেষ হোয়েছে। আবেগে ওর কণ্ঠ বুজে আসে। দেখি সোনার কাঠির পরশ পেয়ে রাজকন্যার ঘুম ভেঙেছে—

—"কী ভাবছো বলো তো?"

—"আমি? আমি কি ভাবছি জানো? তোমাকে সম্পূর্ণ করে পাবার আগেই যদি আমার মৃত্যু হয় কী অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়েই না আমাকে যেতে হবে!"

—"অমন করে বোলো না! বেঁচে থাকবোই আমরা। বিয়ের অনুষ্ঠান? সে তো যে কোনো দিনই সারা যায়। আর আমরা তো এখন স্বাধীন। বাবাকে নিশ্চয়ই মত দিতে হবে—"

—"ঠিক বলেছো। সম্মান বাঁচাবার জন্যে অন্ততঃ মত দিতে হবে! অবশ্য তাঁরও সম্মান রক্ষার জন্যে আমিই তাঁর কাছে তোমার পাণিপ্রার্থনা করবো। তাহলে আশা করছি আমাদের আর অপেক্ষা করতে হবে না, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই বিয়ের অনুষ্ঠান…"

—"সে কি ! এত শীগগির ? দেখো তুমি, বাবা নিশ্চয়ই বলবেন যে আমি এখনও অনেক ছেলেমানুষ আছি"—

—"কথাটা কি খুব মিথ্যে বলবেন ?

—"মোটেই না। এমন কিছু ছেলেমানুষ নই আমি। তোমার পাশে আমাকে খুব মানাবে। তোমার বউ হিসেবে একটুও বেমানান হবো না—"

ও জ্বালছে কথার ফুলঝুরি, আর তার আগুনের ফুলকি আমার শিরায় শিরায় আগুন জ্বালাচ্ছে। দুরন্ত বাসনা আমার চেতনাকে মাতাল করে তুললো।

—"মানসী আমার···আমার প্রেম তোমাকে জাগিয়েছে···কিন্তু সত্যি বলো আমার ভালোবাসায় তোমার বিশ্বাস আছে ? আমার কাছে আত্মসমর্পণের আড়ালে থাকবে তোমার একান্ত নির্ভরতা ?—কোনো দিনও জাগবে না অনুশোচনা আমার জীবন-সঙ্গিনী হয়েছো বলে ? বলো, উত্তর দাও"—

—"আমার স্থির বিশ্বাস, তুমি কখনো আমাকে দুঃখ দিতে পারো না। তাইতো আমার চরম নৈবেদ্যের আড়ালে আছে পরম পরিতৃপ্তি"—

—"এসো আমার কল্পলক্ষ্মী, আজ এই মুহূর্তেই আমার জীবন-সঙ্গিনীরূপে তোমায় বরণ করে নিই। আমাদের এ বিবাহের সাক্ষী থাকুন বিধাতা—আমাদের শপথমন্ত্র উচ্চারিত হোক শুধু দুজনার কানে কানে···আজ থেকে আমাদের দু'জনার ভাগ্যতরী একই ঘাটে এসে ভিড়ুক। আমাদের এই পবিত্র মিলনের বন্ধন দৃঢ় করবো তোমার বাবার অনুমতি নিয়ে সমস্ত ধর্মানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে···কিন্তু আজকের রাত সাক্ষী থাক আমাদের প্রথম মিলন-লগ্নটির। আজ

প্রেমের অনুষ্ঠানে বরণ করি প্রেয়সীকে। আজ তুমি আমার···শুধু আমার···”

—“ঈশ্বর সাক্ষী থাকুন, আজ আমি তোমায় নিবেদন করলুম নিজেকে তোমার সহধর্মিণীরূপে—তোমার চিরজীবনের সঙ্গিনী হবার শপথ নিলাম···”

আবেগে দু'টি বাহুর আলিঙ্গনে বন্দী করলাম আমার মোহিনী মানসীকে। কানে কানে অস্ফুট আশ্বাস দিলাম···জেনো তুমি, কোন ফাঁক কোন ফাঁকি নেই আমাদের বিবাহে। আমাদের শপথেই হোয়েছে তার সত্য অনুষ্ঠান—আজ প্রথম মিলনলগ্নটি সার্থক কোরে তোলো আনন্দযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে।

বাসররাত্রি শিহরিত করে তোলে বসন্তের পুলকোচ্ছ্বাস স্তবকে স্তবকে ফুটে ওঠে লাবণ্যের আতপ্ত ঔদ্ধত্য ··বহ্নিদীপ্ত উন্মাদনা শান্ত হয় মাধুর্যের আত্মনিবেদনে···

অসম্ভবকে যদি সম্ভব করে তুলতেই হয়—প্রেয়সীকে যদি পরিণীতারূপে পেতেই হয় তবে আর দ্বিধা নয়—সঙ্কোচ নয়—বিলম্ব নয়···আমার একমাত্র বিশ্বস্ত বন্ধু, অভিভাবক, শুভাকাঙ্ক্ষী ম্যঁসিয়ে দ্য ব্রাগাদাঁকে অকপটে সমস্ত নিবেদন করে তাঁর সাহায্য চাইলাম। অবশ্য যতদূর অকপটে তাঁর কাছে জানানো চলে—যাই হোক ওঁকে বুঝিয়ে দিলাম যে 'সি সি' ছাড়া আমার চলবে না—যদি ওর বাবা আমাদের বিবাহে সম্মতি না দেন তবে আমি ওকে নিয়ে পালিয়ে যাবো। তাও ঠিক করেছি বললাম।

তারপর ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদাঁ আর তাঁর দু'টি অভিন্নহৃদয় বন্ধুর সঙ্গে দুটি ঘণ্টা ধরে বহু তর্ক, বিতর্ক ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার জন্য বহু শপথ আর

প্রশ্নোত্তরের পর তাঁদের কিছুটা সম্মত করতে পারলাম। শেষ অবধি ঠিক হোলো ম্‌ঁ্যসিয়ে ব্রাগাদাঁই আমার হোয়ে ওর বাবার কাছে বিবাহের প্রস্তাবটা তুলবেন।

এ-সব ঠিক করে 'সি সি'কে জানাতে গেলাম—গিয়ে দেখি, মা মেয়ে দু'জনাই বিষণ্ণ মুখে বসে—দু'জনারই চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আমি তো স্তম্ভিত—শেষে জিজ্ঞাসা করে জানলাম ওর দাদাকে পুলিশে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেছে—হাজতে দিয়েছে। দেনার দায়েই ঘটেছে ব্যাপারটা—আর 'পি, সি' আমার জন্যে একটা চিঠিও রেখে গেছে এই মর্মে—যাতে আমি ওকে সাহায্য করি কিন্তু আমার অবস্থাও তখন সুবিধা নয়।

আগামী সুখের রঙ্গীন কল্পনায় যখন দু'জনারই মন ভরপুর সেই সময় 'পি,সি'র এই গ্রেপ্তারের ঘটনাটা আমাদের দুজনকেই ভারী দমিয়ে দিলো। তার উপর আবার শুনলাম, 'সি, সি'র বাবাও সেই রাত্রেই ওদের পল্লীভবন থেকে বাড়ি ফিরছেন। ভারাক্রান্ত মনেই সে রাত্রে বিদায় নিলাম—চলে আসছি এমন সময় 'সিসি' আমার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিয়ে পালালো। বাইরে এসে দেখি কাগজে-মোড়া একটি চাবি—আর ভিতরে লেখা আছে ওই চাবির সাহায্যে যেন রাত্রে বাড়ির দরজা খুলে ওর কাছে চলে আসি। দাদার পরিত্যক্ত ঘরে ও আমার জন্যে অপেক্ষা করবে…

সে রাতের অভিসারে কোনো বাধাই আসেনি। কিন্তু আমার মনটা হতাশায় ভরে যেতে লাগলো 'সি সি'র কথাগুলি শুনে। আমার বাহুপাশে আবদ্ধা হোয়েও ম্লান হেসে 'সি সি' বললে—

—"বাবা বেশ সুস্থ শরীরে নিরাপদেই ফিরেছেন…কিন্তু জানো, এসে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করছেন যেন আমি একটা

ছোটো খুকু। আমি যে আর খুকু নই এটা বুঝলে ওঁর মনের কি অবস্থা হবে জানি না ··আবার তার উপর যখন শুনবেন আমার প্রেমিকও আছে···উঃ ভগবান! তখন যে কি করবেন আমি ভাবতেও পারি না—”

—“কি আর করতে পারবেন? আমার হাতে তোমাকে দিতে না চান তো সোজা তোমায় নিয়ে পালিয়ে যাবো—তার পর আর কি? ধর্মযাজকদের আশীর্বাদ থেকে তো আর বঞ্চিত হবো না··· আমাদের মিলনে কোনো দিনও কেউ বাদ সাধতে পারবে না—”

—“আমিও তো তাই-ই চাই···কিন্তু বাবা?·· উঃ আমার বাবা যে কি ভীষণ, তা তো তুমি জানো না···”

পরদিন ‘সি সি’র মা বাবার সঙ্গে মঁ্যসিয়ে ব্রাগাদাঁর বহুক্ষণ ধরে তর্ক আর আলোচনা হোলো—কিন্তু সবই নিষ্ফল হোলো শেষ অবধি। এমন কি ‘সি সি’র মা যতটা আশঙ্কা করেছিলেন আগে থেকে তার চেয়ে আরও খারাপই দাঁড়ালো। ওর বাবা সোজাসুজি জানিয়ে দিলেন এখনও চার বছর পরে মেয়ের বিয়ের কথা উনি ভাববেন— আর এই চার বছর ওকে কোনো কনভেণ্টে রাখবেন। পরে প্রত্যাখ্যানটাকে একটু সহনীয় করার জন্যেই বোধ হয় বললেন—সে সময় আমার পদমর্যাদা, সচ্ছলতা সব বিচার করে যদি উপযুক্ত মনে করেন, আর আমাদের ভালোবাসাও যদি ততদিন টিকে থাকে তবে তিনি মত দিতে পারেন।

সে রাত্রে ছোট্ট চাবিটি কোনো কাজেই লাগলো না। ভিতর থেকেই দরজাটা বন্ধ করা ছিলো। একেবারে হতাশার চরম সীমায় পৌছলাম। ওর দাদাও জেলে···কোথা থেকে এতটুকু খবর পাবারও উপায় নেই। মরিয়া হোয়ে ভাবলাম, সোজা ওর মায়ের সঙ্গে

দেখা করবো—কিন্তু দরজা থেকেই পরিচারিকার কাছে শুনলাম, কেউই নেই, সকলেই পল্লীভবনে চলে গেছেন, কবে ফিরবেন কেউ জানে না।

দুর্ভাগ্য কি একা আসে? কখনও না। চরম হতাশায়, ব্যর্থতায় মনের বিক্ষোভ আর জ্বালা জুড়োতে জুয়ার নেশায় মাতলাম! একটি বারও একটি দানও জিততে পারিনি···ক্রমে ক্রমে সব হারিয়ে সর্বস্বান্ত হোয়ে মাথার চুল অবধি দেনার দায়ে বিকিয়ে দিলাম। তখনও অবশিষ্ট ছিলো একটু মনুষ্যত্ব, পুরানো শুভার্থীদের দরজায় হাত পেতে দাঁড়ানোর মত চক্ষুলজ্জা। হ্যাঁ একসময় আত্মহত্যা করতেও উদ্যত হোয়েছিলাম···কিন্তু সেই মুহূর্তটি থেকে আমাকে উদ্ধার করলে আর এক জুয়াড়ী আঁতোনিয় ক্রোসে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

একজন লোক নাম বলেছিলো মান্নুৎসি, তার পেশা হোলো জহুরী—কিছু দামী জহরৎ আমাকে ধারে পাইয়ে দেবে, এই সূত্রে আমার সঙ্গে পরিচয় করেছিলো—আর এই সূত্রেই আমার ঘরে অবাধ প্রবেশের অধিকারটুকুও জোগাড় করেছিলো—কিন্তু আসলে সে ছিলো গুপ্তচর···রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগেরই কর্মচারী। কিন্তু সে পরিচয় তো প্রথমে পাইনি। সে আমার ঘরে এসে আমার বইপত্র নাড়াচাড়া করতো আর আমার সেই যাদুবিদ্যার উপর লেখা পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে মুগ্ধ ও উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠতো। আমিও নির্বোধের মত তাতেই পুলকিত হোয়ে কিছু কিছু ভৌতিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়ে আরও মুগ্ধ করার চেষ্টা করতাম। আসলে তো সবই ফাঁকীর খেলা—শুধু মজা দেখবার জন্যেই···।

কিছু দিন পর গোয়েন্দাটা আবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এলো। এবার বললে যে, একজন পুস্তক-সংগ্রাহক আছেন, তিনি তাঁর নাম জানাতে চান না—তিনি হাজার সেকুইন দিয়ে আমার পাঁচখানা পাণ্ডুলিপি কিনে নিতে চান—অবশ্য প্রথমে এক বার দেখতে চান ওগুলো পড়ে। মান্নুৎসি এ-ও শপথ করলো যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই ওগুলি আমাকে ফিরিয়ে দেবে। কিছুমাত্র সন্দেহ না করেই রাজী হলাম। পরদিনই মান্নুৎসি এগুলি আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল—ক্রেতা নাকি বলেছেন ও সব জাল। বেশ কয়েক বছর পরে জেনেছিলাম মান্নুৎসি ওগুলো সোজা নিয়ে গিয়ে হাজির করেছিলো গোয়েন্দা বিভাগে···প্রমাণ করা হোয়েছিলো আমি একজন উঁচুদরের যাদুকর।

দুর্ভাগ্যের শেষ তখনও হয়নি—আমার বিরুদ্ধে আমার ভাগ্যচক্রের চক্রান্ত তখনো চলছে। এই সময়তেই জনৈকা মাদাম মেমোর মাথায় ঢুকলো যে তাঁর দুই ছেলেকে আমি নাকি পুরোপুরি নাস্তিক করে তুলেছি। আমার বিরুদ্ধে তিনি অভিযোগ আনলেন··· অবসরপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ অশ্বারোহী সৈনিক তিনিও জানালেন তাঁর ক্ষোভ যে, আমার গুপ্তবিদ্যার সাহায্যে তাঁর ভাইপোর আমি সর্বনাশ করেছি···সে একেবারে গোল্লায় গেছে।

সব অভিযোগ গুরুতর হোয়ে উঠলো। পবিত্র চার্চের মধ্যস্থতা মানা হোলো···যখন প্রত্যেকের সাগ্রহ ইচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে গ্রেপ্তার করা গেল না, তখন ওরা সমস্ত ব্যাপারটা সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে জানালেন। সেখানে আমার বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ জমছিলো। আমি নাকি ঈশ্বর মানি না, শয়তানের পূজা করি, আমি মাংস খাই প্রতিদিন, অথচ কোনো দিন উপাসনায় যাই না। এই সবের সঙ্গে সকলের চেয়ে বিপদ্‌জনক অভিযোগ ছিলো যে আমি নাকি বিদেশী দূতাবাসগুলির সঙ্গে অতিমাত্রায় মেলামেশা করি·· আর রাজ্যের গুপ্ত তথ্য পরিবেশন করে মোটা টাকা উপার্জন করি।

আশ্চর্য! এই সব অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আমার বিরুদ্ধে, অথচ এগুলির কোনোটিরই মূলে এতটুকু সত্য ছিল না। অথচ এই সব অভিযোগ তুলে আমাকে সাধারণের শত্রু, রাজদ্রোহী, বিশ্বাস-ঘাতকরূপে অভিযুক্ত করা হোলো···একেই বলে ভাগ্য!

ইতিমধ্যে আমার শুভার্থীরা আমাকে দেশ ছেড়ে যেতে উপদেশ দিলেন। তখনও আমার বিচার শেষ হয়নি আলোচনা চলছে··· কিন্তু তাই-ই যথেষ্ট। কারণ সে সময় ভেনিসে শান্তিতে থাকতে পারতো শুধু তারাই যাদের অস্তিত্বটুকুও গোয়েন্দা বিভাগের অজানা—

কিন্তু আমারও জেদ কম ছিলো না·· সত্যিই কোনো অন্যায় যখন করিনি তখন কেন পালাবো? তাছাড়া তখন আমি একেবারে নিঃস্ব, যা কিছু মূল্যবান ছিলো সব বাঁধা। তবু বুদ্ধি করে কাগজ পত্র, চিঠি, দলিল ইত্যাদি সব একজন পুরানো বন্ধুর জিম্মায় রেখেছিলাম।

একদিন রাত্রে থিয়েটার দেখে বাড়ি ফিরে দেখি, আমার ঘরের দরজা জোর করে ভেঙ্গে খোলা, আর সমস্ত জিনিসপত্র ছড়ানো, সমস্ত ঘরখানা কে যেন তছনছ করে রেখে গেছে। বাড়িওয়ালীর কাছে শুনলাম, গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা, একদল পুলিশ নিয়ে এসেছিলেন, বলেছেন যে বে-আইনী নুণের বস্তা রাখা আছে ঘরে, তারই খোঁজে এসেছেন। যদিও আমার যথাসর্বস্ব তছনছ করে খুঁজেও শুধু হাতেই ফিরে গেছেন। বুঝলাম আসল উদ্দেশ্য আমার জিনিসপত্র তল্লাসী··· নুণের বস্তাটা ছলনা।—

"আমারও তাই বিশ্বাস, নুণের ব্যাপারটা ছলনা ছাড়া কিছু নয়, সরকারী গোয়েন্দা বিভাগে আমিও কয়েক মাস ছিলাম। ওদের চালচলন কিছু জানি" ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদাঁ সব শুনে আমাকে বিষণ্ণ গম্ভীর স্বরে বললেন,—"আমার একটা কথা বিশ্বাস করো। এখনি পালাও তুমি ভেনিস ছেড়ে। ফুসিনাতে যাও, সেখান থেকে ফ্লোরেন্সে—আর যত দিন না আমি জানবো তোমার বিপদ কেটে গেছে তত দিন ফিরো না—"

অন্ধ জেদ আর গোঁয়ার্তুমি পেয়ে বসলো আমাকে। কানই দিলাম না বৃদ্ধের উপদেশে,—অনুরোধে। শেষে ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদাঁ আমাকে সকাতর মিনতি জানালেন অন্ততঃ ওঁর বাড়িতে গিয়ে থাকার জন্য। কারণ ওঁর মত সম্ভ্রান্ত, প্রতিষ্ঠাবান প্রতিপত্তিশালী

লোকের বাড়ি আমার পক্ষে অনেক নিরাপদ। কিন্তু জানি না কেন যে তাঁর শেষ অনুরোধটুকুও সেদিন রাখিনি, তাহলে হয়ত আমার জীবনে আবার বিপর্যয় ঘটতো না। মনে পড়ে শেষে উনি আমার সামনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। সেই দেখে আমার সমস্ত বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলেও নিজের জেদ থেকে এক পাও টলতে পারলাম না—কেন কে জানে? হতাশ হোয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করে করুণ কণ্ঠে উনি বললেন—"কে জানে হয়ত এই শেষ দেখা।" আমিও তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম, আলিঙ্গন করে শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলাম। কে জানতো ওঁর সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হবে···আর দেখা হবে না ওঁর সঙ্গে! ঠিক এগারো বছর পরে উনি মারা গিয়েছিলেন।

ভারাক্রান্ত অথচ দৃঢ় মনেই বাড়ি ফিরলাম। মনে পড়ে, সেদিন ছিলো ২৫শে জুলাই, ১৭৫৫ সাল। ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদাঁর ওখানেই আহারাদির পালা সারা হোয়েছিলো—বাড়ি ফিরে সোজা আশ্রয় নিলাম শয্যায়।

* * * *

সবে মাত্র ভোরের আলো ফুটেছে। এমন সময় কি একটা শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি সর্বনাশ! পুলিশের বড়কর্তা আমার সামনে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে প্রশ্ন করছেন—'আপনিই কি ক্যাসানোভা?' আমি স্বীকৃতি জানাতেই তিনি সেই মুহূর্তে আমাকে হুকুম করলেন উঠে পড়ে কাপড়-জামা বদলে তৈরী হোয়ে নিতে আর যা কিছু কাগজপত্র ঘরে আছে সমস্ত পুলিশের হাতে দিতে।

—"এই হুকুমজারীর অধিকার আপনি কোথা থেকে পেলেন?"

—"ট্রাইবুন্যালের আদেশ।"

আমার খোলা ডেস্কের উপর আমার যাবতীয় কাগজপত্র, খাতা ইত্যাদি ছড়ানো। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আমি বললাম—যা কিছু কাগজ দেখছেন ও-সব নিতে পারেন। একটা মস্ত থলির ভিতর সমস্ত কাগজপত্র ভরে ফেলা হোলো। তার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার পাণ্ডুলিপিগুলি কোথায়? ওঁরা জানেন আমার কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি কাছেই আছে—এমন কি নামও জানেন দেখলাম…সেই দিন সেই মুহূর্তে আমার চোখ খুললো। বুঝলাম এ-সবই মানুৎসির কীর্তি। সেই আমাকে মিথ্যা ছলনায় ভুলিয়ে গোয়েন্দা বিভাগে সমস্ত জানিয়েছে। সমস্ত পাণ্ডুলিপিগুলি পুলিশে হস্তগত করলো, এমন কি পেত্রার্ক, হোরেস থেকে স্বরু করে সমস্ত বইগুলিও—তার সঙ্গে চিঠিপত্র ইত্যাদি যত কিছু কাগজের টুকরো ছিলো ঘরে…সমস্তই নিয়ে নিলে…আর আমি এই সময়টা ঠিক যন্ত্রচালিতের মত মুখ ধুয়ে পোষাক বদলে, দাড়ি কামিয়ে, চুল আঁচড়ে তৈরী হোয়ে নিচ্ছিলাম, একটি প্রশ্ন, একটি কথাও আমার মুখ দিয়ে বেরোয়নি।

সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হোয়ে আমি যখন পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরোলাম তখন দেখে অবাক হলাম যে, পাশের ঘরে প্রায় চল্লিশ জন পাহারাওলা আমার জন্যে রয়েছে। আমি ভাবতেও পারিনি আমাকে ধরবার জন্যে এতগুলি পুলিশ-পাহারাদারের প্রয়োজন—জন দুই হোলেই যেখানে যথেষ্ট হোতো।

যাই হোক, চার পাশে চার জন পুলিশ-বেষ্টিত করে বড়কর্তা আমাকে একটা গণ্ডোলাতে তুললেন। তার পর যখন ওঁর বাড়িতে পৌছলাম তখন আমাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে প্রথমে জিজ্ঞাসা করলেন এক কাপ কফি খাবার ইচ্ছা আছে কি না। আপত্তি জানালে

আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে বন্ধ করে রাখা হোলো। আমার মনের তখন এমনি অবস্থা যে, কি করে মুক্তি পাবো, বা কি ভাবে পালাতে পারবো, কিছুই ভাববার ক্ষমতা ছিল না। একটা সোফার উপর তন্দ্রাচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম···মাঝে মাঝে এক একবার চমকে উঠে আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হোয়ে পড়ি। প্রায় তিনটের সময় ইনসপেক্টর এসে জানালেন যে, হুকুম এসেছে আমাকে পিয়োম্বীতে যেতে হবে। 'লেডস্'এ থাকতে হবে। ঐ জেলখানাটার নাম 'লেডস', কারণ ওর ছাতটা টালির বদলে সীসার পাতে মোড়া। নিঃশব্দে অনুসরণ করলাম ইনসপেক্টরকে।

গণ্ডোলাতে চড়ে অনেক অলিগলি, অনেক বাঁক নিয়ে শেষ কালে বন্দিশালার সামনে এসে ভিড়লাম। তারপর অনেক সিঁড়ি আর অনেক উঠা-নামার পর একটা সেতু পার হোলাম, এই সেতুটা 'দোজে'র প্রাসাদের সঙ্গে বন্দিশালার সংযোগ করেছে। সেতুটাকে বলে 'রিয়ো দি পালাংসো'। সেতুটা শেষ হোতেই মস্ত লম্বা গ্যালারি। সেটা পার হোয়ে আর একটা ঘরে এলাম। সেখানে অফিসারের পোষাকে একজন বসেছিলেন। আমাকে আপাদ-মস্তক খুঁটিয়ে দেখে হুকুম দিলেন—আপাততঃ একটা সেলে ঠিক করে বন্ধ করে রাখো।

আমাকে এবার কারারক্ষকের হাতে দেওয়া হোলো। বিরাট একটা চাবির থোলো নিয়ে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। আমাকে আর দু'জন রক্ষীর প্রহরায় নিয়ে সে এগোলো। প্রথমে দুটো সিঁড়ি উঠে একটা গ্যালারি। তারপর চাবি খুলে একটা লম্বা হল, তারপর আর একটা গ্যালারি। আবার চাবি খুলে আর একটা গ্যালারি। সেটার পর আবার একটা চাবি খুলে একটা ছোটো খুপরী। দু'ফুট চওড়া

অন্ধকার খাঁচার মত ঘর, মাথার চেয়ে উঁচুতে ছোটো ঘুলঘুলির মত এতটুকু জানলা দিয়ে আলো আসে। প্রথমটা আমি ভেবেছিলাম এই বুঝি আমার কারাকক্ষ! না, ভুল আমার ধারণা, কারণ এবারও একটা মস্ত চাবি বেরোলো, একটা প্রচণ্ড ভারী লোহার শিকল-আঁটা দরজা খোলা হোলো। আরও চমৎকার একটি খুপরী, সাড়ে তিন ফুট উঁচু। আর দরজার মাঝখানে আট ইঞ্চি গোল একটা গর্ত।

আমাকে যখন ঢুকতে বলা হোলো, তখন আমি অবাক হোয়ে দেখছিলাম, দেওয়ালে একটা ঘোড়ার খুরের আকারের অদ্ভুত লোহার যন্ত্র। কারারক্ষক সেটা লক্ষ্য করে বললে,—"বুঝেছি মশায়, ওটা কি আপনি জানতে চান, না? ওটা হোলো যখন ওপরওলারা কারো ফাঁসীর হুকুম ছান, তখন তাকে ওর সামনে একটা টুলের উপর বসানো হয়, তার পর তার মাথাটাকে এমন ভাবে পিছনে হেলিয়ে দেওয়া হয় যাতে ঐ যন্ত্রটা ঠিক গলার মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, তারপর গলায় একটা সিল্কের দড়ি বেঁধে ঐ গর্ত দুটোর ভিতর দিয়ে দড়িটাকে ঢুকিয়ে পিছনে যে চাকার মত যন্ত্র, তার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এর পর চাকাটা ধরে ঘোরানো—যতক্ষণ না প্রাণটা বেরোয়"—

—"বাঃ বাঃ চমৎকার! আমার মনে হয় ঐ চাকা ঘোরানোর মহৎ কার্যটি আপনিই সম্পাদিত করেন"—মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো আমার।

কোনো উত্তর না দিয়ে কারারক্ষক তখন সোজা আমাকে সেই খুপরীটার ভিতর ঢুকিয়ে দিলে। তারপর দরজায় চাবি লাগাতে লাগাতে ফুটোটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে আমি কি খেতে চাই। আমি সজোরে উত্তর দিলাম—এখনো ভেবে ঠিক করিনি। বিনা বাক্যব্যয়ে

লোকটা চলে গেল—পিছনে একের পর এক দরজায় সতর্কভাবে তালা লাগাতে লাগাতে।

এতক্ষণে আমি নিজের অবস্থাটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আর সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন প্রচণ্ড বিক্ষোভে আর্তনাদ করে উঠলো…ঐ অন্ধকার অপরিসর গর্তের মধ্যে দুঃখে, হতাশায়, ক্ষোভে পাগলের মত হোয়ে উঠলাম। জানলাটা দুই হাতে চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক ইঞ্চি পুরু লোহার জাফরীকাটা জানলা। পাঁচ ইঞ্চি চৌকো করে কাটা ষোলোটা গর্ত তাতে। আলো একটু আসতে পারতো কিন্তু সামনের দেওয়ালের জানলার উপরই ছাদের মস্ত বড় বরগাটা এমন ভাবে এসে পড়েছে যে, একটু আলোর সম্ভাবনাটুকুও ঢেকে গেছে। ঘরের ভিতর চেয়ে দেখলাম বিছানা, টেবিল চেয়ার ইত্যাদি কিছুই নেই, কেবল একটা টাব, আর দেওয়ালে গাঁথা একটা কাঠের তাক ছাড়া। তাকের উপরই আমি আমার সিল্কের জোব্বা, নতুন কোট আর স্পেনের লেশের কাজকরা সাদা টুপীটা রাখলাম।

গরম, কি অসহ্য গরম—একটু বাতাসের আশায় আবার জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। একটি মাত্র জায়গা যেখানে কনুই দুটোর উপর ভর দিয়ে একটু দাঁড়াতে পারি। কিন্তু সে সুখটুকুও সইলো না। দাঁড়াতেই দেখি, সামনের খুপরীটাতে অসংখ্য বড় বড় ইঁদুর ছুটোছুটি করছে। আমার রক্ত যেন জল হোয়ে গেলো—চিরকাল ঐ প্রাণীটাকে ভয় ও ঘৃণা করে এসেছি। তাড়াতাড়ি কাঠের পাল্লাটা টেনে দিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিলাম।

পুরো আটটি ঘণ্টা কাটিয়ে দিলাম জানলায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে। নির্বাক নিঃশব্দে, হোয়ে। সে যে কি অনুভূতি তা' প্রকাশের

অতীত! আমার একটুও ক্ষুধা ছিল না কিন্তু অসহ্য তৃষ্ণা। মুখের ভিতর কেমন একটা তিক্ত স্বাদ পাচ্ছিলাম। আরও তিনটি ঘণ্টা এই ভাবে কাটিতে আমি ক্রোধে, ক্ষোভে, যন্ত্রণায় উন্মত্ত হোয়ে উঠলাম, চিৎকার করতে লাগলাম, আর্তনাদ করতে লাগলাম দেওয়ালে আর দরজায় পাগলের মত লাথি মারতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক ধরে এই ভাবে ক্ষিপ্তের মত পরিশ্রম করে হতাশায়, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে মেঝের উপর সোজা শুয়ে পড়লাম। আমার স্থির বিশ্বাস হোয়েছিলো যে, নিশ্চয়ই বর্বর অসভ্য গোয়েন্দা অফিসাররা আমাকে না খেতে দিয়ে তিলে তিলে শুকিয়ে মেরে ফেলবে ঠিক করেছে। কিন্তু কি যে আমার অপরাধ তা সত্যিই ভেবে পাচ্ছিলাম না, যার ফলে আমার এই দুর্ভোগ। হোতে পারি লম্পট, জুয়াড়ী, স্পষ্টবাদী, জীবনের নির্দোষ আমোদগুলির একটু বেশী প্রিয় কিন্তু দেশের বিরুদ্ধে কোনো কাজই তো করিনি,—আইনের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধই তো করিনি। ভাবতে ভাবতে আর মনে মনে শাপশাপান্ত করতে করতে এক সময় ক্ষুধার জ্বালা আব অসহ্য ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো তখন চারি দিকে নিকষ-কালো অন্ধকার! চোখ মেলে কিছুই দেখতে পেলাম না, শুধু কালো কালো আর কালো ...বাঁ দিক ফিরে শুয়েছিলাম। সেই একই ভাবে থেকে হাত বাড়িয়ে ডানদিকের পকেট থেকে রুমালটা বার করতে গেলাম···

কি সর্বনাশ! আমার আঙুলগুলো গিয়ে ঠেকলো একটা বরফের মত ঠাণ্ডা হাতে—

পা থেকে মাথার চুলগুলো অবধি আতঙ্কে খাড়া হোয়ে উঠলো। জীবনে এত নিদারুণ আতঙ্ক কোনো দিনও অনুভব করিনি। পূরো তিন চার মিনিট বোধহয় আমার কোনো জ্ঞানই ছিল না। একটু

সাড় হোতেই একবার মনে হোলো, আমার কল্পনা নয়তো ওটা? আবার হাত বাড়ালাম, আবার ছু'বারই সেই মৃতদেহের হিমশীতল হাতের স্পর্শ!

গলা চিরে বেরোলো তীক্ষ্ণ, তীব্র, প্রচণ্ড আর্তনাদ!

একটু সামলে নিয়ে ভাবলাম, যখন আমি ঘুমোচ্ছিলাম তখন বোধহয় একটা মৃতদেহ এনে আমার পাশে ফেলে রেখে গেছে। কারণ, আমি যখন ঘরে প্রথম ঢুকি তখন যে কিছুই ছিল না ঘরে, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমার মনে হোলো কাউকে ফাঁসী দেওয়া হোয়েছে, এটা তারই মৃতদেহ, আর আমার ঘরে ফেলে যাবার অর্থ বোধহয় জানিয়ে দেওয়া আমার বরাতেও ঐরকম মৃত্যু রয়েছে। একথা মনে হোতেই সমস্ত ভয় প্রচণ্ড রাগে পরিবর্তিত হোলো। ওদের ঐ বর্বরতার বিরুদ্ধে সমস্ত দেহ-মন প্রতিবাদ জানালো—রাগের জ্বালায় উঠে বসতে গিয়েই এক মুহূর্তে বুঝলাম আমার এত আতঙ্ক সবই সৃষ্টি করেছে আমারই বাঁ হাতখানি। বাঁ দিক ফিরে বাঁ হাতখানি চেপে শোবার দরুণ রক্ত চলাচল বন্ধ হোয়ে গিয়েছিলো আর সেই জন্য অসাড় আর ঠাণ্ডাও হোয়ে উঠেছিলো হাতখানি।

সমস্ত ঘটনাটা শেষ অবধি হাস্যরসের পর্যায়ে পড়লেও আমি কিন্তু এতটুকুও কৌতুক বোধ করিনি। বরং উল্টোটাই মনে হোয়েছিলো যে এমন ভয়ানক জীবন আবার সুরু হোলো যেখানে সত্যিও মিথ্যের রূপে প্রকাশ পেতে পারে, অথচ বিচারশক্তি ক্রমেই হারাতে হবে··· হয় অসম্ভবের আশা, নয় নৈরাশ্যের উন্মত্ততা, এই ছু'য়ের মাঝখানে দোল খেতে খেতে বুদ্ধিবৃত্তি সবই হবে ক্ষান্ত···

সমস্ত রাতের পর ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে শব্দ পেলাম দূর থেকে একের পর এক তালা খোলার। শেষ অবধি দরজার পাশ

থেকে কারারক্ষকের কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল—'কি খেতে চান ভাববার সময় পেয়েছিলেন তো ?'

বেশ ভদ্রভাবেই আমি চাইলাম, একটু ভাত, স্যুপ, সিদ্ধ মাংস; কিছু রুটী মদ আর জল। লোকটা একটু অবাক হোলো দেখলাম, আমার কাছ থেকে কোনোরকম নালিশ না শুনে, ও সেটাই আশা করেছিলো। আমাকে বললো যে, আমি বিছানা কিম্বা কোনো কিছু আসবাব চাইলাম না দেখে ও অবাক হোয়ে গেছে। কারণ আমি যদি ভেবে থাকি যে আমাকে দু'একদিনের জন্যে আনা হোয়েছে এখানে তাহলে মস্ত ভুল করবো।

—যা' দরকার মনে করেন দিতে পারেন—

—আমি আবার কোথায় ছুটবো তার জন্য ? এই পেন্সিল আর কাগজ নিন—এতে লিখে দিন যা দরকার।

আমি জামাকাপড়, আসবাব ইত্যাদির একটা তালিকা দিলাম। আর সেই সঙ্গে আমার যে বইগুলি পুলিশে নিয়ে গিয়েছিলো সেগুলিও লিখে দিলাম।

—আহা অত তাড়া নয়, অত তাড়া নয়। ওসব বই-পত্তর, কাগজ-কলম, আয়না, ক্ষুর ওসব কাটুন·········ওসব দেওয়া বে-আইনী। বরং আপনার খাবারটা কেনার জন্যে কয়েকটা টাকা দিন—

আমি ওই অভদ্র বর্বরটার হাতে একটা সেকুইন দিলাম। লোকটা চলে গেল। পরে শুনেছিলাম আরও সাত জন বন্দী এই 'দি লেডস্'এর সেলে রয়েছে। প্রায় দুপুরবেলা লোকটা ফিরে এলো খাবার আর আসবাবপত্র নিয়ে। একটি মাত্র হাতীর দাঁতের চামচ—কাঁটা-ছুরি দেওয়াও বারণ।

—কালকের যা দরকার সেটাও জানিয়ে দিন। কারণ, দিনে একেবারের বেশী আমি আসতে পারি না। আর আপনাকে কতকগুলি শিক্ষণীয় বই পাঠানো হবে। আপনার তালিকায় লেখা বইগুলি দেওয়া বারণ। সেক্রেটারীর হুকুম তাই—

—বেশ কথা, আমাকে একলা থাকতে দেওয়ার জন্ম আমার ধন্যবাদ তাঁকে জানাবেন।

—বলতে বলছেন যখন বলবো। কিন্তু এসব ঠাট্টা-তামাসার ফল কিছু ভালো হবে না—

—ঠাট্টা নয়, বদমায়েশ কয়েদীদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকার চেয়ে এ তো অনেক ভাল হোয়েছে—

—বদমায়েশ কয়েদী! কি বলছেন মশাই? আশ্চর্য! আমাদের এখানে কেবল মহৎ সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদেরই রাখা হয়—অবশ্য তাঁদের বন্দী করার কারণ বিখ্যাত বিচারকই বলতে পারবেন, আপনার শাস্তি কঠোরতর করবার জন্যেই আপনাকে এভাবে রাখা হোয়েছে আর আপনি আমায় দিয়ে ধন্যবাদ পাঠাচ্ছেন?

—ওঃ আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—

কারারক্ষক চলে যাবার পর আমি টেবিলটা টেনে এনে দরজার সামনে রাখলাম একটু আলোর আভাস পাবার জন্যে—তারপর খেতে বসলাম। কয়েক চামচ স্যুপ্ ছাড়া কিছুই গিলতে পারলাম না—দীর্ঘ আটচল্লিশ ঘণ্টা উপবাসের পর কেমন যেন বমির ভাব আসছিল। সমস্ত দিনটা ইজিচেয়ারে এলিয়ে পড়ে কাটিয়ে দিলাম। নিদারুণ অবসন্নতা আমার দেহ-মন ছেয়ে ফেলেছিলো। এলো রাত্রি। দু'চোখের পাতা সারা রাতেও এক হোলো না। আলো-বাতাসহীন বদ্ধ খুপরী—প্রতি পনের মিনিট অন্তর সেণ্ট মার্কের

গীর্জ্জার প্রচণ্ড ঘণ্টাধ্বনি···আর সারাক্ষণ মস্ত মস্ত ইঁদুরদের ছুটোছুটি আর কিচ্‌কিচিনীর শব্দ···আর সবার উপর হাজার হাজার পোকা আমার সর্বাঙ্গ যেন ছেঁকে ধরেছিলো, সমস্ত গায়ের রক্ত যেন পাম্প্‌ করে শুষে নিচ্ছিল ঐ অসংখ্য পোকার মুহুর্মুহু দংশন···আমার সমস্ত পেশীর আক্ষেপ সুরু হোলো—নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হোয়ে আসতে লাগলো···সমস্ত রক্ত যেন বিষাক্ত হোয়ে উঠলো···সে যে কি যন্ত্রণাদায়ক, নিদারুণ তিক্ততম অভিজ্ঞতা, সেটা অনুভব করবার মত শক্তি কারো আছে বলে জানি না।

ভোরবেলা কারারক্ষকটি আবার এলো, সঙ্গে কয়েক জন প্রহরী—কারারক্ষকটির নাম জানলাম লরেন্স। ওই প্রহরীরাই আমার খুপরীটা ধুয়ে-মুছে বিছানা করে দিলে। এক জন হাত-মুখ ধোবার জন্য জল এনেছিলো—আমি জিজ্ঞাসা করলাম সামনের ছোট্টো খুপরীতে বেরোতে পারবো কি না···লরেন্স জানালো হুকুম নেই।

দিনের পর দিন কাটলো আশা আর নিরাশায়—হতাশা আর ব্যর্থতায়—ক্ষোভে আর উন্মত্ততায়। প্রতি দিনই আশা করতাম, হয়ত কাল সকালেই দেখবো আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোয়েছে। অবশ্য নিরাশও হতাম কারণ যা হওয়া উচিত, যা ন্যায় তা, কখনও পিয়োম্বীতে ঘটে না। অগাষ্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর···দীর্ঘ ভারাক্রান্ত দিনগুলি কেটে গেল। নভেম্বরের প্রথম দিকে নিরাশায় আর ব্যর্থতায় মরিয়া হোয়ে ঠিক করলাম, যেখানে আমাকে জোর করে ধরে রাখা হোয়েছে সেখান থেকে আমি জোর করে বেরিয়ে যাবো।

ঐ একটা খেয়ালই মাথায় ঘুরতে লাগলো···সারাক্ষণ ওই একই চিন্তা করতে লাগলাম।

১৭৫৬ সাল। নববর্ষের দিন লরেন্স এসে ঢুকলো হাতে একটা মস্ত প্যাকেট নিয়ে। তার ভিতর রয়েছে একটা ড্রেসিং গাউন, ভালো চামড়ার লাইনিং দেওয়া, মস্ত ভালুকের চামড়ার ব্যাগ পা ঢুকিয়ে বসার জন্যে আর সিল্কের লেপ। সেই অসহ্য শীতের দিনে এমন উপহার পেয়ে আনন্দে আমার চোখ ফেটে জল এলো···বিশেষ করে যখন শুনলাম, মাসে ছয়টি সেকুইন আমাকে দেওয়া হবে ইচ্ছামত বই কিনে পড়বার জন্য। এই উপহার এই অতুলনীয় দান—সবই আমার পিতৃতুল্য, অকৃত্রিম বন্ধু, বৃদ্ধ ব্রাগাদার কাছ থেকে। লরেন্সের কাছে শুনলাম, তিনি তদন্ত কর্মচারীদের কাছে, বিচারকের কাছে নতজানু হোয়ে অশ্রুসিক্ত চোখে প্রার্থনা করেছেন তাঁর স্নেহের নিদর্শনস্বরূপ এগুলি আমাকে পাঠাতে। আমার মনের অবস্থা তখন অবর্ণনীয়। একখানি কাগজে লিখে দিলাম—'ট্রাইব্যুনালের সদাশয়তার জন্য আর ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদাঁর স্নেহের অফুরান উৎসের জন্য ধন্যবাদ জানাই।'

একদিন ভাগ্যক্রমে অনুমতি পেলাম ঘরের সামনের ছোটো খুপরীটাতে বেড়াবার। অবশ্য অল্প সময়ের জন্য। যাই হোক, হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়লো, একটা বিশ ইঞ্চি লম্বা লোহার পুরু শক্ত খিল পড়ে রয়েছে—চকিতে মনে হোলো, এটা দিয়ে আত্মরক্ষার কাজ চালানো যেতে পারে হয়তো। তখনি সেটা ড্রেসিং গাউনে ঢেকে নিয়ে এলাম। অবশ্য আরও অনেক ভাঙাচোরা জিনিসপত্র ও একটা ভাঙাগোছের সিন্দুক দেখলাম। ওই লোহার লম্বা রডটাকে নিয়ে পড়লাম পুরো আটটি দিন ধরে···এক টুকরো মার্বেল পাথরের উপরে ক্রমাগত ঘষে ঘষে মুখটা তীক্ষ্ণ সূঁচালো করে তুললাম। আটটি ধারওলা পিরামিডের আকৃতির মত হোলো—সব কোণগুলি ক্রমেই সূচাগ্র হোয়ে নেমে এসেছে। অবশ্য এত

ব্যাপার বড় সহজে হয়নি। অনেক পরিশ্রম করে, তবে। একটুও তেল নেই, থুতুতে ভিজিয়ে নিয়েছি পাথরটা। ডান হাতের পেশীতে এত ব্যথা হোয়েছিলো যে, নাড়তে পারতাম না, হাতের চেটোতে তো দগদগে ঘা···কিন্তু স্বহস্তে প্রস্তুত আমার শাণিত অস্ত্রের দিকে যখন চাইতাম, সব যন্ত্রণা ভুলে যেতাম। অবশ্য তখনি ওটা নিয়ে কি কাজে লাগাবো বুঝতে পারি নি, তবে প্রথম কর্তব্য হোলো যে, ওই গোয়েন্দাটা আর প্রহরীদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে ওটা লুকিয়ে রাখা, সেটা বুঝেছিলাম।

একটা বেশ ভালো নিরাপদ জায়গা ঠিক করলাম ইজিচেয়ারের পিঠের লাগানো কুশানের ভিতরটা, সেখানে ওটা রেখে যে কী বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলাম সেটা পরে বুঝেছি।

আমি নিশ্চিত জানতাম যে আমার এই ঘরখানার নীচেই সেই জায়গাটা যেখানে সেক্রেটারীর সঙ্গে আমার দেখা করানো হয়েছিলো। ঘরটা রোজ সাফ করা হোতো। আসল কাজ হোলো ঐ অস্ত্রটা দিয়ে মেঝেতে গর্ত করে তারপর বিছানার চাদরটার সাহায্যে নীচের ঘরটায় নেমে পড়া। আর যতক্ষণ না দরজা খোলা হয় টেবিলের নীচে লুকিয়ে থাকা। যেই কেউ আসবে তখন আছে আমার অস্ত্র—মুক্তির পথ খুঁজে দেবে। কিন্তু ভাবলাম, এখন রোজ যে মেঝে খুড়বো তাহলে ধুলোর আর মেঝে খোঁড়া গুঁড়োর স্তূপ কোথায় লুকবো? লরেন্স আর প্রহরীরা তো বিছানার নীচটা রোজ পরিষ্কার করে—আমার বিশেষ করে বলা আছে রোজ ভালো করে সাফ করতে।

ভাণ করলাম দারুণ ঠাণ্ডা লাগার, আর ধুলো উড়লেই কাশি বাড়বে। কয়েক দিন এই ছলনাতে বেশ চললো কিন্তু ওই

গোয়েন্দা লরেন্সটা ঠিক সন্দেহ করলো কিছু···একদিন একটা বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে ঘরের প্রত্যেকটি কোণ তন্ন তন্ন করে দেখে সাফ করলো। আমার প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও। পরদিন সকালে আমি করলাম কি, আঙ্গুলে খোঁচা দিয়ে রক্ত বের করে রুমালে লাগালাম। তারপর লরেন্স এলে বললাম যে, কাল ধূলো ওড়ার ফলে কি হোয়েছে দেখুন—আমার অসম্ভব কাশি বেড়েছিলো সম্ভবত গলার কোন শিরা ছিঁড়ে গেছে—ডাক্তার ডাকা হোলো, আমি আমার রোগের কারণ জানালাম, তিনি বললেন আমার কথাই ঠিক, ধুলোর মত ফুসফুসের আর শত্রু নেই, এমন কি একটি যুবক কয়েক দিন আগে ঠিক এই রকম কারণে মারা গেছে···সাবাস, আমি বোধ হয় ঘুষ দিয়েও এত ভালো স্বপক্ষে ওকালতী করাতে পারতাম না।

আমার লাভ হোলো প্রচুর, কারণ প্রহরীদের বারণ হোয়ে গেল যে আমার ঘর ঝাঁট দিয়ে সাফ করে আমাকে যেন আর বিরক্ত না করা হয়। লরেন্স আমার কাছে বার বার ক্ষমা চাইলে, শপথ করে বললে যে আমাকে খুশি করবার জন্যেই ও ঘর পরিষ্কারের দিকে অত নজর দিতো।

দীর্ঘ শীতের রাত্রি···আমাকে প্রায় উনিশটি ঘণ্টা অন্ধকারেই কাটাতে হোতো। রান্নাঘরের মিটমিটে আলোও একটা জুটলে কী ভালোই না হোতো? কিন্তু কোথায় পাবো? এ কথা ঠিক 'অভাবই আবিষ্কারের স্রষ্টা'—আমার একটা মাটির ভাঁড় ছিলো, তাইতে আমি ডিম রান্না করতাম, সেইটাকে স্যালাড তেলে ভর্তি করে লেপ ছিঁড়ে তুলো বের করে সলিতা তৈরী করলাম, কিন্তু আগুন জ্বালি কি করে? লরেন্সকে বললাম যে দাঁতের যন্ত্রণায় অসহ্য কষ্ট পাচ্ছি আমাকে একটু 'পিউমিস ষ্টোন' (আগ্নেয়গিরির প্রচুর ছিদ্রযুক্ত এক প্রকার পাথর)

এনে দিতে হবে। স্বভাবতঃই ও বললে জিনিসটা কি তা জানেই না, তখন আমি যেন নেহাৎই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললাম, তাহলে একটা চকমকি পাথর হোলেও চলবে যদি বেশ করে ভিনিগারে ভিজিয়ে রাখা যায়। ওই বোকা শয়তানটা প্রায় আধ ডজন আমাকে দিলে।

আমার পা-জামাতে একটা মস্ত বকলস ছিলো ইস্পাতের··· চক্‌মকি, ইস্পাত সবই জুটলো বলে বেশ গর্ব হোলো তখন। কিন্তু আরও বাকী যোগাড়ের···আগেকার পুরানো দাগ দেখিয়ে ডাক্তারকে চর্মরোগের ভাঁওতা দিয়ে কিছু সালফার পর্যন্ত আদায় করলাম নিজেই অষুধ তৈরী করে নেবো বলে। যেন অষুধ তৈরীর জন্যই চাইছি এই ভাবে এমন সোজাসুজি লরেন্সের কাছে দেশলাই চাইলাম যে ওর পকেটে যে কয়টা কাঠি ছিলো ও সব কয়টাই দিয়ে দিলো কিছু না ভেবেই। এবার শেষ দরকার কিছু জিনিসের যা সহজেই জ্বলে উঠবে। হঠাৎ মনে পড়লো আমার দর্জিদের বলা আছে আমার সব পোষাকের বগলের তলার কাপড়ের ভিতরে 'টাকউড' দেওয়া থাকে যেন; কারণ তাতে ঘাম শুষে নেয়। আর ওই বিশেষ ধরনের কাঠটা সহজেই জ্বলে ওঠে জানি, সামনেই কোটটা পড়ে রয়েছে দেখে আশায় আনন্দে বুকটা দুলে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাও জাগলো, কি জানি এটাতে হয়তো দেয়নি। মাঝে মাঝে এক একটাতে ভুলে যাওয়াও তো কিছু বিচিত্র নয়। আশা আর নিরাশায় দুলতে দুলতে খুলে ফেললাম ভিতরটা—জয় ভগবান! এই তো রয়েছে! আর কি চাই? সব উপাদানই তো পেলাম। সে যে কী আনন্দ···সেই নিকষ-ঘন অন্ধকারে এই প্রথম আলোর আভাস জাগাতে···যে আলো আমারি হাতের সৃষ্টি। আঃ কি তৃপ্তি আর সেই ভয়াবহ দীর্ঘ ভারাক্রান্ত রাত্রির আক্রমণ হবে না—

মেঝেটা কাঠের ছিলো। প্রায় ছটি ঘণ্টা খোঁড়বার পর প্রায় এক তোয়ালে-ভরা গুঁড়ো জড়ো হোলো। এক পাশে ঢেলে রাখলাম, ভাবলাম সামনের খুপরীটাতে বেড়াবার সময়ে সিন্দুকের পাশে ঢেলে দিয়ে আসবো। প্রথম তক্তাটা প্রায় ছ ইঞ্চি পুরু, সেটা গর্ত হোলে দেখি, তলায় আবার একটা তক্তা। প্রায় তিনটি সপ্তাহ লাগলো আমার তিনটি তক্তার ভিতর গর্ত করতে। কিন্তু তাব তলাটা দেখে হতাশ হোয়ে পড়লাম। এবার দেখি মার্বেল পাথরের মোজেক··· আমার যন্ত্রটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটু দাগও বসাতে পারলাম না। ভাবতে ভাবতে গল্প মনে পড়ে গেল হানিবল কি করে আল্পস পর্বতের ভিতর পথ করে বেরিয়েছিলে।—পাহাড়টাকে ভিনিগারে ভিজিয়ে নরম করে নিয়ে—আমিও দিলাম ঢেলে সমস্ত ভিনিগারটা ওই গর্তটা দিয়ে। পরদিন সকালে দেখি, যে কারণেই হোক মোজেকের গাঁথনির বাঁধুনিটা গলে গিয়ে ওপরটা কুঁকড়ে গিয়েছে তখন আমার ওই লোহার রড দিয়ে প্রাণপণে ঘষে ঘষে গর্ত করতে পারলাম। দেখি, তলায় আর একটি কাঠের তক্তা দেখা যাচ্ছে—মনে হোলো এটাই নিশ্চয়ই শেষ স্তর।

উঃ, মনে পড়ে তখন মনের কী অবস্থা না গিয়েছিলো—কী একাগ্র কাতর প্রার্থনায় আমার প্রতিটি মুহূর্ত কাটতো। শক্তিশালী বুদ্ধিমন্তের৷ হয়তো তর্ক করবেন প্রার্থনা করে লাভ কি—ও তো ভুয়া ইত্যাদি। কিন্তু তারা জানেন না, আমার আপন অভিজ্ঞতায় আমি যে জেনেছি একাগ্র গভীর প্রার্থনায় যে কি শক্তি পেয়েছিলাম বলতে পারি না—ঈশ্বরের অনুগ্রহ যদি নাই স্বীকার করি, একথা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ঈশ্বরে একান্ত বিশ্বাসের মনের জোর থেকেই এ শক্তি আসে।

তেইশে অগাষ্ট আমার সব কাজ শেষ হোলো। শুধু প্লাষ্টারটুকু খসানো বাকী। ছোটো একটা ফুটো দিয়ে সেক্রেটারীর ঘরখানা এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি আমার মুক্তির দিনটাও আগে থেকে ভেবে রেখেছিলাম। সেণ্ট অগাষ্টিনের ভোজের উৎসব হবে সাতাশ তারিখে···এই প্রাসাদেরই অন্য অংশে সমস্ত কর্মচারী এবং কর্তাব্যক্তিদের একটা সম্মেলন আর উৎসব হবে। এদিকটাতে কেউ থাকবে না, অতএব ঐ তারিখেই পালাবার সবচেয়ে সুবিধা···

কিন্তু কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবী আমার! পঁচিশে অগাষ্ট আবার নামলো তাঁর কৌতুক অভিশাপের ছদ্মবেশে। সেদিনের কথা ভাবলে আজও শিউরে উঠি। মনে পড়ে দুপুরের দিকে হঠাৎ তালা আর খিল খোলার শব্দ পেলাম। লাফিয়ে উঠে পড়ে ইজিচেয়ারে বসে পড়লাম—পরমুহূর্তে ঘরে ঢুকলো লরেন্স। রীতিমত উত্তেজিত ভাবে চেঁচিয়ে বললে—'সুসংবাদ এনেছি মশায়, সত্যই সুসংবাদ।'

প্রথমটা ভাবলাম বুঝি আমার ক্ষমার আদেশ এসেছে, তাই মুক্তি পেলাম। কিন্তু ভয়ে প্রাণ কেঁপে উঠলো পাছে গর্তটা ধরা পড়ে। সে ভাবটা চেপে বললাম—দাঁড়ান পোষাক বদলে আসছি

—না, না তার দরকার নেই। আপনাকে শুধু এই নরককুণ্ডের মত ঘর থেকে অন্য ঘরে নিয়ে যাবার আদেশ এসেছে। সে ঘরখানা বড়, সবে কলি ফেরানো হোয়েছে, তাছাড়া বড় বড় দুটো জানালাও আছে—সেখান থেকে প্রায় অর্দ্ধেক ভেনিসটাই দেখতে পাবেন।··· এমন কি সোজা হোয়ে দাঁড়াতেও পারবেন এমন উঁচু ঘর—

আমার মনে হোলো মূর্চ্ছা যাবো।—একটু ভিনিগার দিন, কোনো মতে আমি বললাম, আর সেক্রেটারীকে গিয়ে বলুন আমি তাঁকে আর ট্রাইব্যুনালকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই করুণার জন্য, কিন্তু আমি

এই ঘরেই থাকবার অনুমতিটুকু তাঁদের কাছে ভিক্ষা চাই আমার বেশ অভ্যাস হোয়ে গেছে। আমি বদল করতে চাই না।

আপনি কি পাগল হোলেন নাকি মশায়? কিসে আপনার ভাল হবে বুঝতে পারেন না? লরেন্সের সেই অতি বিনীত গা-জ্বালানো চিবিয়ে কথা যেন কানে গরম সীসে ঢালতে লাগলো—আপনাকে বলে নরক থেকে উদ্ধার করে স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হোচ্ছে আর তাতেই আপত্তি? আসুন, আসুন, হুকুম তো মানতেই হবে। আমার হাত ধরে চলুন, বই আর জিনিসপত্র ওরা আনবে—

জানতাম বিদ্রোহ করা মিথ্যা। দুশ্চিন্তায় মৃতপ্রায় অবস্থা তখন, কোনো মতে ওর হাতে ধরে টলতে টলতে বেরিয়ে এলাম। দুটো সরু বারান্দা পেরিয়ে তিন ধাপ উঠে আবার একটা হল পেরিয়ে আরও একটা সরু বারান্দা পেরিয়ে আমার নতুন জায়গাটাতে পৌছলাম। ঘরের ভিতর অবশ্য একটা জাল দেওয়া জানালা কিন্তু ঢাকা বারান্দাতে দুটো জানলা ছিলো—তা থেকে বহুদূর প্রায় লিডো অবধি দেখা যায়। জানলা দিয়ে নবম মিষ্টি খোলা হাওয়া আসছিলো—খোলা হাওয়া তো আমার কাছে বহু দিন অপরিচিত···কত দিন বুকভরা নিঃশ্বাস নিইনি! কিন্তু এসব কিছুই সে সময় ভালো লাগছিল না—একমাত্র সান্ত্বনা যে আমার ইজিচেয়ারটা ইতিমধ্যেই এসে গেছে আর তারই পিঠে লুকানো আছে যন্ত্রটা। আমার বিছানাটাও এলো। এবার অন্য জিনিসগুলি আনতে গিয়ে প্রহরীরা আর ফিরলো না, দু'টি ঘণ্টা কি অসহ্য দুশ্চিন্তায় কাটলো···আমার সেলের দরজা অবধি খোলা রয়েছে···এর চেয়ে অস্বাভাবিক এখানে আর কি হবে? কি নিদারুণ যন্ত্রণায় আর দুর্ভাবনায় মুহূর্তগুলি কাটতে লাগলো—এমন সময় মনে হোলো কে যেন দ্রুতপদে এগিয়ে আসছে···

পরমুহূর্তে লরেন্স এসে ঢুকলো, রাগে বিবর্ণ হোয়ে গেছে। মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে আর শাপশাপান্ত করছে। ঢুকেই আমাকে বললে সমস্ত যন্ত্রপাতি যা কিছু আছে সব দিয়ে দিতে আর যে প্রহরী আমাকে এই সব সংগ্রহ করে এনে দিয়েছে তার নাম বলতে। আমি বললাম ওর কথা আমি কিছুই বুঝছি না। তখন সঙ্গের লোকদের হুকুম করলে আমার দেহ তল্লাসী করতে—আমি লাফিয়ে উঠলাম, সমস্ত জামাকাপড় নিজেই খুলে ফেলে দাঁড়িয়ে বললাম—যা করবার আছে কর·· কিন্তু খবরদার আমাকে ছোঁয়ার সাহস কোরো না—

ওরা আমার বালিস বিছানা সব তন্ন তন্ন করে খুঁজলো। ইজিচেয়ারটার কুশন অবধি, কিন্তু পিছনের স্প্রীংএর ভিতর খুঁজে দেখার মত বুদ্ধি ওদের ছিল না। লরেন্স বললে,—মেঝের উপর কি যন্ত্র দিয়ে গর্ত খোড়া হয়েছে।·· জানি সহজে বলবেন না। কিন্তু আমরাও কথা বার করবার উপায় জানি –

—"যদি সত্যিই মেঝেতে গর্ত খোঁড়া থাকে·· আর এই নিয়ে যদি আমাকেই প্রশ্ন করা হয় তাহলে আমি সোজা বলবো আপনিই আমাকে নিজের হাতে ঐ-সব যন্ত্রপাতি এনে দিয়েছিলেন আর সেগুলো আমি আপনাকেই আবার ফিরিয়ে দিয়েছি··"

আমার বলার ভঙ্গীতে আর দৃঢ়তায় ও স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো—তারপর নিরুপায় ক্ষোভে আর ক্রোধে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় প্রচণ্ড আক্রোশে বারান্দার জানালা দু'টিও সশব্দে বন্ধ করে দিলে। আবার সেই রুদ্ধশ্বাস কারাকক্ষ···

সারা দিনের পর এনে দিলে পুতিগন্ধময় নোংরা খানিকটা মদ, মাংস রুটি আর জল। সে আমি স্পর্শ করতেও পারলাম না।

মাংসটা পর্যন্ত সম্পূর্ণ পচা। সমস্ত দিন রাত্রি কাটলো অনিদ্রায় অনাহারে তৃষ্ণায় আর অসহ্য গরমে। পরদিন আবার ঐরকম দুর্গন্ধময় খাদ্য নিয়ে ঢুকলো—আমি চীৎকার করে বলে উঠলাম—আমাকে অনাহারে আর শ্বাসরোধ করে মারবার হুকুম এসেছে কি? কিন্তু আমার কোনো কথায়ই কর্ণপাত করলে না। প্রায় আটটি দিন কাটলো এমনি প্রায় অনাহারে আর উত্তপ্ত শ্বাস রোধকারী বন্ধ ঘরে। এক এক সময় মনে হোতো এবার ওকে খুন করে ফেলবো ঘরে ঢুকলেই। সেদিন রাত্রে যে কারণেই হোক সুনিদ্রা হোয়েছিলো। সকালে ঘরে ঢুকতেই প্রহরীদের সামনে ওকে বজ্রগম্ভীর স্বরে বললাম—আমার হিসাবপত্র ঠিক করে এনে দেখাতে। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে কি কি খরচ আমার জন্যে করেছে তার পাই পয়সাটার হিসাব অবধি দিতে হবে। এই কথায় লরেন্স স্পষ্টই একটু হতভম্ব হোয়ে গেল। অস্বস্তির সঙ্গে বললে, পরদিন সব হিসাব আমাকে দেখাবে।

পরদিন ভোরেই ও হাজির হোলো এক ঝুড়ি লেবু নিয়ে, ম্যঁসিয়ে ব্রাগাদাঁর উপহার। তা ছাড়া আমার খাদ্যেরও চমৎকার পরিবর্তন। একটি আস্ত মুরগীর রোষ্ট, এক বোতল ঠাণ্ডা সুস্বাদু জল। আমাকে হিসাবও দিলে। চোখ বুলিয়ে দেখলাম চার সেকুইন অবশিষ্ট। লরেন্সকে বললাম তিনটি সেকুইন ওর স্ত্রীকে দিতে, বাকী একটি প্রহরীদের ভাগ করে দিলাম। এইটুকুতেই ওদের প্রসন্নতা লাভ করলাম।—গর্তটা খুঁড়বার জন্যে আমি যন্ত্র এনে দিয়েছি—এটাই বা কি করে হোলো তা' না বুঝলেও আপনাকে অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু দয়া করে বলবেন ঐ আলো তৈরীর উপকরণগুলো কে জোটালে?—লরেন্সের অনুনয়ের ভঙ্গীতে, বললাম,—সেও আপনি।

আপনিই তো আমাকে তেল, চকমকিপাথর দেশলাই সবই দিয়েছেন—আমি সবই আপনাকে বলতে পারি আর সত্যি কথাই বলবো তবে এখানে নয়। সেক্রেটারী আর ট্রাইব্যুনালের সামনে—

রক্ষা করুন। হায় ভগবান! আপনাকে কিছু বলতে হবে না! গরীব ছাপোষা মানুষ আমি। আমার চাকরী যাবে। ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে বসতে হবে—বলতে বলতে লরেন্স পালালো।

একদিন আমি বই কিনতে দিলে লরেন্স বললে—এই পয়সা নষ্ট করে কেউ বই কেনে। আপনার যখন এত পড়বার সখ তখন আমাদের আর একজন বন্দীর কাছ থেকে আপনাকে বই ধার করে এনে পড়াতে পারি, তাতে পয়সাগুলো বাঁচবে—

—উপন্যাস? আমার ঘৃণা হয় পড়তে।

—"না না, বিজ্ঞানের বই। আপনার কি ধারণা মশাই, যে আপনিই একমাত্র বিদ্বান লোক?

—বেশ অন্য বিদ্বানটির কাছ থেকেই বই আনুন। বরং আমার একখানা তাঁকে পড়তে দিয়ে বদলী একটা আনুন—

আমি তাঁকে দিলাম 'রেশানারিয়াম' আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই লরেন্সের হাতে এলো 'উলফ' এর প্রথম খণ্ড।

বইখানার ভিতরে একটি পাতার মার্জিনে লেখা দেখলাম 'ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তাই সর্বনাশ আনে।' লেখাটা দেখেই মনে হলো এই বন্দীর সঙ্গে পত্র-বিনিময় করলে তো হয়। কিন্তু কালি, কলম, পেন্সিল? কিছু নাই বা থাক, আমার ডান হাতের তর্জনীর নখটিকে বাড়িয়ে সূচালো করে ঠিক কলমের নিবের মত করেছিলাম, জামের রসে ডুবিয়ে এখন কালির মত করে লিখতে পারলাম।

ওরই বইএর পাতায় লিখে দিলাম একটি আট লাইনের লাতিন কবিতা আর আমার কাছে যে সব বই আছে তার তালিকা। লেখার পরই মনে দারুণ আগ্রহ কি উত্তর আসে জানার—দীর্ঘ দিনের পর মানুষের মনের সঙ্গ। এ কি কম কথা। লরেন্স ভোরে আসতেই বললাম—এ বইখানা আমার পড়া অন্য একটা বদলে আনবেন। দ্বিতীয় খণ্ড এলো ভিতরে ভাঁজ করা ছোট্ট কাগজ—

আমরা দু' জনে একই কারাগারে বন্দী। এখানে আপনার সঙ্গে পত্রালাপের সুযোগে অত্যন্ত আনন্দিত। আমার নাম 'মার্তিন বালবি'। আমি ভেনিসবাসী। মঠের সাধু ছিলাম—এখানে আমার সঙ্গী কাউন্ট আন্দ্রিয়া। তিনি বলেছেন তাঁর সব বই আপনি খুশী মত পড়তে পারেন। সে সম্বন্ধে এই বইটার মলাটের পিছনে লেখা আছে। কিন্তু একটা কথা, সাবধান হবেন—লরেন্স যেন আমাদের পত্রালাপ সম্বন্ধে কিছু জানতে না পারে…

চললো আমাদের পত্রালাপ। ওদের জানালাম আমার পরিচয়। উত্তরে দীর্ঘ ষোলোটি পাতায় বালবির পরিচয় পেলাম। চার বৎসরে ও এইখানে বন্দী। তিনটি তরুণীর সঙ্গে ওর অবৈধ সংসর্গের ফলে যে সব অবৈধ শিশুর জন্ম হোয়েছিলো তাদের 'বালবি' নিজের নামে ব্যাপটাইজ (দীক্ষিত) করে এই তার অপরাধ। অবশ্য বালবি'র বক্তব্য এই যে, যেহেতু তারা ওরই সন্তান সেই হেতু তাদের নিজের নামে দীক্ষিত করাই ওর ন্যায়সঙ্গত কর্তব্য।

সে যাই যোক, আমি এদিকে বেশ বুঝেছিলাম যে মুক্তি যদি পেতে হয় নিজের চেষ্টাতেই পেতে হবে যা আপাতদৃষ্টিতে অসাধ্য। কারণ এবারে বেরোতে হলে ছাদ ফুটো করে বেরোতে হবে। অথচ আজ-কাল আমার ঘরের দেয়াল মেঝে রোজ তন্ন তন্ন করে দেখা

শেষ করে দিলে—তার পরই সুরু হোলো নেশার প্রলাপ আর কান্না। ওর অসংলগ্ন কথা থেকে বুঝলাম—গোয়েন্দা বিভাগে গুপ্তচরের কাজ করতো—অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করায় এই শাস্তি।

বালবিকে আবার খবর দিলাম ঘটনাটা জানিয়ে। আশ্বাস দিলাম ভেঙে পড়ার কারণ নেই, শুধু কাজটা এখন বন্ধ থাক যত দিন না আবার জানাই। লোকটার নাম সোরাদাচি। ওকে দেখলাম দু'বার বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হলো—দু'বার ফিরে এলো। বুঝলাম এর হাত থেকে সহজে নিস্তার নেই। অতএব প্রথম পন্থাটিই কাজে লাগালাম। প্রথমতঃ ওকে পরীক্ষা করবার জন্য দু'বারই যখন ওকে ট্রাইব্যুনালের বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় একটা ছলনার উপায় বার করেছিলাম। দু'বারই দেখলাম ও সহজেই বিশ্বাসঘাতকতা করলো। তাই নিয়ে যেন আমার সর্বনাশ হোয়ে গেছে এমন ভান করে ওকে নিষ্ঠুরভাবে শাপান্ত করলাম, তারপর বিছানায় অনড়, অচল নির্বাক হোয়ে শুয়ে রইলাম। ইতিমধ্যে লরেন্সকে দিয়ে একটি পবিত্র ক্রুশ, আর দু বোতল পবিত্র জল এনে রেখেছিলাম। আমার ধার্মিকতা সম্বন্ধে সোরাদাচি যথেষ্ট অভিভূত ছিলো। এখন আমার এই অবস্থা দেখে ওর ভয় হোলো—বহু অনুনয়, বিনয়, কান্নাকাটি করতে লাগলো। আমি কোনো কিছুতেই কান দিলাম না। মনে মনে তখন এক বিচিত্র হাস্যরসের অভিনয়ের মহড়া দিচ্ছি। সেই দিনই বালবিকে জানালাম—ভয় নেই, তবে আমাদের মুক্তি অতি কঠিন সতর্কতার সরু সুতোয় ঝুলছে—খুব সাবধান—আজই রাত্রে···

আমি ততক্ষণে মোটামুটি দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলেছিলাম। জানতাম নভেম্বরের প্রথম তিন দিন বিচারালয় আর তদন্ত বিভাগের

সমস্ত কর্মকর্তারা ভেনিসের বাইরে চলে যান। আর এই সুযোগে এই তিন দিন রাত্রে লরেন্স মনের সুখে নেশায় বুঁদ হোয়ে থাকে—

সবচেয়ে সুবিধা হোয়েছিলো, সোরাদাচি আমাকে অসম্ভব ভয় করতে সুরু কোরেছিলো—ওর দৃঢ় বিশ্বাস, আমার মত সাধুর অভিশাপ সহজেই ফলবে। সেদিন সারা দিন না খেয়ে পড়েছিলো—আমি ভাবলাম ওর নির্বোধ দুর্বল মনের মূঢ়তাকে কাজে লাগানোর এই সুযোগ। ডাকলাম ওকে—উঠে এসে আমার পায়ের তলায় পড়ে হাউহাউ করে কাঁদতে সুরু করলে। বললে, আমি ক্ষমা না করলে ওর নিশ্চিত মৃত্যু হবে। সুযোগ নিলাম অন্ধ-বিশ্বাসের—গম্ভীর স্বরে বললাম,—"বসো, কিছু খাও। জানো আজ ভোরে আমাদের পবিত্র দেবী ভাজিন মেরীর আবির্ভাব হোয়েছিলো—তোমাকে ক্ষমা করতে আদেশ দিয়ে গেছেন।—তোমার বিশ্বাস-ঘাতকতায় আমার কতবড় সর্বনাশ হোতো সেই ভেবে আমি পাগল হোয়ে গিয়েছিলাম। আমার একমাত্র সান্ত্বনা ছিলো যে, আমার অভিশাপে তিন দিনের মধ্যেই তোমাকে মরতে হবে। হঠাৎ ভোরবেলা দেবীর আবির্ভাব—আহা আমার কত জন্মের পুণ্যফল!—যা হোক দেবী বললেন, সোরাদাচির ভক্তিতে আমি তুষ্ট, ওকে ক্ষমা কর আর ওকে এই দয়ার জন্য তোমার পুরস্কার হোলো মুক্তি,—আমি মানুষের বেশে এক জন দেবদূতকে পাঠাচ্ছি, 'সে ছাত ফুটো করে তোমার ঘরে আবির্ভূত হোয়ে তোমাকে উদ্ধার করবে। তুমি সোরাদাচিকেও তোমার সঙ্গে মুক্ত করতে পারো, যদি সে প্রতিজ্ঞা করে গুপ্তচর বৃত্তি ছাড়বে জন্মের মতো"—এই বলে দেবী মেরীমাতা অদৃশ্য হোলেন—

মনের আনন্দ চেপে রেখে লক্ষ্য করতে লাগলাম বিশ্বাসঘাতকটার মুখের ভাব। ওর হতভম্ব ভাব দেখে আরও বিশ্বাসটাকে পাকা করবার জন্যে সমস্ত ঘরে পবিত্র জল ছিটিয়ে শুদ্ধ ভাবে বাইবেল খুলে পড়তে লাগলাম—আর ভার্জিনের ছবির সামনে মাঝে মাঝে নতজানু হোয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। সমস্ত দিন জল ছাড়া কিছুই খেলাম না আর সোরাদাচি সমস্ত সুরাটুকুই শেষ করলে।

নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক আগে আমি খুব আড়ম্বরের সঙ্গে নতজানু হোয়ে প্রার্থনায় বসলাম। গম্ভীরকণ্ঠে আদেশের সুরে সোরাদাচিকেও বললাম প্রার্থনায় যোগ দিতে। তখনি ও আদেশ পালন করলে, চোখে দেখলাম ভয়, সন্দেহ, সংশয় সব জড়ানো অদ্ভুত দৃষ্টি—মনে মনে হাসলাম, দেবদূতের আবির্ভাবে সংশয়ের শেষ রেশটুকুও কেটে যাবে।

যেই শোনা গেল সুপরিচিত শব্দ দেওয়ালের ওধারে তখনি সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে সোরাদাচিকেও ঘাড় ধরে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে দিলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম—দেবদূত! দেবদূতের আবির্ভাব হবে—স্পষ্ট শুনতে পেলাম শেষ ইটটি সরানো হোলো—বালবিও নেমে গেলো।

—সারাদিন প্রার্থনা করো, চুপ করে শুয়ে থাকো দেওয়ালের দিকে মুখ করে। আর মৌনব্রত নাও, তাহলেই হবে। না, কারো সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ করতে পাবে না। আজ সারা দিন এই ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করো। বিনা প্রতিবাদে মেনে নিলো সোরাদাচি।

ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঢুকলো লরেন্স।

জানি না, ভীতিতে কি বিশ্বাসেতে সোরাদাচি আমার হুকুম বর্ণে বর্ণে তামিল করেছিলো। যতক্ষণ লরেন্স ঘরে ছিলো, ততক্ষণ

দেয়ালের দিকে ফিরে মুখ ঢেকে নিঃশব্দে পড়েছিলো। সৌভাগ্য ওরও, শুধু আমার নয়—কারণ একটু এদিক-ওদিক হলে যে ওকে কী করতাম তা আমিই জানি। লরেন্স চলে গেলে ওকে বললাম, "আজ দুপুরেই দেবদূতের আবার আবির্ভাব হবে—তাঁর সঙ্গে কাঁচি থাকবে তাই দিয়ে তুমি আমাদের দু'জনের দাড়ি ভালো করে কামিয়ে দেবে।" আমি আগেই জেনে নিয়েছিলাম সোরাদাচি জাতে নাপিত।

—"দেবদূতেরও দাড়ি থাকে নাকি?"

—"নিশ্চয়। তুমি আমাদের কামিয়ে দিলে আমরা এই প্রাসাদের ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবো। সোজা গিয়ে নামবো সেন্টমার্ক স্কোয়ারে—সেখান থেকে জার্মাণী চলে যাবো—"

সোরাদাচি চুপচাপ শুনলে—কোনো কথাই কইলে না। খেতে বসেও নিঃশব্দে খেয়ে নিলে। আমার মন তখন এত উত্তেজিত, সদ্যমুক্তির আশায় এত বিভোর যে খাওয়া তো দূরে, দুটি রাত দুই চোখের পাতা অবধি এক করিনি।

ঠিক সময়টিতেই দেবদূতের আবির্ভাব হলো। দেওয়ালের গর্তটির মুখে যেই ফাদার বালবিকে দেখা গেল সেই মুহূর্তেই সোরাদাচি তাঁকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত জানালো। বালবি নেমে পড়ে দুই হাতে আমায় জড়িয়ে ধরলেন।

—"আপনার কাজ এবার শেষ হোলো ফাদার বালবি। এখন সুরু হবে আমার কাজ—"

বালবি আমাকে একজোড়া কাঁচি আর আমার সেই বিখ্যাত হাতিয়ার লোহার রডটি ফিরিয়ে দিলেন। আমার কথা মত সোরাদাচি আমাদের দু'জনকেই বেশ সুন্দরভাবে চেঁছে-ছুলে দিলে।

আমি বালবিকে বললাম, সোরাদাচির কাছে অপেক্ষা করতে ইতিমধ্যে আমি একবার সমস্ত জায়গাটা পরীক্ষা করে আসবো। দেওয়ালের গর্তটা একটু ছোটো হোলেও কোনো মতে দেহটাকে গলিয়ে নিয়ে সোজা নামলাম বালবির ঘরে। সেখানে ওঁর সহবন্দী কাউণ্ট এ্যাসকুইনি শুয়ে আছেন দেখলাম। সুপুরুষ, বৃদ্ধ ভদ্রলোক। আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এরপর আমার মতলবটা কি? আমি বুঝিয়ে বললাম, কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হলেন না ওঁর মতে আমি শুধু উত্তেজনার বশে খামখেয়ালে এত বড় বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছি। উনি রাজী নন আমার সঙ্গে পালাতে। তবে আমার মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবেন ঠিকই। ওঁর ধারণা ছাদ ফুঁড়ে বেরিয়ে দু'খানা ডানা না গজালে মাটিতে নামা সম্ভব হতে পারে না—আমার ব্যাখ্যা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।

ফিরে এলাম আমার সেলে। তারপর পুরো চারটি ঘণ্টা ধরে যত কম্বল, চাদর ওয়াড়, বিছানাঢাকা, টেবিলক্লথ ছিলো সব সরু সরু লম্বা ফালির মত করে কাটলাম। তারপর কোর্ট, সার্ট, মোজা এগুলো একটা ছোটো প্যাকেটের মত করে বেঁধে নিলাম। এসব কাজ করে সেই গর্তটা দিয়ে তিন জনে আবার এসে কাউণ্ট এ্যাসকুইনির সেলে নামলাম! সেখানে ঘণ্টা দুই ধরে ছাদেতে আর একটা বড় গর্ত করলাম—কিন্তু সেই গর্তের ভিতর দিয়ে দেখি, বাইরে জ্যোৎস্নায় আলোর বান ডাকছে—এমন রাতে সেণ্ট মার্কস্ স্কোয়ারে দলে দলে সবাই বেড়ায়—অতএব এই সময় 'লেডস্'-এর ছাতে দুটো ছায়ামূর্তি সবার মনেই সন্দেহ জাগাবে। অপেক্ষা করতে হোলো।

কাউণ্ট এ্যাসকুইনির কাছে ত্রিশ সেকুইন (ইতালীয় মুদ্রা) ধার চাইলাম—জার্মাণীতে নিরাপদে পৌছাবামাত্রই ফেরৎ পাঠাবো, এমন

প্রতিশ্রুতিও দিলাম। কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই রাজী নয়—আমিও ছাড়বার পাত্র নই। শেষে অনেক চোখের জলে মাত্র দুটি সেকুইন দিতে রাজী হলেন—তাই-ই সই।

ফাদার বালবির চরিত্রটির পরিচয় এইবার পেতে সুরু করলাম। ইতিমধ্যে প্রায় বার দশেক আমাকে শোনালেন যে, আমার কথার ঠিক নেই। আমি যে সব প্ল্যান ঠিক করে রেখেছি বলেছিলাম সেকথা সম্পূর্ণ মিথ্যা—আমি শুধু ভাঁওতা দিয়েছি। আগে জানলে উনি আমার সঙ্গে যোগ দিতে রাজী হতেন না। ওঁর সঙ্গে কাউণ্ট যোগ দিলেন—অযাচিত উপদেশ আমার এই অদূরদর্শিতায়—ব্যাপার দেখে সোরাদাচি এতক্ষণ মুখ খোলবার সাহস পেল। হাউ হাউ করে কেঁদে আমার পায়ে ধরে ভিক্ষা চাইলে ওকে মুক্তি দেবার জন্যে। ছাদের কার্ণিশ বেয়ে ঐ পিছল পথে ওর যাওয়া একেবারেই অসম্ভব—নীচের খালের জলে পড়ে ওর মৃত্যুও নাকি অবধারিত—আমি যেন দয়া করে ওকে সঙ্গে না নিই। নির্বোধটা বুঝতেও পারল না ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমিও কত নিশ্চিন্ত কত খুশী হোয়েছি। কাউণ্টের কাছ থেকে কালি কলম আর কাগজ নিয়ে একটা চিঠি লিখে সোরাদাচিকে দিলাম সেক্রেটারীকে দেবার জন্যে—চিঠিটা অনেকটা এই রকম ছিলো।—

'আমাদের মালিক রাজ্যের বিচার বিভাগীয় অধিকর্তারা একজন দোষীকে কারারুদ্ধ করবার জন্য তাঁদের সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করেন। কিন্তু সেই বন্দীকে যদি সাময়িক মুক্তিও না দেওয়া হয়, সেও তার সমস্ত ক্ষমতাই নিয়োগ করে মুক্ত হতে। তাঁদের অধিকার নীতিতে—তার অধিকার প্রকৃতিতে। তাঁরা বন্দী করার সময় তার সম্মতি চাননি,—তারও মুক্তি নেবার সময় তাঁদের সম্মতির প্রয়োজন নেই।

জ্যাক্‌স্‌ ক্যাসানোভা, যে এই চিঠিটা লিখছে, হৃদয়ের সমস্ত তিক্ততা দিয়ে, সে জানে তার আবার হয়ত বন্দী হবার সম্ভাবনা আছে—সে ক্ষেত্রে সে বিচারকদের মনুষ্যত্বের কাছে এই আবেদন জানাচ্ছে যে, তখন যেন তার ভাগ্যে এর চেয়ে বেশী দুরবস্থা না ঘটানো হয়। তার সেলের ভিতরে যাবতীয় জিনিসপত্র সোরাদাচিকে দিয়ে যাচ্ছে—শুধু বইগুলি কাউণ্ট এ্যাসকুইনিকে।'

মধ্যরাত্রির এক ঘণ্টা আগে বিনা প্রদীপে কাউণ্ট এ্যাসকুইনির সেলে লিখিত—৩১শে অক্টোবর ১৭৫৬।

চাঁদ ঢলে পড়েছে—আর সেই বানডাকা জ্যোৎস্নার রাশি নেই। যাত্রার সময় হোলো। অর্ধেকটা দড়ি বালবির একটা কাঁধে আর ওঁর প্যাকেটটাতে বাঁধা হোলো। আমার নিজেরও তাই। তারপর মাথায় টুপী এঁটে দু'জনাই সেই ক্ষুদ্র ছিদ্রপথে বেরিয়ে পড়লাম।

* * * *

আমি প্রথম, আমার পিছনে বালবি। আমি হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে লাগলাম, হাতের রডটা দিয়ে সীসের পাতের খাঁজে খাঁজে ভর দিয়ে বালবিকে টানতে টানতে। তিনি ডান হাতে আমার কোমর বন্ধনীটা সজোরে চেপে ছিলেন। আমার নিজের বোঝা, তার উপর লাগাম-পরানো ঘোড়ার মত ওঁকে টানছি ঘন কুয়াশায় পিচ্ছিল সীসের পাতের কানিশ দিয়ে—সে যা অবস্থা! হঠাৎ বালবি আমাকে থামতে বললেন হ্যাঁচকা টান মেরে। ওঁর প্যাকেট থেকে কি একটা পড়ে গেছে খোঁজবার জন্যে। ইচ্ছা হোলো এক লাথিতে খালের জলে ফেলে দিই লোকটাকে—কোনো মতে নিজেকে সামলে নিলাম। বললাম, দড়িগুলো ঠিক থাকলেই হোলো, এখন হারানোর

জন্য দুঃখ করে লাভ নেই—থামলেই মৃত্যু। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার এগোতে সুরু করলেন। খানিকটা গিয়ে ছাদের চূড়ায় উঁচু ঢিপির মত দেখে দু'জনে পাশাপাশি বসলাম—মাত্র দু'শো ফিট দূরে দেখা যাচ্ছে 'দোজ'-এর প্রাসাদচূড়া। পৃথিবীর কোনো সম্রাট বোধ হয় এর চেয়ে সুন্দরতর প্রাসাদের কল্পনা করতে পারে না। এখানে আবার বালবি বেচারার টুপীটা গেল হাওয়ায় উড়ে। বেচারা আরও মুষড়ে পড়লো। ছাদের ঐ জায়গাটাতেই বালবিকে বসিয়ে রেখে আমি খুঁজতে গেলাম, যদি নামবার কোন পথ পাওয়া যায়। সিঁড়ির দরজা, জানালা কিম্বা স্কাইলাইট যাতে আমি দড়ির এক প্রান্ত বেঁধে অপর প্রান্ত ধরে নামবার চেষ্টা করতে পারি। চার্চ পেরিয়ে নামবার জন্য চার্চের ছাদের দিকে নজরে পড়লো···কিন্তু সেটা এত খাড়াই যে ওখানে নামতে হ'লে সলিলসমাধি অবশ্যম্ভাবী। জায়গাটা দেখে অনেকটা এগিয়ে এসেছি ছাদ বেয়ে বেয়ে—এটা সম্ভবতঃ 'দোজে'র প্রাসাদেরই অংশ। হয়ত ভোরের আলোয় কোনো দরজা চোখে পড়তে পারে। কারণ, আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম যে, যদি প্রাসাদের কোনো ভৃত্যের নজরেও পড়ি সে তৎক্ষণাৎ আমাকে পালিয়ে যাবার সুযোগই করে দেবে—যত বড় দাগী আসামীই হইনা কেন, বিচারকের হাতে তুলে দেবে না—বিচার-বিভাগ সবার কাছেই এমন উৎকট ভীতিপ্রদ আর ঘৃণ্য ছিলো। প্রাসাদের সবচেয়ে উঁচু ছাদের নীচেই একটা জানালা হঠাৎ চোখে পড়লো মরিয়া হয়ে ছাদের উপর থেকে বুকে হেঁটে ঘষে ঘষে ধীরে ধীরে নামতে চেষ্টা করলাম। শেষে কাছাকাছি পৌঁছে ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, ছোটো ছোটো কাঁচ দিয়ে তৈরী জাফরীকাটা জানলা—তার ওপরে ঘরের মত মনে হোলো। কাঁচগুলো সহজেই সরানো যেত কিন্তু আমার তখনকার মনের অবস্থা

এমন যে মনে হোলো এটাই সবচেয়ে বড় বাধা। নিরাশায় মন ভরে গেল—দীর্ঘ সময়ের উত্তেজনা, পরিশ্রম, ক্লান্তি, অনাহার আর তীব্র মানসিক উদ্বেগ আমার মনের সহজ ভাবটুকু সম্পূর্ণ গ্রাস করছিলো। অতি সামান্য সহজ-সাধ্য কাজও আমাকে ভয়-নিরাশায় ভরে তুললো। এমন সময় সেণ্ট মার্কের ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি বারোটা বাজলো—মধ্যরাত্রির সূচনা। ঐ ঘড়ির শব্দ হঠাৎ কেন জানি না আমার মনে আশা আর নির্ভয় আশ্বাসের চেতনা জাগিয়ে দিলো। কি এক শক্তিতে ফিরে পেলাম বিশ্বাস, আর দৃঢ়তা। নতুন উদ্যমে হাতের রডটা দিয়ে একটা কাঁচ ভেঙে ফেললাম। তারপর পনেরো মিনিট ধরে কঠিন পরিশ্রমের সঙ্গে একে একে জাফরীর সব কয়টা কাঁচই ভেঙে ফেললাম—উত্তেজনায় খেয়ালই ছিল না যে বাঁ হাতটা কখন কেটে গিয়ে রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

ফিরে এলাম আমার সঙ্গী ফাদার বালবির কাছে। হায় রে কপাল! 'যার জন্যে করে মরি সেই বলে চোর'—আমাকে দেখিয়ে বালবি কুৎসিততম ভাষায় আমাকে গালাগাল দিতে সুরু করলেন, এতক্ষণ একলা বসিয়ে রাখার জন্যে। ঠিক করেছিলেন যে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আবার কারাগৃহে ফিরে যাবেন। আর ভেবেছিলেন যে আমি খালের জলেই ডুবে মরেছি।

"তাই বুঝি আমাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে ঐ ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করলেন? এখন চলুন এতক্ষণ কি করেছি দেখাবো।"

দু'জনে মিলে ফিরে এলাম সেই ছাদের উপর জাফরীকাটা জানালার ধারে। একজনের পক্ষে খুবই সহজ, অন্য জন দড়িটা না হয় ধরবে—কিন্তু সে নিজে নামবে কি করে? এটা কিছুতেই ঠিক করতে পারছিলাম না। বালবি বলে উঠলেন,—"আমাকে আগে

নামিয়ে দিন তো। তারপর আপনি কেমন করে নামবেন সে কথা চিন্তা করবার যথেষ্ট সময় পাবেন।"

স্বার্থপর ঘৃণ্য পশুটার কথায় মনে হোলো, দিই লোহার রডটা ওর বুকে বিঁধে। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে তার বদলে ওরই কাঁধে দড়ি বেঁধে ওকে নামিয়ে দিলাম। দড়িটা টেনে তুলে মেপে মেপে দেখলাম প্রায় পঞ্চাশ ফিট নীচে ঘরের মেঝে। এখন আমি কি করে নামবো? জাফরীর পাতলা ফ্রেমে দড়ি বাঁধলেও অত ভর সইবে না, ভেঙে পড়বে। ছাদের সীসার টালির উপর ইতস্ততঃ ঘুরতে লাগলাম, মনে মনে একটা উপায় খুঁজতে খুঁজতে। ঘুরতে ঘুরতে অপর প্রান্তে গিয়ে দেখি, এক কোণে একটা বড় টবভর্তি চুণ, বালি, জল গোলা রয়েছে, পাশে খুরপি আর একটা মস্ত লম্বা মই পড়ে রয়েছে। মইটা দেখেই উল্লসিত! দড়ি দিয়ে একদিকের প্রথম ধাপটা বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এলাম সেটা জানালার কাছে। জানলা দিয়ে গলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম প্রাণপণে কিন্তু একটু গিয়েই সেটা আটকে গেল। তখন আমি বেশ করে দড়িটা দিয়ে মইটা জোর করে বাঁধলাম, তারপর সেটা জল বেরোবার নালীর পাইপের উপর ঝুলতে লাগলো। কারণ মাত্র একটুখানি জানালার ভিতর ঢুকেছে, বেশীর ভাগ ভারটা বাইরের দিকে—কোনোরকমে উপুড় হোয়ে শুয়ে বুক ঘষে ঘষে জলের মার্বেল পাথরের পাইপটা ধরলাম, তারপর সেটা ধরে পিছলে পিছলে খানিকটা নেমে এসে মইটার শেষ দিকটা ধরতে পারলাম। শেষটা ধরে ঠেললে খানিকটা জোর হয়। প্রাণপণে ঠেলে আরও একটু ঢুকে গেল মইটা। তখন আর বাইরে ঝুলতে লাগলো না। বেশীর ভাগ ভারটাই ভেতরের দিকে ঝুঁকে গেল। কিন্তু ঐ জোরে ঠেলার দরুণ আমি পিছলে গেলাম—ঢালু সীসের পাতের উপর দিয়ে

গড়াতে গড়াতে…দুটো হাঁটু আর হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে সামলাবার চেষ্টা করতে লাগলাম…নিশ্চিন্ত মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছি জেনেও মনের উপস্থিত বুদ্ধি হারাইনি। সমস্ত শক্তি দিয়ে মরিয়ার মত চেষ্টা করতে করতে সামলে নিলাম নিজেকে। উঠে এসে জলের পাইপটার পাশাপাশি চিৎ হোয়ে শুয়ে হাপরের মত নিঃশ্বাস নিতে লাগলাম অমানুষিক পরিশ্রমের ক্লান্তিতে। সমস্ত হাত-পায়ে খিল ধরে আসছিলো। শরীরটাকে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ পড়ে রইলাম উপায় নেই…কি নিদারুণ দুঃসহ মুহূর্ত! ক্রমে ক্রমে হাত-পায়ের সাড় ফিরে এলো। সহজ হোলো নিঃশ্বাস। উঠে পড়ে মইটার বাকীটুকুও ঠেলে দিলাম—তারপর রডটার সাহায্যে সীসার পাতের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে জানলাটার কাছে গেলাম। মইটা ভিতরে লম্বালম্বি হোয়ে আটকে ছিলো—এবার সহজেই সেটাকে নীচে নামাতে পারলাম—নীচে বালবি সেটা ধরে ফেললেন। আমি ওপর থেকে জামা-কাপড়ের প্যাকেট, দড়ির বাণ্ডিল, সব নীচে ছুঁড়ে দিয়ে নিজে নেমে পড়লাম। তারপর মইটাও নীচে নামিয়ে নিলাম। কারণ, উপরে আমাদের পালানোর কোনো চিহ্নই লরেন্সের সন্ধানী দৃষ্টির সামনে রাখতে চাইনি। নীচে অন্ধকার ঘরটায় আমরা দু'জন হাত ধরাধরি করে ঘরের অবস্থানটা ঠিক করে নিতে লাগলাম। দরজার কাছে গিয়ে দেখি, লোহার খিল লাগানো কিন্তু তালাবন্ধ নয়। খুলে বেরিয়ে পড়লাম। দেখি আর একটা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছি, মাঝখানে মস্ত টেবিল চার ধারে চেয়ার সাজানো। ঘরের একটা জানলা খুলে বাইরেটা দেখলাম—নিকষ কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। অগত্যা নূতন কোনো প্রচেষ্টার আশা ছেড়ে দড়ির বাণ্ডিলটা মাথায় দিয়ে ঘরের মেঝেতে শুয়ে পড়লাম লম্বা

হোয়ে—সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম এলো দুটি চোখে, তখন আর কোনো চিন্তার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। পরে মুক্তি জুটবে না মরতে হবে সব চিন্তাই তখন সমান।

বোধ হয় পুরো সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলাম। ফাদার বালবি চেঁচিয়ে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে আমার ঘুম ভাঙালেন। পাঁচটা বাজে—এখন এই অবস্থায় আমার চোখে ঘুম আসে কি করে? উনি তো ভাবতেও পারছেন না। কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিলো—এই বিশ্রামের পর আবার আমার স্নায়ুগুলো সচল হোলো।

—"এটা তো জেলখানা নয়। এখানে নিশ্চয়ই কোনো বেরোবার পথ পাবো।"

দু'জনে দরজা খুলে বেরিয়ে পড়লাম। একটা গ্যালারি পেরিয়ে ছোট্টো পাথরের সিঁড়ি। নেমে এসে আর একটা গ্যালারি, আরও একটা সিঁড়ি পেরিয়ে মস্ত একটা হলে এসে পৌছলাম। কিন্তু এর দরজা কিছুতেই খোলা সম্ভব হোলো না। মুক্তির মুখে এসে তখন আমার মরিয়া অবস্থা। ঠিক করলাম লোহার রডটা দিয়ে ওপরের খোপটাতে একটা গর্ত করবো। তার ভিতর দিয়ে গলে বেরোবো। তখনি সুরু করলাম গর্ত করা। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় বেশ বড় গর্ত করা গেল। কিন্তু এমন বিশ্রী রকম গর্ত হোলো যে গলে যাওয়া বিপদ্‌জনক। চারিদিকে বর্শার মত খোঁচা-খোঁচা অসমান ভাঙ্গা গর্ত তার উপর মেঝে থেকে পাঁচ ফুট উঁচুতে। বালবিকে প্রথমে উরুতে ধরে পরে গোড়ালী ধরে কোনমতে পার করলাম। কিন্তু আমার ভরসা তো আমিই। কোনো মতে মাথা আর কাঁধটা গলিয়ে বালবিকে বললাম টানতে—যদি খোঁচা লেগে দেহটা টুকরো হোয়ে যায় তাহলেও যেন থামে না। এইভাবে অবশেষে নামলাম—সর্বাঙ্গে

যন্ত্রণা নিয়ে আর পিঠ থেকে উরু থেকে দরদর ধারায় রক্তের স্রোত বইয়ে।

এবার দৌড়ে গিয়ে আর একটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে একেবারে প্রাসাদের প্রধান সোপানের দরজার সামনে উপস্থিত হলাম। কিন্তু সেই বিরাট দরজা ভেদ করা আমার লোহার রডটির সাধ্য ছিল না। কিন্তু তার জন্য অস্থির বা চঞ্চল না হোয়ে শান্ত ভাবে বসে পড়লাম দরজার সামনে। বালবিকে বললাম আমার যতদূর সাধ্য করেছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা। আজ প্রাসাদের ঝাড়ুদারও আসবে কিনা সন্দেহ। কারণ আজ তো ছুটির দিন। যদিই কেউ এসে দরজা খোলে তখনি ছুটে পালাবার চেষ্টা করবো, অন্যথায় মরে গেলেও এখান থেকে নড়ছি না।

বালবি তো রেগেই আগুন! আমাকে উন্মাদ, মিথ্যাবাদী ইত্যাদি যথেচ্ছ গালাগাল দিতে সুরু করলেন। বালবিকে চাষার মত দেখতে হলে কি হবে—বেশভূষা ওঁর ঠিকই ছিলো, কোনো পরিশ্রম তো করতে হয়নি। আর আমার অবস্থা তো দেখলে লোকের ভয় হবে—সর্বাঙ্গে রক্তমাখা, সারাগায়ের চামড়া ছড়ে ছাল উঠে গেছে। সমস্ত জামাকাপড় টুকরো টুকরো হোয়ে ফালির মত ঝুলছে, মোজাটা, ওয়েষ্টকোট, শার্টগুলো শতছিন্ন অবস্থায়, আর বোঝবার মতোও নেই। উরুর গভীর ক্ষত থেকে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে।

আমি রুমাল দিয়ে যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধলাম, উপরি উপরি গোটা দুয়েক শার্ট প্যাকেট থেকে বের করে পরে ফেলে সবার উপরে লেশ দেওয়া শার্টটা পরলাম। নতুন একজোড়া মোজা পরে যতগুলো রুমাল ইত্যাদি পকেটে ভরা সম্ভব ভরে নিয়ে বাকীগুলো এক কোণে ফেলে দিলাম। হাত দিয়ে চুলগুলোকে

যথাসম্ভব বিন্যস্ত করার চেষ্টা করতে করতে একটা জানালার কাছে দাঁড়িয়ে পাল্লা দুটো খুলে দিলাম। খুলতেই নীচের উঠানে যারা ছিলো তাদের দু'একজনের চোখ পড়লো আমার দিকে।…পড়াটা অবশ্য বিচিত্র নয়। সে তখনি প্রাসাদরক্ষককে খবর দিতে ছুটলো। ভালমানুষ বৃদ্ধটি হয়ত ভাবলেন, ভুল করে আগের রাত্রে কাউকে চাবিবন্ধ করে ফেলেছেন—তাড়াতাড়ি চাবির গোছা নিয়ে হাজির হোলেন। আমি ওদের ঝনঝনানি শুনতে পাচ্ছিলাম—সিঁড়ির ধাপে ধাপে এগিয়ে আসছে। আমি বালবিকে আমার পাশ ঘেঁষে দাঁড়াতে বললাম—লোহার রড হাতে নিয়ে দরজার পাশে অপেক্ষা করতে লাগলাম—ওরা দরজা খুললেই পালাবো আর যদি বাধা দেয় তবে এই লোহার রড…

বৃদ্ধ বেচারা আমার চেহারা দেখে বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইলো।…আমি দৃক্‌পাতও না করে অসম্ভব দ্রুতগতিতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলাম—ঠিক পিছনে বালবি। কিন্তু গতি দ্রুত করলেও পালাচ্ছি যে সে রকম ভাব ফুটতে দিইনি চলার ভঙ্গীতে। সোজা প্রাসাদের প্রধান ফটক পেরিয়ে সামনের ছোট্টো পার্ক পেরিয়ে জলের কিনারায় রাস্তার উপর গিয়ে দাড়ালাম। সামনেই যে গণ্ডোলাটা পেলাম তাইতেই চড়ে বসে বললাম "আমি খুব শীগগির ফুসিনা পৌঁছাতে চাই আর একজন মাঝি বরং ডেকে নাও"—

বলা বাহুল্য, আমার সঙ্গে সেই মুহূর্তে বালবিও উঠে পড়েছিলো গণ্ডোলাতে। গণ্ডোলাটা একটু এগোলে আমি মাঝিকে ডেকে বললাম যে—"আমি মত বদলেছি, আমি মেস্‌ত্রার যেতে চাই"—

—"ভাড়া ঠিকমত পেলে আপনাদের ইংলণ্ডেও পৌছে দিতে পারি হুজুর!" মাঝিটা হেসে বললে।

খালটাকে এত অপরূপ সুন্দর আগে কখনও মনে হয়নি—বিশেষ করে এত নির্জন যে আর একটা নৌকাও দেখা যাচ্ছে না…কি নিশ্চিন্ত তৃপ্তি ! ভোরের নরম আলোয় আর মিষ্টি বাতাসে দেহ মন জুড়িয়ে গেল। মাঝি দুটিও খুব দ্রুত বাইছিলো। সেই অন্ধকারময় কারাগৃহের নরককুণ্ড থেকে আবার উদার আকাশের তলায় মুক্তি পেয়ে ঈশ্বরের করুণায় মুগ্ধ হোয়ে আমার দুই চোখ জলে ভরে এলো…আবেগে উত্তেজনায় আমি সত্যিই কেঁদে ফেললাম। এতক্ষণে আমার সঙ্গীর, আমার কর্তব্যপরায়ণ বন্ধুর কর্তব্যবোধ ফিরে এলো—তিনি এসে আমি কাঁদছি ভেবে কর্তব্যবোধে সান্ত্বনা দিতে সুরু করলেন। এই মূঢ়তায় হাসা ছাড়া আর উপায় রইলো না।

সপ্তম অধ্যায়

দীর্ঘ পথের যাত্রায় বিচিত্র, তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর অবশেষে ১৭৫৭ সালের ৫ই জানুআরী প্যারিসে পৌছলাম। পুরানো বন্ধুরা সাদরে আমাকে কাছে টেনে নিলে। প্যারিস—গৌরবময়ী প্যারিস যেন আমার পালিকা মা—অপরিচয়ের সঙ্কোচ আর আতঙ্ক কিছুই নেই এখানে। আর আমার জন্মভূমি ভেনিস? সেখানে যাবার পথ তো এখনকার মত নিজের হাতেই বন্ধ করে এসেছি।

মনে মনে ঠিক করলাম—আচার-ব্যবহারে সংযম আর দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনবো—আবার আমাকে ফিরে পেতে হবে যশ, মান, সম্ভ্রম আর প্রতিপত্তি···পিতৃসম বন্ধু, অভিভাবক মঁ্যসিয়ে ব্রাগাদাঁ মাসিক হাজার ক্রাউন বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন আমার জন্য—তাই স্বচ্ছলতার মধ্যেই দিন কাটছিলো এখন শুধু ধৈর্য ধরে আরও উন্নতির চেষ্টা করতে হবে······

আমার প্রথম কর্তব্য ঠিক করেছিলাম ভেনিসের রাজদূতের সঙ্গে দেখা করা। কারণ, এখানে রাজসভায় তাঁর অসীম প্রতিপত্তির কথা আমি জানতাম। আর তাঁকে যতদূর চিনি, তাইতে তাঁর অনুগ্রহ পাবো বলেই ভরসা করি।

আমার পালিয়ে আসার গল্প আমি প্রতিটি সালোঁতে করতাম। একদিন একটা চিঠি লিখে নিজেই সেটা সঙ্গে করে প্যালেস ব্যুরবঁতে গিয়ে দিয়ে এলাম। পরদিন বেলা আটটার সময় একটা চিঠি পেলাম—সেই দিনই আমাকে ওখানে উপস্থিত হতে বলা হোয়েছে তাইতে।

ভাবলাম, প্রথমেই আমাকে যে করেই হোক আঁচ করে নিতে হবে দ্যুভার্ণি আর উনি কি ভেবে রেখেছেন, যদি নেহাৎই না পারি তবে এমন রহস্যপূর্ণ হাসি মুখে টেনে নিঃশব্দে বসে থাকবো যাতে মনে হবে এ সবই তো আমার জানা ব্যাপার।

যথাসময়ে ম্যঁসিয়ে দ্যুভার্ণির বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গেলাম। আরও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন—আর কথাবার্তা যতদূর সম্ভব একঘেয়ে ক্লান্তিকর হোয়ে উঠেছিলো। খাওয়ার পর ম্যঁসিয়ে দ্যুভার্ণি অন্যান্য অভ্যাগতের কাছ থেকে কিছুক্ষণের অবসর প্রার্থনা করে আমাকে আর ম্যঁসিয়ে ব্যুলোনকে অন্য একটা ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। সেখানে আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় করালেন। তারপর উঠে গিয়ে একটা বই হাতে করে নিয়ে প্রথম পাতাটি খুলে একটু হেসে আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন—"ম্যঁসিয়ে ক্যাসানোভা, এই দেখুন আপনার প্ল্যানটি"

প্রথম পাতাটিতে দেখলাম লেখা আছে—নব্বইটি টিকিটের লটারী মাসে একবার করে টিকিট বিক্রী হবে—আর প্রত্যেকটি বারে পাঁচখানার বেশী টিকিট উঠবে না।—"স্বীকার করছি মহাশয়, আমি ঠিক এই জিনিসই ভেবেছিলাম"—

সেদিন বাকী রাতটা কাটলো, কি ভাবে লটারির সব ব্যবস্থাপনা করা যেতে পারে। আর নেহাৎ অহঙ্কার করে বলছি না আমি যে সব সংশোধনী অথবা নতুন কোনো পদ্ধতির প্রস্তাব আনলাম প্রত্যেকটিই সকলের মতে রীতিমত মূল্যবান বলে গৃহীত হোলো—সবার মনেই আমার সম্বন্ধে অন্ততঃ আমার কার্যকরী ক্ষমতা সম্বন্ধে বেশ একটা উঁচু ধারণাই গড়ে উঠেছিলো। তার বিশদ বিবরণ না দিলেও শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট যে, হিসাবপত্র আর গণনার যথার্থ

নির্ভুলভাবে বিচার করার জন্য একজন নামকরা বিশেষজ্ঞ ডাকা হোলো। আর তিনি এসে আমার প্রত্যেকটি প্রস্তাব এবং হিসাব নির্ভুল বলে স্বীকার করলেন।

ম্যঁসিয়ে দ্য বার্ণাস আমার সঙ্গে মাদাম দ্য পম্পাদুর-এর পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদাম ঠিক চিনতে পারলেন, আমাকে পাঁচ বছর আগে দেখেছিলেন—তবে তফাৎ এই যে, আমার মুখে ফরাসী ভাষা শুনে তখন তাঁর ভারী মজা লাগতো, কিন্তু এখন আমার নির্ভুল পরিষ্কার উচ্চারণে উনি আশ্চয! যাই হোক, লটারীতে মাদাম পম্পাদুর প্রবল উৎসাহ দেখালেন। লটারীর প্ল্যানটা হোলো—প্রতি মাসে পাঁচটি করে জিতবার সংখ্যা থাকবে অর্থাৎ পাঁচখানা টিকিট জিতবে—আর যদি ছয়টা হয় তাহলে আরও ভালো—ছয়ের সংখ্যাটা রাষ্ট্রের হোয়ে যাবে। অতএব রাজা প্রতি মাসে একশো হাজার ক্রাউন লাভ করতে পারবেন।

লটারীর ছয়টি অফিসের ভার আমার উপর দেওয়া হোলো। আর লটারীর লাভ থেকে বছরে চার হাজার ফ্রাঙ্ক আমার আয় নির্দিষ্ট করা হোলো। প্রধান অফিস রুমঁতসার্তার এ খোলা হোয়েছিলো, তার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর আমার চেয়ে অনেক বেশী আয় নির্দিষ্ট করা হোলো। কিন্তু তার জন্য আমি একটুও হিংসা করিনি। কারণ, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গেই দ্যুভার্ণি তাঁব বাড়িতে আমার পরিচয় দেন আর আমি জানতাম, আসলে এই সমস্ত লটারীর প্ল্যানটা তাঁরই মস্তিষ্ক-প্রসূত।

এইবার আমার বুদ্ধির খেলা সুরু হোলো। আমি আমার পাঁচটা অফিসই বছরে দু'হাজার ফ্রাঙ্কে ভাড়া দিয়ে দিলাম। আর রু সেণ্ট দেনিসের অফিসটি যথাসম্ভব সৌখীন মূল্যবান আর সুন্দর জিনিসে

সাজালাম। একজন কর্মচারীও রাখলাম—সুন্দর প্রাণবন্ত, বুদ্ধিদীপ্ত একটি ইতালীয় যুবক।

জনসাধারণকে আমার অফিসের দিকেই আকর্ষণ করবার জন্যে আমি ছাপানো কাগজ বিলি করতে লাগলাম। তাতে লেখা ছিলো আমার সই-করা টিকিট যদি জেতে তাহলে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই জেতার টাকা পাওয়া যাবে। সহজেই আমার অফিসের ভিড় বাড়তেই লাগলো। প্রথম বারেই আমার অফিস থেকে চল্লিশ হাজার ফ্রাঙ্কএর টিকিট বিক্রী হোলো, তার থেকে জিতবার পুরস্কার-স্বরূপ দিতে হোলো আঠার হাজার ফ্রাঙ্ক। ক্রমে ক্রমে আমার অফিসটা রীতিমত জনপ্রিয় হোয়ে উঠলো। আমার ইতালীয় কর্মচারীটিও ভাগ্য ফিরিয়ে নেবার সন্ধান পেলো।

এই সময় ভেনিসের একটি অভিজাত-বংশীয় যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয় হোয়েছিলো। ওর নাম কাউণ্ট দ্য তিরেত্তা।

একদিন তিরেত্তা আমাকে জানালে যে, পোপের একজন বিধবা ভ্রাতৃপুত্রবধূ মাদাম লাম্বার্তিনীর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে। নামটা শুনে কৌতূহল জাগলো, রাজী হোয়ে গেলাম। তিরেত্তার সঙ্গে গেলাম—কিন্তু কোথায়ই বা পোপ আর কোথায়ই বা তার আত্মীয়া! পরিচয় হোলো উগ্র বিলাসিনী উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির একটি মহিলার সঙ্গে আর তার বান্ধবীর সঙ্গে। আর সেই বান্ধবীটির অপরূপ সুন্দরী কিশোরী বোনঝির সঙ্গে। কিশোরীটির নাম মাদময়াসেল থেরেসা দ্য লা মিউর।

কিছুক্ষণ অর্থহীন আলাপের পর মাদাম লাম্বার্তিনী এক রকম তাসের জুয়া-খেলার প্রস্তাব করলেন। আমি রাজী হলাম না কিছুতেই—একটু এগিয়ে এসে মাদামের কিশোরী বোনঝিটিকে

আগুনের ধারে একটি বসবার জায়গায় বসতে অনুরোধ জানিয়ে তার পাশে বসে পড়লাম। ওঁদের জানালাম, তাস খেলার চেয়ে গল্প করে কাটানোই আমার ভালো লাগবে। মাদাম লাম্বার্তিনী হাসতে হাসতে বললেন,—"গল্প তো করবেন—কিন্তু কোন বিষয়ে কথা বলবেন? ও তো মোটে এক মাস হলো কনভেণ্ট থেকে বেরিয়েছে?"

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে, এমন মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করতে একটুও খারাপ লাগবে না। ওঁরা তাস খেলতে লাগলেন—আর আমি মেয়েটির সঙ্গে নানা চমকপ্রদ বিষয়ে আলাপ জমালাম। বলতে দ্বিধা নেই—ওর মনোরঞ্জনে একটুও বিলম্ব ঘটেনি আমার। সদ্য গণ্ডীর বাইরে মুক্তি পাওয়া কাঁচা মন—নানারকম সরস আলোচনায় ওর কৌতূহল আর আগ্রহ স্বাভাবিক।

যে সব প্রসঙ্গের আলোচনা ওর অপরিণত বয়সের কাছে অপরাধ বলে গণ্য করা হোতো, সেই সব প্রসঙ্গের আলোচনায় ওর কিশোর মনের লজ্জা আর আগ্রহের ছাপ ওর মুখে অপরূপ হোয়ে ফুটে উঠতে লাগলো। এক সময় ও উঠে গিয়ে ওর মাসীর চেয়ারের পিছনে গিয়ে দাঁড়ালো—কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওর মাসী হাতের তাসটায় হারলেন। বোনঝিকেই অপয়া ভেবে বললেন,—"দুষ্টু মেয়ে পালা এখান থেকে—তুই-ই নিশ্চয়ই অপয়া, তাই এবার হারলাম। আর তাছাড়া ঐ ভদ্রলোককে একা বসিয়ে রেখে চলে এলি যে! লোকে কি বলবে? একটুও শিক্ষা সভ্যতা জানে না?"

মেয়েটি হাসতে হাসতে ফিরে এলো আমার পাশে। তারপর ফিশ-ফিশ করে বললে,—"যদি আমার মাসী জানতেন যে আপনি আমার সঙ্গে কি সব বিষয়ে গল্প করছেন—তাহলে কিন্তু চলে যাবার জন্যে দোষ দিতেন না—"

—"সত্যিই ভারী অন্যায় হোয়েছে। এর জন্যে আমার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। আচ্ছা তাহলে আমি বরং চলে যাই—কিছু মনে করবে না তো?"

—"আপনি যদি চলে যান তাহলে মাসী ভাববেন আমি একটা আস্ত বোকা, তাই আপনি বিরক্ত হোয়ে চলে গেলেন—"

—"তাহলে তোমার ইচ্ছা যে আমি থাকি।"

—"আপনি যেতে পাবেন না—"

ফিরে এলাম। তবে সে রাত্রে বিদায় নেবার আগে জেনে গেলাম ওই লাবণ্যময়ী কিশোরীর হৃদয়ে গভীর প্রেমের রেখা এঁকে দিয়েছি—আর আমার অনুরাগের চিহ্ন রেখে গেলাম ওর দুটি প্রসারিত কর-পল্লবে অজস্র উষ্ণ চুম্বনে···

তিন চার দিন পর মাদময়াসেল ছ লা মিউর-এর কাছ থেকে আমার অফিসে একটি চিঠি এলো। চিঠিতে ও জানিয়েছে—"মোটামুটি এই কথা—" আমার মাসী ধনী কিন্তু অত্যন্ত খেয়ালী, বিলাসিনী আর দুর্নীতি-পরায়ণা। আমাকে পর্দানসীন করতে না পেরে শুধু ঘটকের মুখের প্রশংসায় মুগ্ধ হোয়ে ডানকার্কের এক ধনী ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বিবাহের ঠিক করেছেন। তাকে আমিও যত চিনি মাসীও ততই চেনেন। আপনাকে আজ আমি বলতে চাই যে যদি সেদিন রাত্রের আলাপ-আলোচনায় আমাকে ঘৃণা না করে থাকেন তবে আমি আপনার ধর্মপত্নী হোতে চাই। হ্যাঁ, আমার দেহ মন আমি আপনার হাতেই সমর্পণ করতে চাই—পঁচাত্তর হাজার ফ্রাঙ্ক সমেত—আমার মৃতা মায়ের যৌতুক। তাছাড়া মাসীর মৃত্যুর পরও অত টাকা আমিই পাবো।

চিঠিতে উত্তর দিবেন না। কার হাতে পড়বে জানি না। পাঁচ দিন পর মাদাম লাম্বার্তিনীর বাড়িতে এসে মুখেই জানাবেন। পাঁচটি দিন সময় রইলো আপনার ভাববার। যদি আমাকে আপনার উপযুক্ত মনে না করেন তবে একটি অনুরোধ রাখবেন—আমার কাছে আর আসবেন না···আমার সঙ্গে কোথাও দেখা হবার সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাবেন···তাইতে আমারও ভোলা সহজ হবে। আমার জীবনে একমাত্র সুখ শুধু আপনার পাশে···”

চিঠিখানি পড়ে ব্যথিত হলাম। চিঠির প্রতিটি লাইনে সততা সম্মান আর সরল মনের সহজ সত্য ফুটে উঠেছে···সত্যিই শ্রদ্ধা হোলো মেয়েটির উপর। কিন্তু ওই বিবাহের কথাতেই আমি পিছিয়ে এলাম। আমার মনে বিবাহের বা বিবাহিত জীবনের প্রতি কোনো রকম আসক্তি ছিল না, আমি স্পষ্টই দেখতে পেতাম যে বিবাহিত জীবনের মসৃণ স্বাচ্ছন্দ্য আমার জন্যে নয়। তাকে আমি শুধু দুঃখই দেবো · যে আমার কাছে করবে আত্ম নিবেদন।

চার দিন পর মাদাম লাম্বার্তিনীর বাড়িতে ওর সঙ্গে দেখা হোলো —সুন্দর সাজে অপরূপ সুন্দরী দেখাচ্ছিল। ওর মাসীর সামনেই আমি প্রস্তাব করলাম, ২৮শে মার্চ সকলকে দামিএন-এর ফাঁসী দেখবার জন্যে আমি নিয়ে যাবো। সমস্ত প্যারিস দেখবার জন্য উন্মুখ সেই নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড। আমি একটা খুব ভালো জানলা ভাড়া করে এলাম। যেখান থেকে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার দেখা যাবে। ফিরে এসে দ্য লা মিউর এর সঙ্গে নিভৃতে বসে গল্প করতে লাগলাম···আর আলাপের মধ্যে এক দুর্বল মুহূর্তে ভাসা-ভাসা ভাবে বিবাহে সম্মতিও জানিয়ে দিলাম।

ফাঁসীর দিন সবাইকে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলাম। জানলাটা বিশেষ বড় ছিল না—তাই প্রথম সারিতে মহিলারা আর তাঁদের

পিছনে আমি ও তিরেত্তা দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি যে, সেই অমানুষিক হত্যাকাণ্ড আমি দেখতে পারিনি—সারাক্ষণ মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলাম। দুই কান প্রাণপণে চেপে রাখা সত্ত্বেও সেই হতভাগ্যের মর্মস্পর্শী তীব্র করুণ আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিলাম। দোমিএন সম্বন্ধে সকলেই জানতো—লোকটা অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির আর ধর্মে অন্ধবিশ্বাসী ছিলো। রাজাকে হত্যা করে স্বর্গলাভের আশা করতে গিয়েই বেচারার এই ফল হোলো। অবশ্য রাজার গায়ে সামান্য একটু আঁচড় কাটা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি···কিন্তু শাস্তিটা হলো হত্যা করার শাস্তিরই সামিল। সীন নদীর ঢালু পাড়ের উপর দিয়ে গড়ানো চাকায় বেঁধে দেওয়া হোলো হতভাগার দেহটা। চাকায় সমস্ত শরীরটা পিষে গেল আর চার চারটে ঘোড়ার পায়ের আঘাতে সমস্ত দেহটা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হোয়ে টুকরো টুকরো করে ছিটকে পড়তে লাগলো। আশ্চর্য প্যারিসের মহিলারা! এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য তাঁদের এতটুকুও বিচলিত করলো না!

এই ঘটনার পরই মাদময়াসেল দ্য লা মিউর তার মাসীর সঙ্গে লা ভিলেৎএ বেড়াতে গেল আমাকেও একবার যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে। দিন তিনেক পর আমি দু'-একদিন কাটাবো বলে গেলাম। ডানকার্কের সেই ধনী ব্যবসায়ীটিরও আসার কথা ছিলো। কিন্তু আমি থাকা অবধি তিনি এসে পৌছলেন না। আমি তাঁকে দেখবার জন্য একবার গেলাম লা ভিলেৎএ। মাদময়াসেল দ্য লা মিউরকে ধনী অতিথির সম্মানে মূল্যবান উজ্জ্বল পোষাকে সুন্দর করে সাজতে দেখলাম—ডানকার্কের ব্যবসায়ীটিও দেখতে সুন্দর আকর্ষণীয়। তাঁকে আরও একদিন বেশী থাকবার জন্য অনুরোধ জানালেন মেয়েটির মাসী। দ্য লা মিউরও তাঁর সঙ্গে যোগ দিল।

পরে যখন মাসী বোনঝিকে একান্তে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"হবু স্বামীর সম্বন্ধে কি ঠিক করলি বল ?" বোনঝি তখন উত্তর দিলে, —"লক্ষ্মীটি মাসী, এখনকার মত আমাকে রেহাই দাও। কাল ঐ ভদ্রলোকের পাশে আমাকে বসিও আর কথা বলিও তাহলেই দেখতে পাবে আমার রূপ ওঁর সহ্য হোলেও আমার কথাবার্তা ওঁর অসহ্য হোয়ে উঠবে। যখন দেখবেন আমি একেবারে একটা নিরেট বোকা তখন হয়ত আমাকে বিয়ে করতে চাইবেন না"—

সে রাত্রে খাওয়ার পর কিছুক্ষণ তাস খেলে আমরা সবাই যে যার ঘরে শুতে গেলাম। মিনিট পনেরো পরেই আমার দরজা খুলে গেল—ঢুকলো এসে আমার কিশোরী প্রিয়া—কিন্তু প্রতিদিনকার মত শিথিল রাত্রিবাস ওর পরনে নেই, সান্ধ্য পোষাকে সুসজ্জিতা

—"বলো তুমি···এই বিয়েতে কি আমাকে রাজী হতে হবে ?"

—"ঐ ভদ্রলোকটিকে পছন্দ হয় তোমার ?"

—"অপছন্দ হয় না।"

—"তবে রাজী হও"।

—"বেশ—তবে বিদায়। এই মুহূর্ত থেকে প্রেমের মৃত্যু হোক, জেগে থাক শুধু বন্ধুত্বের প্রীতি"—

—"আজই রাত্রি থেকে কেন ? বন্ধুত্বের সুরু হোক কাল থেকে। আজ রাতে তুমি আমার প্রেয়সীই থাকো।"

—"না, তা' হয় না, মরে গেলেও তা' হোতে দেবো না। আমি যদি অন্যের স্ত্রী হই আমাকে তারই যোগ্য হোতে হবে। কে জানে ভবিষ্যতে হয়ত তার পাশে থেকেই সুখ পাবো। আমাকে ছেড়ে দাও —আমাকে আর ধরে রেখো না—যেতে দাও—তুমি তো জানো আমি তোমাকে ভালবাসি"—

—"তবে যাবার আগে একটি চুম্বন দিয়ে যাও"

—"না।"

—"কিন্তু তোমার চোখে জল! তুমি কাঁদছো?"

—"না-না-না, ভগবানের দোহাই এবার আমায় যেতে দাও"।

—"না, তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে সারা রাত কেঁদে কাটাবে! কি করবো ভাবতে পারছি না—শোনো, কেঁদো না তুমি, থাকো আমার কাছে, আমিই তোমাকে বিয়ে করবো"—

—"না—আর এখন তাইতে আমি রাজী হতে পারি না"—

এই বলে প্রবল চেষ্টায় আমার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছিন্ন করে নিয়ে ও ছুটে চলে গেল।

পরদিন রাত্রে আহারের সময় অবধি আমি রইলাম। গত রাত্রে অনুশোচনায়, লজ্জায়, ক্ষোভে এক মুহূর্তের জন্য ঘুমোতে পারিনি। সারা দিন অসুখের ভান করে নির্জনে চুপচাপ কাটিয়ে দিলাম। সারাক্ষণের মধ্যে ম্ভ লা মিউর এর সঙ্গে একটি বার দেখাও হোলো না, একটি কথাও বলতে পেলাম না। রাত্রে খাবার টেবিলে মাদময়াসেল ওর বিয়ের কথা প্রকাশ করলে···দিন আষ্টেকের মধ্যেই বিয়ে হবে, তারপরই ও ডানকার্ক চলে যাবে। আজ বুঝতে পারি সেদিন আর দেখা না করে ও ঠিকই করেছিলো।

কিন্তু সে সময় আমি যেন ওকে হারিয়ে পাগলের মত হোয়ে উঠেছিলাম···অনুশোচনায় আমার বুক জ্বলে যাচ্ছিল। প্যারিসে ফিরে এসে ওকে এক দীর্ঘ উচ্ছ্বাস আর আবেগ ভরা চিঠি লিখলাম। উত্তর এলো অনুরোধ জানিয়ে, আর কখনো যেন ওকে চিঠি না লিখি। মনে হোলো তবে ও নিশ্চয়ই ডানকার্কের ওই ব্যবসায়ীর প্রেমেই পড়েছে—মনে হতেই ইচ্ছা হোলো ঐ ব্যবসায়ীটাকে

খুন করতে ও যেন দস্যুর মত লুঠে নিতে এসেছে আমার এক পরম সম্পদ।

ঠিক করলাম ওর বাড়িতে যাবো...ওকে গিয়ে জানাবো ওর ভাবী পত্নীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা। তারপরও যদি ও নিরস্ত না হয় তাহলে ওকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানাবো। মনে মনে ঠিক করে ছুটি পিস্তল হাতে নিয়ে সত্যিই ওর বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। কিন্তু তখন ও ঘুমাচ্ছে। অপেক্ষা করতে লাগলাম—আধ ঘণ্টা পর ও ঘরে এসে ঢুকলো একটা ড্রেসিং-গাউন গায়ে জড়িয়ে। ঢুকে আমাকে দেখেই দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এসে আমার গলা জড়িয়ে উচ্ছ্বসিত আহ্বান জানালো। ওর এই আন্তরিকতায় আমার ভিতরের উন্মত্ত পশুটা অভিভূত হোয়ে পড়লো। সব ক্ষোভ, জ্বালা শান্ত হোয়ে জুড়িয়ে গেলো। আমি বাঁচলাম।...

এর কিছুদিন পর আমি জেনেভাতে চলে এলাম। সেখানে এসে যে হোটেলটাতে উঠলাম তার নাম হোটেল দা বালাঁস। মনে আছে সেদিন তারিখটা ছিলো ২০শে আগষ্ট ১৭৬০। ঘরের মধ্যে এক সময় অলসভাবে পায়চারি করতে করতে হঠাৎ চোখে পড়লো জানলার কাচের উপর কি যেন লেখা রয়েছে...উৎসুক হোয়ে কাছে যেতেই দেখি, হীরার অগ্রভাগ কেটে কেটে লেখা—

"তুমিও ভুলে যাবে হেনরিয়েটাকে"

আমার মাথার চুলগুলো অবধি খাড়া হোয়ে হোয়ে উঠলো একটা অসহ্য শিহরণে—এক ঝাপটায় সরে গেল বিস্মৃতির যবনিকা—হেনরিয়েটার স্মৃতি আমার সমস্ত মনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। মনে পড়লো সুদীর্ঘ তেরটি বছর আগেকার সেই দিনটি যেদিন হেনরিয়েটা ঐ কথাগুলি লিখে রেখে গিয়েছিলো। এই ঘরেই আমরা দুজনে

কাটিয়েছিলাম উজ্জ্বল মধুর ক'টি দিন। হেনরিয়েটার লক্ষ লক্ষ স্মৃতি আমার সমস্ত অনুভূতি সমস্ত হৃদয় জুড়ে ফুটে উঠলো···মানস নয়নে জেগে উঠলো হেনরিয়েটার তেজোময়ী, দীপ্তিময়ী মধুর মুখখানি—মনের সবটুকু মাধুরী দিয়ে যাকে একদিন ভালবেসেছিলাম আজ সে কোথায়? তারপর থেকে আর দেখিনি তাকে। কোথাও শুনিনি তার কথা। আজও তাকে আমি ভালবাসি—মনের অবচেতনে এত আবেগ এত নিবিড় অনুভূতি আজও ওর জন্যে লুকিয়েছিলো। কিন্তু কি যেন হারিয়েছি আজকের আমি সেদিনের আমির কাছ থেকে। হয়তো সেই গভীর আদর্শবাদ। কিন্তু মনে হয় আজও ওর স্মৃতি আমাকে যেন অনেক দিনের হারানো কি ফিরিয়ে দিলে। যদি একটুও জানতাম কোথায় গেলে ওর সন্ধান পাবো, তবে সেই মুহূর্তেই সেখানে চলে যেতাম ওর খোঁজে। মানতাম না কোনো বাধা—শুনতাম না ওর সেই কাতর মিনতি ভরা নিষেধ।

সেই দিন রাত্রে ম'্যসিয়ে ভিলার্স শ্যাঁতুর সঙ্গে গেলাম ভলতেয়ারের কাছে। আমার জীবনে এও এক স্মরণীয় দিন। আমরা যখন পৌছলাম তখন তিনি সবে টেবিল ছেড়ে উঠছেন–তাঁর চার পাশে ঘিরে আছেন বিখ্যাত লর্ড আর লেডীরা।

আমাকে যথারীতি ওঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হোলো।

অষ্টম অধ্যায়

—"মঁসিয়ে ভ্য ভলতেয়ার আজ আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবের দিন—গত বিশ বছর ধরে আমি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি, আজ গুরুর চাক্ষুষ দর্শনে, তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে পেরে আমি ধন্য"—

—"এই শিষ্যত্বের পরমায়ু আরও বিশ বছর স্থায়ী হোক—আশা করি, তারপর আমার গুরুদক্ষিণাটা থেকে বঞ্চিত হবো না—"

—"সর্ব্বান্তঃকরণে সম্মত—অবশ্য যদি তত দিন আমার জন্যে অপেক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দেন"—

আমাদের এই ভলতেরীয় বাকচাতুরীতে সকলেই হেসে উঠলেন। আমি কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত ছিলাম না। কারণ ভলতেয়ারের সঙ্গে এই ধরনের আলাপই আমি আশা করছিলাম। ভলতেয়ার আমাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমি যখন ভেনিসের লোক তখন কাউণ্ট আলগারোত্তিকে চিনি কি না ?

"—সাত বছর আগে যখন পাদুয়াতে ছিলাম চিনতাম। আর ওঁর মধ্যে একটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছিলো—সেটি হোলো আপনার প্রতি ওঁর অসীম শ্রদ্ধা"—

—"আমাকে বড্ড বাড়াচ্ছেন—উনি যে সকলের শ্রদ্ধেয় সেটা নিশ্চয়ই বিশেষ একজনের প্রতি ওঁর শ্রদ্ধা আর প্রশংসার জন্য নয়।"

—"ঠিক ওই কারণেই উনি নাম করেছেন। নিউটনের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা প্রদর্শন আর প্রশংসা করেই উনি প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।"

—"আচ্ছা ইতালীয়রা ওঁর রচনাশৈলী পছন্দ করে ?"

—"না, কারণ বিভিন্ন ভাষার রচনাশৈলীর প্রভাব আর আধিক্যে ওঁর রচনা পূর্ণ।"

—"কিন্তু ইতালীয় সাহিত্যে ফরাসী সাহিত্যের ভাব আর প্রকাশভঙ্গীর তো অভাব দেখি না—"

—হ্যাঁ আমাদের সাহিত্যকে ওইতেই নষ্ট করেছে। যেমন ফরাসী ভাষার মধ্যেও ইতালী আর জার্ম্মাণ সাহিত্যের প্রভাব আর তাদের রচনাশৈলীর অনুকরণ খুব বেশী দেখি, এমন কি ম্যঁসিয়ে ভ ভল্‌তেয়ারও যদি অমন ভাবে লেখেন তাহলেও সেটা উপভোগ্য হবে না একটুও—"

—"ঠিকই বলেছেন। সাহিত্যের সব চেয়ে বড় জিনিস হোলো ভাষার পবিত্রতা। আচ্ছা জানতে পারি কি, কোন ধরনের সাহিত্যে আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন?"

—"বিশেষ কোনটিতেই নয়। কিন্তু আমি প্রচুর পড়ি আর ভ্রমণ করি মানুষের চরিত্রের স্বরূপ জানতে আর বুঝতে।

—"হ্যাঁ এ ভাবেও শেখা যায়—তবে বইএর প্রয়োজন সবার বেশী। অবশ্য সবচেয়ে সহজ উপায় হোলো ইতিহাসের মাধ্যমে জ্ঞান সঞ্চয়।"

—"ঠিক, যদি অবশ্য ইতিহাস মিথ্যা না বলে, তাছাড়া ইতিহাসে থাকে বিরক্তিকর একঘেয়েমি, রসপিপাসু চিত্তকে তৃপ্তি দেবার ক্ষমতা তার নেই—অথচ যাযাবরের মত দেশ থেকে বিদেশে পথ থেকে বিপথে চলতে চলতেই তো দেখা যায় বিচিত্র এ বিশ্বমাঝে বৈচিত্রের লীলা বয়ে যায়…"

—"আপনি বুঝি কবিতার অনুরাগী?…"

—"শুধু অনুরাগ? কবিতায় আমার সত্তার বিলোপ…"

—"আপনি কি অনেক সনেট লিখেছেন ?"

—"গোটা বারো সনেট প্রকৃত রসোত্তীর্ণ বলে স্বীকার করি, আর হাজার দুই তিন শুধু লিখেছি আর পরমুহূর্তে ভুলেছি—"

—"আপনাদের অর্থাৎ ইতালীয়দের সনেটের উপর একটা দারুণ ঝোঁক দেখা যায়···তবুও সনেটের ঐ নির্দিষ্ট লাইনের অনুশাসনের বন্ধনেও কবিতাগুলি যেন অযথা বিলম্বিত হয়ে চলতে থাকে। আমাদের ভাষার দোষেই বোধ হয় একটাও ভালো সনেট আমাদের ভাষায় নেই—"

—"ভাষার দোষ ছাড়াও ফরাসী সাহিত্যিক প্রতিভারাও বেশ কিছুটা দায়ী। কারণ তাঁদের ধারণা, ভাবধারার বিস্তৃতিই কাব্যের গতি ব্যাহত করে তাকে নিষ্প্রভ করে তোলে···"

—"আপনি কি তা মনে করেন না ?"

—"মাফ করবেন, আমার মতে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হোলো ভাবধারার নির্বাচন। কবিতার রস-সৌন্দর্য নির্ভর করে কোন ভাব বা কোন চিন্তার আধারে তার প্রকাশ তারই ভিতর ···"

—"আপনার সবচেয়ে প্রিয় ইতালীয় কবি কে ?"

—"আরিয়োষ্ট। আমি যে তাঁকে আর সকলের চেয়ে বেশী ভালোবাসি, একথা বলতে পারি না—কারণ একমাত্র উনিই আমার প্রিয় কবি···ওঁর সামনে আর সব কবিই ম্লান, নিষ্প্রভ। বছর পনেরো আগে ওঁর সম্বন্ধে আপনার লেখা পড়ে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলাম যে আপনি যখন ওঁর সমস্ত লেখা পড়বেন তখন আপনি বাধ্য হবেন আপনার ধারণা সম্পূর্ণভাবে বদলাতে···"

—"হ্যাঁ, আমি তখন অল্পবয়সী ছিলাম, আপনাদের ভাষা সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও ছিলো ভাসা-ভাসা। তখন অন্যদের যথেষ্ট প্রভাব

আমার উপর পড়ে। আর তাইতেই অনুপ্রাণিত হয়ে আমি যে সমালোচনা লিখি…সেটা সে সময় আমার লেখা বলে মনে করলেও আসলে সেটা ছিলো তাদেরই কথার আর মতের প্রতিধ্বনি। এখন কিন্তু আপনার আরিয়োষ্ট আমারও প্রিয় কবি—"

—"আঃ, ম্যঁসিয়ে ভলতেয়ার হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম আপনার কথায়! কিন্তু এবার কৃপা করে আপনার ঐ সব রচনাগুলি বাতিল করে দিন না—যাতে অতবড় একটা প্রতিভাকে শুধু উপহাস আর বিদ্রূপ করে গেছেন—"

—"কোনো চিন্তা নেই, তারা সব একঘরে হোয়েছে। এবার আমার একটা আবৃত্তি শুনুন, তাহলেই বুঝবেন…"

এই বলে ভলতেয়ার চতুর্বিংশ আর পঞ্চবিংশ সর্গ থেকে দুটি সুদীর্ঘ অংশ আবৃত্তি করে গেলেন, একটি অক্ষরও বাদ না দিয়ে· শেষ হোতে না হোতে আমি উচ্ছ্বসিত হোয়ে চিৎকার করে উঠলাম এই বলে যে, সারা ইতালীর এই অনবদ্য আবৃত্তি শোনা উচিত ছিলো। প্রশংসাপ্রিয় ভলতেয়ার খুসী হোয়ে ওঁর রচিত কয়েকটি অংশের অনুবাদ আমাকে উপহার পাঠিয়েছিলেন পরদিন।

ভলতেয়ারের ভ্রাতুষ্পুত্রী মাদাম দেনিস উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কাকা কবির সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পঙ্‌ক্তি কয়টি আবৃত্তি করেছেন কি না।

—"হ্যাঁ, শ্রেষ্ঠ বলা যায়, শ্রেষ্ঠতম বলা যায় না·"

—"আপনার মতে কোন পঙ্‌ক্তিগুলি শ্রেষ্ঠতম?"…ভলতেয়ারের প্রশ্ন।

—"ত্রয়োবিংশ সঙ্গীতের শেষ পঙ্‌ক্তিগুলি। যেখানে তিনি বর্ণনা করছেন কেমন করে রোলঁ্যা পাগল হোয়ে গেল…সৃষ্টির

আদিযুগ থেকে আজও এই অনবদ্য পঙক্তিগুলির তুলনীয় কিছু রচিত হয়নি।”

—“ম্যঁসিয়ে ক্যাসানোভা এটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনাবেন কি ?” মাদাম দেনিসের অনুনয়।

করলাম আবৃত্তি। যখন শেষ হোলো দেখি, সবার চোখেই জল টলমল করছে…অবরুদ্ধ ক্রন্দনের বেগ সকলকেই সামলাতে হোচ্ছে…ভলতেয়ার ছুটে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরলেন উচ্ছ্বসিত আবেগে।

—“আশ্চর্য ! রোল্যাঁর এই সঙ্গীতকে রোম তার প্রাপ্য স্থান দেয় না !” মাদামের বিক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর।

—“রোম কখনও একে তাচ্ছিল্য করেনি”…ভলতেয়ার বললেন, “দশম লিও গোড়াতেই তাদের বাতিল করে দিতেন যারাই এই রচনার বিপক্ষ সমালোচনা করতে যেত। তাছাড়া রীতিমত প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী দুটী সম্মানিত পরিবার আরিয়োষ্টকে সর্বদা আগলে রাখতেন। তাঁদের সাহায্য আর আশ্রয় না পেলে ওঁকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করতে হোতো…”

এইবার উপস্থিত কোনো ভদ্রলোকের প্রস্তাবে ওঁর বাড়িতে একটা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের কথা উঠলো। ভলতেয়ার আমাকে তাইতে অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন, জানালেন, তাহলে তিনি নিজেও অংশ গ্রহণ করবেন। আমি সবিনয়ে আমার অক্ষমতা জানালাম, কারণ পরদিনই আমি চলে যাচ্ছি। ভলতেয়ার আমার পরদিন চলে যাবার কথায় কানই দিলেন না—

—“আপনি কি আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেন না আমার কথা শুনতে এসেছিলেন ?”

—"বলতে নিশ্চয়ই, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হোলো আমার সঙ্গে আপনাকে কথা বলাতে…"

—"তাহলে অন্ততঃ আরও তিন দিন থাকুন। প্রতিদিন আমার কাছে আপনার নিমন্ত্রণ রইলো…আহারপর্বের সঙ্গে সঙ্গে চলবে আমাদের আলাপ-আলোচনা··"

অস্বীকার করতে পারলাম না, সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাত্রের মত বিদায় নিলাম।

পরদিন সকালে ভলতেয়ারের সঙ্গে আহারপর্বের সময়, ভলতেয়ার ভেনিসের শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বার বার কৌতূহল প্রকাশ করতে লাগলেন কিন্তু ঐ প্রসঙ্গ উত্থাপনে আমার একান্ত অনিচ্ছা দেখে আর প্রশ্ন করলেন না। আমার হাত ধরে বাগানে বেড়াবার জন্যে উঠে এলেন। বাগানের এক প্রান্ত দিয়ে রোন নদী বয়ে চলেছে। নানা ধরনের আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে বেড়াতে বেড়াতে আমরা শেষে বাড়িতে এলাম। ওঁর সঙ্গে শোবার ঘর অবধি আমি গেলাম। ভলতেয়ার মাথার পরচুলাটা খুলে টুপী মাথায় দিলেন। সহজেই ঠাণ্ডা লাগতো বলে উনি কখনও মাথা খালি রাখতেন না। একটা দেরাজ খুলে ফেললেন—দেখলাম, তার ভিতর প্রায় শ'খানেক মোটা কাগজপত্রের দিস্তা।

—"ও-সবগুলো কি জানেন? প্রায় হাজার পঞ্চাশেক চিঠি। ওগুলোর প্রত্যেকটার উত্তর কিন্তু আমি দিয়েছি"—

—"আপনার উত্তরগুলোর প্রতিলিপি রেখেছেন তো?"

—"আমার কর্মচারীর উপরই ও-সব রাখার ভার দেওয়া আছে।"

—"আমি যথেষ্ট প্রকাশক আর পুস্তক-বিক্রেতাকে জানি, যারা ওই অমূল্য সম্পদ পেলে যোগ্য দক্ষিণা দিতে এখনই প্রস্তুত—"

—"হ্যাঁ, কিন্তু ওদের থেকে সাবধান! যদি আপনি কোনো বই বা রচনা প্রকাশ করতে চান—আর বিশেষ করে আপনি যদি অখ্যাতনামা হন, তাহলেই সর্বনাশ! দেখবেন, তখন সব প্রকাশকেরাই ডাকাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর।"

—"যত দিন না বার্ধক্যে পা দিচ্ছি ততদিন ওই সব ভদ্র-মহোদয়দের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্কই নেই।"

—"তাহলে ওরাই হবে আপনার বার্ধক্যের চাবুক।"

তারপর আমরা আবার সালোঁতে ফিরে এলাম। সেখানে প্রায় দুটি ঘণ্টা ধরে ভলতেয়ারের আশ্চর্য নিপুণ বাগবৈদগ্ধ আর উন্মেষ-শালিনী প্রতিভার পরিচয় সমস্ত শ্রোতাদেরই মুগ্ধ করে রাখলে—যদিও তার সঙ্গে ছিলো তাঁর স্বভাবজাত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি যা কাউকেই পরোয়া করতো না। কিন্তু ওর মিষ্টি হাসির আড়ালে সব শ্লেষ, আর বিদ্রূপ ঢাকা পড়ে যেতো।

ভলতেয়ারের বাড়িতে ছিলো সবার অবারিত দ্বার। তেমন আহার্যের পরিবেশনেও ছিলো উদার মুক্তহস্তের পরিচয়। তখন ওঁর বয়স হবে ছেষট্টি বছর আর বাৎসারক আয় একশো বিশ হাজার ফ্রাঙ্ক। জনরব ছিলো, ভলতেয়ার ওর প্রকাশকদের ঠকিয়ে নিজে ধনী হোয়েছেন—কিন্তু আসলে তার সম্পূর্ণ বিপরীতই ঘটতো। প্রকাশকরাই তাঁকে ঠকাতো। অবশ্য তার জন্য দায়ী ওঁর খ্যাতির মোহ। খ্যাতির প্রতি দুর্বলতা ওকে এমন পেয়ে বসেছিলো যে, উনি অনেক সময় প্রকাশকদের শুধু এই সর্তেই বই দিতেন যে, সেগুলি ছাপা হবে আর ভালোভাবে চালু করা হবে। মাত্র তিন দিন ওঁর সান্নিধ্যে থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম, তার মধ্যেও ওঁর এই উদারতার পরিচয় আমি পেয়েছি। 'প্রিন্সেস অ্ব ব্যাবিলন' বলে একটি অপূর্ব

উপন্যাস উনি ওই ভাবে প্রকাশককে দিয়ে দেন। বইখানি মাত্র তিন দিনের মধ্যে শেষ করেছিলেন।

রাত্রে আহারের সময় মাদাম দেনিস ছিলেন। ভলতেয়ার অনুপস্থিত। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতির সব ত্রুটি উনি একাই হরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁরও মার্জিত রুচি, সাধারণ জ্ঞান আর সৌন্দর্যবোধের কিছু অভাব ছিল না। ম্যঁসিয়ে দ্য ভলতেয়ার বেশ দেরীতে ফিরলেন, হাতে একখানা চিঠি। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আমি মার্কুইস আলবার্গাতিকে চিনি কি না। আমি বললাম, পরিচয় না থাকলেও নামে চিনি।"

—"তিনি আমাকে 'গলদোণি'র কয়েকটি নাটক, কিছু সসেজ আর আমার একটি রচনার অনুবাদ উপহার পাঠিয়েছেন, আর বলে পাঠিয়েছেন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন—"

—"নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি আসবেন না, অত বোকা তিনি নন।"

—"মানে? আমার সঙ্গে দেখা করাটা বোকামির লক্ষণ? আপনি এই বলতে চান?"

—"না, আমি শুধু বলতে চাই যে, এতে করে কত বড় ঝুঁকি যে তাঁকে নিতে হবে, সেটুকু বোঝবার মত জ্ঞান তাঁর আছে। কারণ যদিই আসেন, তবে সেই মুহূর্তেই আপনি টের পেয়ে যাবেন তাঁর বুদ্ধির দৌড় কতখানি—আর আপনারও ধারণা ভেঙে যাবে।"

—"আচ্ছা, গলদোনি 'ডিউক অফ পারমা'র কবি বলে জাহির করেন কেন?"

—"বোধ হয় প্রমাণ করতে যে আর পাঁচজনের মত তাঁরও চরিত্রে একটা দুর্বল দিক আছে।"

"উনি তো নিজেকে একজন ব্যারিষ্টারও বলেন—আসলে কোনোটাই নন। কয়েকটি বেশ ভালো মিলনান্তক নাটক অবশ্য তিনি লিখেছেন, আর কিছু না। সমাজেও বিশেষ নাম করতে পারেন নি···"

—"আমি শুনেছি ওঁর অবস্থা ভালো নয়, উনি নাকি ভেনিস ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু ভয় পাচ্ছেন থিয়েটারের ম্যানেজারদের চটাতে। সেখানে ওঁর নাটকগুলি অভিনীত হয় কিনা···"

—"একবার ওঁকে একটা বৃত্তি দেবার কথা ওঠে। কিন্তু আবার সেটা চাপা পড়ে যায়। কারণ, সবাই আশঙ্কা করেন যে, একটা সুনির্দিষ্ট আয় হোলে হয়ত আর উনি লিখতে চাইবেন না···"

—"হুম্! হোমারকে একবার বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা নাকচ করে দেওয়া হয়। পাছে অন্ধমাত্রেই বৃত্তি চেয়ে বসে বলে···"

সেদিনটা ওঁর সান্নিধ্যে উজ্জল আর স্মরণীয় হোয়েই রইলো। পরদিনও অমনি উজ্জল একটি দিনের প্রত্যাশায় গেলাম ভলতেয়ারের কাছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, সেদিন সেই বিরাট প্রতিভাকে দেখলাম তাঁর নিকৃষ্টতম মানসিক অবস্থায়। জানি না, কোন অজ্ঞাত কারণে সেদিন ওঁর মেজাজ যেমন খিটখিটে, কলহপ্রিয়, কথাবার্তাতে তেমনি তিক্ত আর শ্লেষ-বিদ্রূপে ভরা। যদিও জানতেন সেদিন আমার বিদায়ের দিন, তা সত্ত্বেও আমাকে দেখে তিক্ত হাসি হেসে বললেন—"মালিনের বইটা উপহারের জন্যে দিয়েছেন হয়তো ভালো মনেই। কিন্তু তার জন্যে ধন্যবাদ দিতে আমি অক্ষম। কারণ পুরো চারটি ঘণ্টা আমার ওর পিছনে নষ্ট হোয়েছে।"

আমি প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে উত্তর দিলাম, হয়ত আজ ভালো না লাগলেও একদিন আমার মতের সঙ্গে মিল হোতে পারে।

সামান্য কথায় উঠলো তর্কের ঝড়। কথায় কথায় আমি ক্রেবিলঁকে আমার শিক্ষক বলে অভিহিত করাতে ভলতেয়ার জিজ্ঞাসা করলেন, —"ক্রেবিলঁ! জানতে পারি কি, কোন্ সুবাদে তাঁকে শিক্ষক বলছেন আপনার?"

—"তিনি আমাকে ফরাসী ভাষা শিক্ষা দিয়েছিলেন ছ'টি বছর ধরে—আর তারই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি তাঁর একটি রচনা ইতালীয় 'আলেক্জান্দ্রাইন' ছন্দে অনুবাদ করেছিলাম—আর আমিই প্রথম ইতালীয় যার ঐ ছন্দে রচনার সাহস ছিলো…"

—"প্রথম! মাফ করবেন, প্রথম হবার সম্মান জুটেছিলো আমার বন্ধু পিয়্যের মার্তেলীরই বরাতে…"

—"দুঃখিত, আপনার কথার প্রতিবাদ করতে হোলো বলে…"

—"কিন্তু তাঁর রচনা আমার কাছে আছে। বোলোনাতে ছাপা হোয়েছিলো…"

—"হ্যাঁ, কিন্তু 'আলেক্জান্দ্রাইন' ছন্দে লেখা নয়। তাঁর কবিতাগুলির চৌদ্দটি করে চরণ, আর একটি পুংলিঙ্গে একটি স্ত্রীলিঙ্গে, এই ভাবে পর পর চরণগুলির রচনাও তিনি করেন নি। অবশ্য, তিনি নিজে ভেবেছিলেন যে, তিনি ওই ছন্দেই লিখছেন, তাই ওঁর ভূমিকা পড়ে আমি হাসি চাপতে পারি নি। সম্ভবতঃ আপনি সেটা পড়েন নি…"

—"পড়ি নি! কি বলছেন আপনি? ভূমিকা পড়াটাই আমার নেশা। তাতে তো তিনি জোর করেই লিখেছেন…"

—"হ্যাঁ, সেটাই তো মজার ব্যাপার…আপনাদের কাব্যগুলিতে কখনও বারোটি চরণ আর কখনও তেবটি চরণ ব্যবহার হয়। অথচ মার্তেলীর সবই চোদ্দ চরণের। অতএব হয় তিনি কালা, নয় তাঁর ছন্দজ্ঞান খুবই কম।"

—"আপনি বুঝি আমাদের কবিতার ছন্দের প্রত্যেকটি নিয়ম-কানুন কঠোর ভাবে অনুসরণ করেন ?"

—"হ্যাঁ, যত কঠিনই হোক না কেন ?"

—"আচ্ছা ক্রেবিলঁর রচনার যে অনুবাদ করেছেন তার কোনো অংশ কি আবৃত্তি করে শোনাতে পারেন ? অবশ্য যদি আপনার অসুবিধা না হয়। কারণ আমার খুব ইচ্ছা আপনার অনুবাদ আর ছন্দ শুনতে···"

আমি দশ বছর আগে ক্রেবিলঁর কাছে যে অংশটি আবৃত্তি করেছিলাম সেই অংশটির পুনরাবৃত্তি করলাম। এতক্ষণে ভলতেয়ারের মুখে খুশীর আলোর আভাস দেখা দিল। শেষ হতে নিজেও ওঁর স্বরচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন—সেটি তখনও ছাপা হয়নি······কিন্তু অপূর্ব, অনবদ্য সেই রচনা। যদি সেই খুশীর রেশটুকু রেখেই সেদিন বিদায় নিতাম তবে সব দিক থেকেই ভালো হোতো। কিন্তু কেন যে আবার 'হোরেস'এর লেখার সমালোচনার মধ্যে নিজেকে জড়ালাম জানি না ! সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদ আর তর্কের ঝড়ে খুসীর সেই মৃদু আলোটুকুও নিবে গেলো। দুটি প্রতিপক্ষের মধ্যে শুধু যুক্তি-তর্কের আর বিতর্কের ঝড় বইতে লাগলো। এলো নিতান্ত অবাঞ্ছিত প্রসঙ্গ সব···দেশ, শাসনতন্ত্র স্বাধীনতা সব কিছুই···

—"আপনি কি ভাবেন ভেনিসে আপনারা স্বাধীন জীবন যাপন করেন ?"—ভলতেয়ারের কূট প্রশ্ন।

—"একটি অভিজাত শাসনতন্ত্রের অধীনে যতটা স্বাধীনতা ভোগ করা যায় ততটা করি বৈ কি। বলছি না যে আমরা ইংরেজদের মত স্বাধীন—তবুও বলবো আমরা তৃপ্ত, আমরা খুসী···"

—"এমন কি যখন 'লেডস্'এ বন্দী ছিলেন তখনও"···ঝিক্‌মিকিয়ে উঠলো শাণিত বিদ্রূপ।

—"আমার কারাবাস একটা ষড়যন্ত্রের ফল আমি জানি···কিন্তু এটাও ঠিক যে আমি আমার স্বাধীনতার অপব্যবহার করেছিলাম। মাঝে মাঝে আমার এ কথাও মনে হয়, কোনো রকম বিচারের ব্যবস্থা না করেই শাসনকর্তারা আমাকে বন্দী করে উচিত কাজই করেছিলেন···"

—"কিন্তু আপনি তো পালিয়েছিলেন ?"

—"শাসনতন্ত্রও যেমন তার অধিকার নিয়ে আছে, আমিও তেমনি আমার অধিকার খাটিয়েছি···

—"সাবাস! কিন্তু তাতে তো ভেনিসে কেউই স্বাধীন হোতে পারে না ?"

—"হয়ত নয়। কিন্তু নিজেকে স্বাধীন ভাবলেই তো স্বাধীন হওয়া যায়···"

—"আপনার এ-কথায় আমার কোনো আস্থা নেই। অভিজাত সম্প্রদায়, এমন কি শাসন বিভাগের অধিকর্তারাও তো আপনাদের দেশে স্বাধীন নন। কারণ তাঁরাও তো অনুমতিপত্র ছাড়া কোথাও ভ্রমণ করতে অবধি পারেন না—"

—"ঠিক, কিন্তু এটাও তো ঠিক যে তাঁদেরই গড়া আইনের অনুশাসনে তারা স্বেচ্ছাবন্দী···"

···"ভালো কথা, দুনিয়ার সব জায়গাতেই জনসাধারণকে নিজেদের আইন গড়বার সুবিধা দেওয়া হোক···"

সাহিত্য প্রসঙ্গ বহুক্ষণ চাপা পড়ে গেছে। এই কূট তর্কের জালে ক্লান্ত হোয়ে দুজনেই চুপ করে রইলাম। তারপর ভলতেয়ার বিশ্রাম

নেবার জন্যে উঠে গেলে আমি চলে এলাম অশান্ত, বিক্ষুব্ধ মন নিয়ে। নিজের উপরই বিরক্ত হোয়ে উঠলাম কেন এই বিখ্যাত সাহিত্যিক, অসাধারণ, বুদ্ধিজীবী, বিরাট প্রতিভাকে যুক্তিতর্কের যুদ্ধক্ষেত্রে নামালাম। অবশ্য সারা মন জুড়ে একটা তীব্র বিদ্বেষের দাহ অনির্বাণ ভাবে জ্বলছিলো, তাই পুরো দশটি বছর ধরে ভলতেয়ারের প্রতিটি লেখার নির্মম সমালোচনা করেছি। অবশ্য আজ তার জন্য আমি অনুতপ্ত। কিন্তু পরে সেই সব লেখা বাতিল করতে গিয়ে বার বার পড়ে দেখেছি—অনেক জায়গায় অনেক বিষয়ে আমার সমালোচনার কোনো ত্রুটিই দেখতে পাইনি। তবুও বলবো, আমার আরও সংযত হওয়া উচিত ছিলো।

সারা রাত বসে লিখে রাখলাম আমাদের কথোপকথন—যা সব জড়ো করলে একটা বিরাট গ্রন্থ হোতে পারতো। কিন্তু আত্মস্মৃতির পাতায় তার দু'-একটি টুকরোই রেখে দিলাম। পরদিনই যাত্রা করলাম দক্ষিণের পথে ···।

নবম অধ্যায়

ঘুরতে ঘুরতে নীস জেনোয়া হোয়ে এলাম ফ্লোরেন্সে। এখানে এসে ছোট্ট একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করলাম। জায়গাটি বড় সুন্দর বেছে নিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে একটা গাড়ী কিনে কোচম্যান আর সহিসও রাখলাম দু'জন। তারপর আরও কিছু খুঁটিনাটি ব্যবস্থাও সেরে নিতে দেরী হোলো না। একদিন অপেরা দেখতে গেলাম। এমন জায়গায় আমরা আসন নিয়েছিলাম যেখান থেকে প্রত্যেকটি অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কে জানতো সেখানে আমার জন্যে এমন বিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে।

শ্রেষ্ঠ গায়িকাটি যেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ, অমনি আমারও সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চের শিহরণ…এ তো টেরেসা…সেই টেরেসা যাকে কতো… কতো দিন আগে পেয়েছিলাম। আর পেয়েই হারিয়েছিলাম। সে কী আজ? ১৭৪৪ সালে ওর সঙ্গে প্রথম পরিচয়…আর কি অভিনব সেই পরিচয়! কিশোরীর আত্মপরিচয় কিশোরের বেশে। সঙ্গীদেরও ছদ্মপরিচয় মা আর সহোদরের রূপে। কিন্তু বেলিনোর ছদ্মবেশের আড়ালে কিশোরীর কমনীয়তা আমার দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। আর ওর সত্য পরিচয়ের রহস্যভরা অবগুণ্ঠনখানি তুলে ধরতে গিয়ে আমাদের হৃদয় বিনিময়েও কোনো ফাঁক ছিল না। আর যৌবনের সেই প্রথম সন্ধিক্ষণে আমাদের অভিনব প্রণয় পরিণয়েই সমাপ্তি লাভ করতো·· সেই শপথই তো আমরা নিয়েছিলাম নির্জন বিহ্বল মুহূর্তগুলিতে…কিন্তু কৌতুকময়ী ভাগ্যদেবীর পরিহাসে আমি হলাম পিসারোতে বন্দী আর প্রতীক্ষারতা টেরেসা পেলো ডিউক অফ কাস্ত্রোপিনানোর আশ্রয় তাঁর রঙ্গমঞ্চের গায়িকা হোয়ে…

তার পর দু'জনের মাঝখানে সুদীর্ঘ সতেরোটি বছরের ব্যবধান। স্মৃতির কোন মণিকোঠায় রুদ্ধঘরে বন্দিনী দিনগুলি ছাড়া পেয়ে ছুটে এলো বুঝি···মনে পড়লো টেরেসার শেষ চিঠিখানির উত্তর আজও দেওয়া হয়নি। কিন্তু আশ্চর্য, এই সুদীর্ঘ সতেরোটি বছর ওকে কি কোথাও স্পর্শ করেনি? তেমনি সতেজ, তেমনি কমনীয় তেমনি লাবণ্যে অপরূপ দেহকান্তি···আর তেমনি মাধুর্যে পূর্ণ বিকশিত।

গানের শেষের দিকে হঠাৎ চোখ পড়লো টেরেসার আমার দিকে। স্পষ্ট দেখলাম, দু'টি আঁখিতারায় জ্বলে উঠলো পরিচয়ের দ্যুতি। গানটি শেষ হওয়া অবধি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আমার দিকে। একবারও দৃষ্টি ফেরালো না···মঞ্চ ছেড়ে যাবার সময় হাতের পাখাখানি দিয়ে চকিত ইশারায় জানিয়ে গেল আহ্বান।

আসন ছেড়ে উঠে পড়লাম···বক্ষস্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর। রঙ্গমঞ্চের পিছনে গিয়ে দেখি, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আমার টেরেসা। এগিয়ে গেলাম। মুখোমুখি দাঁড়ালাম দু'জনে···নিঃশব্দে সম্মোহিতের মত। জানি না ক'টি মুহূর্ত কাটলো। শেষে আস্তে আস্তে ওর হাতখানি ধরে আমি বুকের উপর চেপে ধরলাম।

—"কিছু শুনতে পারছ? বুকের ভিতরটায় কি হচ্ছে, পাচ্ছ তার আভাস?"

—"প্রথম যেই তোমাকে দেখলাম, মনে হোলো এখনি বুঝি মূর্ছিত হোয়ে পড়বো। দুর্ভাগ্য আজই রাত্রে আমার আবার অন্য জায়গায় নিমন্ত্রণ···কিন্তু আজ তো সারা রাত দু'টি চোখের পাতায় ঘুম নামবে না···তাদের জায়গা তুমি যে আগেই অধিকার করে বসে আছো। কাল ভোরবেলা এসো আমার কাছে, বলো আসবে? কোথায় থাকো তুমি? এখানে কি নাম তোমার? কত দিন

এসেছো? কত দিন থাকবে আর? বিয়ে কোরেছো? ওঃ ওঃ, সময় হোয়ে আসছে···ছাই-এর নিমন্ত্রণ···ঈশ্ ওরা ডাকতে আসছে বুঝি? বিদায়···বিদায়···কাল কিন্তু মনে

মিলিয়ে গেল কণ্ঠস্বর · স্তব্ধ হোয়ে গেল অজস্র প্রশ্নের ঝড়। প্রকৃতিস্থ হোতে কিছু সময় লাগলো বৈ কি। ফিরে এলাম নিজের আসনে। এতক্ষণে খেয়াল হোলো ওর নাম-ধাম কোনো পরিচয়ই তো নেওয়া হয়নি। আমন্ত্রণ যে জানালে কিন্তু ঠিকানা কোথায়?

আমার পাশেই বসেছিলেন একটি সুবেশ তরুণ···আমি মৃদুস্বরে তাকেই প্রশ্ন করলাম ঐ গায়িকা-অভিনেত্রীটির পরিচয় যদি বলতে পারেন।

—"আপনি বুঝি ফ্লোরেন্সে নবাগত?" তিনি প্রশ্ন করলেন।

—"সবেমাত্র এসেছি বলতে পারেন—'

—"ও, তবে আপনার অজ্ঞতা ক্ষমা করা যেতে পারে। তাহলে শুনুন ওই ভদ্রমহিলার আর আমার নাম একই; কারই উনি আমার স্ত্রী। আর এই অধমের নাম হোলো সিরিল্লো পালেসি"—

আমি অভিবাদন জানালাম, কিন্তু কোথায় থাকেন, সে কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস হোলো না—আমার ভব্যতা সম্বন্ধে তাহলে সন্দেহ জাগতে পারে, টেরেসা তাহলে এই সুন্দর তরুণটিকে বিয়ে করেছে? আর আশ্চর্য, সবাইকে ছেড়ে আমিও ঠিক এঁকেই প্রশ্ন করলাম।

অপেরা দেখে ফিরে আসবার সময় ওখানকারই একটি পরিচারককে ডেকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, মাত্র দশ মাস হোলো টেরেসার বিয়ে হয়েছে। আর ওর স্বামী বেচারা বেকার শুধু নয় বিত্তহীনও বটে; তবে টেরেসার অর্থসম্পদ

দু'জনার পক্ষে যথেষ্ট। শুধু অর্থসম্পদ নয়, মানমর্যাদাও কিছু কম নেই টেরেসার।

ঊষার আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হোলাম আমার যৌবনের ঊষালোকে, যে প্রথম মাধুর্যের রঙের পরশ বুলিয়েছিল আমার মনে; তারই দরজায়! এক জন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে অভিবাদন জানিয়ে বললে, আমিই মঁ্যসিয়ে ক্যাসানোভা কি না, কারণ তাঁরই অপেক্ষায় কর্ত্রী রয়েছেন।

বাড়ির ভিতর ঢুকতেই টেরেসার তরুণ স্বামীটি বেরিয়ে এলেন, পরনে ড্রেসিং গাউন, মাথায় রাত্রির টুপী। আমাকে স্বাগত জানিয়ে বিনয়ের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। জানালেন ওঁর স্ত্রী এখনি আসবেন, তারপর আমার দিকে এক-দৃষ্টে চেয়ে বললেন,—"কিন্তু আমার স্থির বিশ্বাস, আপনিই নিশ্চয়ই কাল আমার স্ত্রীর নাম জানতে চেয়েছিলেন।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমি বহুদিন ওকে দেখিনি, আর ওর বিয়ে হোয়ে গেছে তাও জানতাম না। আমার সৌভাগ্য যে, ওর স্বামীর কাছেই আমি কাল প্রশ্ন করেছিলাম। আমাদের দু'জনার বন্ধুত্বের বন্ধনে আপনাকে জড়াতে পারলে ধন্য হবো···অবশ্য আপনার সম্মতি থাকলে···"

টেরেসা এসে ঢুকলো। দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে দু'টি প্রণয়ীর মতই আমরা উচ্ছ্বসিত আলিঙ্গনে পরস্পরকে বন্দী করলাম। কয়েক মুহূর্ত মাত্র·····টেরেসা ওর স্বামীকে বসতে বলে দুই হাতে আমাকে টানতে টানতে সোফার উপর ওর পাশে নিয়ে বসালে··· তারপর উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেঙে পড়লো·········আমারও চোখ অশ্রুসজল—

প্রথম উচ্ছ্বাসের বেগ একটু কমে এলে দু'জনারই চোখ গিয়ে পড়লো বেচারী স্বামীটির উপর···আমাদের খেয়ালই ছিল না ওর উপস্থিতি···আর বেচারার হতভম্ব মূর্তি দেখে দু'জনাই হেসে উঠলাম এক সঙ্গে। কিন্তু টেরেসা জানতো, ওই পোষমানা বেচারী জীবটিকে কেমন করে মানিয়ে নিতে হয়—

—"ও হোঃ পালেসি! ভুলেই গিয়েছিলাম তোমাকে বলতে, এই যে ভদ্রলোকটিকে সামনে দেখছো ইনি আমার বাবার মত,··· বরং বাবার চেয়েও বেশী বলতে পারি। অভিভাবকের মত, বন্ধুর মত, রক্ষাকর্তার মত ইনি যে আমার কত উপকার করেছেন তুমি জানো না···আমি সবকিছুর জন্যেই এঁর কাছে ঋণী, উঃ কি আনন্দের দিন আজ···দীর্ঘ দশটি বছর এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিলাম।"

বাবার সঙ্গে তুলনা দেওয়ায় সে বেচারার চোখ দু'টি গোল গোল হয়ে উঠলো···কারণ টেরেসা যদিও আজ নিখুঁত সৌন্দর্য আর অটুট যৌবনকে এতটুকু ম্লান হোতে দেয়নি তাহলেও মাত্র দু'বছরের ছোটো আমার চেয়ে। তবু হাল ধরেই চললাম—

—"ঠিকই বলেছে, আপনার টেরেসা শুধু আমার মেয়েই নয়, সহোদরার প্রীতি, বন্ধুর ভালোবাসা সবই ওর কাছে পেয়েছি। ও সাধারণ মেয়ে নয়, ও একটি অমূল্য সম্পদ তার উপর আপনার স্ত্রী" ···এইটুকু এক নিঃশ্বাসে বলেই আমি টেরেসার দিকে ফিরে বললাম —"কিন্তু তোমার শেষ চিঠিটার উত্তর আমি আজও দিইনি কারণ···"

—"আমি জানি তুমি 'লেড্‌স'-এ বন্দী ছিলে। ভিয়েনায় থাকতে তোমার পালিয়ে আসার আশ্চর্য গল্প শুনেছিলাম। তারপর প্যারিসে আর হলাণ্ডেও তোমার খবর পেয়েছি। মাত্র সম্প্রতি আমি তোমার কোনো খোঁজ পাইনি কোন সূত্রও পাইনি, যেখান থেকে খোঁজ

পাবো। গত দশটি বছর কেমন করে কেটেছে সেই সব গল্প তোমার কাছে করবো···তোমার নিশ্চয়ই ভালো লাগবে। যাই বলো এখন কিন্তু আমি সুখী। আমার প্রিয়তম পালেসি, ওকে আমি ভালোবাসি, পালেসিও আমাকে ভালোবাসে। মাত্র কয়েক মাস আগে আমাদের বিয়ে হয়েছে! আমার আশা আছে তুমি যেমন আমার বন্ধু তেমনি একদিন পালেসিরও বন্ধু হোয়ে উঠবে···"

এই কথায় আমি উঠে গিয়ে পালেসিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করলাম। আর বেচারা পালেসি—স্ত্রীর পিতৃসম, ভ্রাতৃসম, বন্ধুসম সম্ভবতঃ প্রণয়ীসম এই নবপরিচিতকে কি ভাবে গ্রহণ করবে সেটা বুঝে ওঠা বাস্তবিকই ওর পক্ষে দুরূহ ছিলো। ওর দুর্দশা দেখে আমারই হাসি চেপে রাখা দায় হোয়েছিলো। কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে থেকে অতি কষ্টে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে আমাকে ওদের সঙ্গে এক পেয়ালা চকোলেট খাবার জন্য অনুরোধ জানালে—আর পরক্ষণেই ভিতরে চলে গেল তার ব্যবস্থা করতে···যদিও আমার বিশ্বাস, নিজেকে একটু সামলে নিতেই গেল।

আমরা একা হতেই টেরেসা হঠাৎ এগিয়ে এসে আমার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুই হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলো—

—"প্রিয় আমার, প্রিয়তম আমার···জীবনের প্রথম প্রেমের স্বপ্ন আমার···আমাকে বুকে টেনে নাও···আরও আরও নিবিড় করে এতটুক যেন ফাঁক না থাকে। আমি কি ভুলতে পারি? হৃদয়ে প্রথম প্রেমের স্পন্দন তো তুমি জাগিয়েছিলে···কৈশোরের স্বপ্নভরা রঙীন মায়াকে তো তুমিই রূপ দিয়েছিলে···আজ একটি মুহূর্তের জন্যে

ফিরে পেতে দাও সেই ফেলে-আসা মধুর ক্ষণগুলির একটি কণা। কাল থেকে সহোদরার প্রীতি নিয়ে সবার সামনে তোমার স্নেহের দাবীই করবো···কিন্তু সে কাল, আজ নয়। আজ শুধু তুমি থাকো আমার সেই চিরকিশোর প্রিয়তম ··

না, না, বঞ্চনা আমি করিনি···আমি ভালোবাসি আমার স্বামীকে সত্যিই ভালোবাসি। তাকে আমি বঞ্চনা করিনি···করবো না। কিন্তু তোমার ঋণ যে শুধতেই হবে···আমার প্রথম প্রেমের ঋণ। তারপর···তারপর ভুলে যাবো সব—শুধু মনে রাখবো আমি বিবাহিতা ···আর তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের অক্ষয় বন্ধন। ও কি ?··· তোমার মুখ অত ম্লান কেন ?”

—“সেদিন আমি বন্দী ছিলাম···সেই সতেরো বছর আগে··· তাই মুক্ত বিহঙ্গীকে ধরে রাখিনি। আর আজ আমি যখন মুক্ত তখন দেখি বন-বিহঙ্গী হোয়েছে স্বেচ্ছাবন্দিনী···অনেক দেরী হোয়েছে আমার। কিন্তু আজ তোমার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ···বলো আমাকে তোমার কি ইচ্ছা? তোমার স্বামীর কাছে পূর্বকথার কোনো উল্লেখই যেন না করি তাই না ?”

—“তাই-ই। পালেসি আমার পূর্বজীবন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। সকলেই যা জানে তা' ছাড়া যে নেপল্‌সেই আমি মাত্র দশ বছরে অর্থ, সম্পদ, খ্যাতি অর্জন করি। এ বঞ্চনা নির্দোষ নয় কি? বলো, কার কতটুকু ক্ষতি হবে এটুকু ছলনায়? অথচ এক জনের জীবনে এ-যে অনেকখানি। সবাই জানে আমার বয়স চব্বিশ—আমি তাই-ই বলেছি। বলো তো আমাকে কি অনেক বেশী বয়স দেখায় তার চেয়ে?”

—“একটুও না—যদিও আমি জানি তোমার বত্রিশ বছর বয়স।”

—"একথা আমাদের মধ্যেই থাক্। কিন্তু ঠিক করে বলো আমাকে চব্বিশের মত দেখায় কি ?"

—"তার চেয়ে আরও অনেক কম দেখায়।"

—"আচ্ছা, ক্যাসানোভা এবার বলো তোমার কথা। তোমার টাকার দরকার আছে? এক দিন তুমি যা দিয়েছিলে আজ তা ফিরিয়ে দেবার মতো ক্ষমতা আমার হোয়েছে···হ্যাঁ সুদশুদ্ধ। আমার হাজার পঞ্চাশেক টাকা আছে আর প্রায় সমান দামের হীরে আছে···একটুও সঙ্কোচ করো না—শীগগির বলো, চকোলেট আসার সময় হোয়ে এলো যে···"

আমি উত্তরে শুধু আর একবার ওকে আমার বাহুডোরে বন্দী করতে যাচ্ছিলাম এমন সময় চকোলেট এসে পড়লো। ওর স্বামী প্রথমে, আর পিছনে পরিচারিকার হাতে রূপার ট্রেতে তিনটি পেয়ালা। খেতে খেতে আমরা তিন জনেই নানা রকম গল্প করতে লাগলাম। পালেসি এবার অনেকটা স্বচ্ছন্দ আর সপ্রতিভ। কৌতুকভরা স্বরে পালেসি বললে, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই যে আগন্তুকটির সঙ্গে দেখা সেই কাল রাত্রে থিয়েটারে ওরই কাছে ওর স্ত্রীর পরিচয় চেয়েছিলো। তাই ও আশ্চর্য হোয়ে গিয়েছিলো খুবই। কিন্তু ওর ভদ্র মন আর সংযত ব্যবহার ইঙ্গিতেও প্রশ্ন তুললে না, কবে, কখন, কোথায় কেমন করে ওর স্ত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

পালেসির বয়স তেইশ বছর মাত্র···কিন্তু অপরূপ ওর লালিত্য আর অতি শোভন ওর কেশবিন্যাস···হ্যাঁ পুরুষের পক্ষে সৌন্দর্যটা একটু মাত্রাছাড়াই বলতে হবে। আর ওর স্বচ্ছন্দ ব্যবহার আর চঞ্চল আমোদপ্রিয় স্বভাবের জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওকে ভালো লাগলো· ভারী ভালো লাগলো।

প্রায় দশটা নাগাদ একে একে অভিনেতা আর অভিনেত্রীদের আগমন সুরু হোলো রিহার্শালের জন্যে। আমি লক্ষ্য করলাম টেরেসার সহজ সুন্দর ব্যবহার প্রত্যেকের সঙ্গে···অথচ দূরত্ব।

দু'জন অভিনেত্রী শেষ অবধি থেকে গেলেন। টেরেসার কাছে তাঁদের আহারের নিমন্ত্রণ। তার মধ্যে লা কতিসেল্লি নামে অভিনেত্রীটি আশ্চর্য সুন্দরী···কিন্তু তখন আমার সমস্ত মন টেরেসাতে আচ্ছন্ন। আর কারো দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবার মত অবস্থাই ছিল না আমার।

আহারের শেষে একজন মঠবাসী এসে উপস্থিত হোলেন আমাদের আসরে। ওঁর নাম আবে গামা। ওঁকে আমি চিনতাম রোমে থাকতে। উনিও আমাকে দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলেন। ওঁর কাছ থেকে পুরানো বন্ধুদের সব খবর শুনতে লাগলাম··কিন্তু হঠাৎ আমার সমস্ত মনটা চমকে উঠলো একটি ছেলেকে দেখে। বছর পনেরো বয়সের একটি ছেলে ঘরে ঢুকে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে এগিয়ে এসে টেরেসাকে চুম্বন করলো। একমাত্র আমিই ছেলেটির কাছে অপরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য আমি একাই হইনি। টেরেসা তখনি ওকে আমার সামনে এনে বললে।

—"এটি আমার ভাই।"

টেরেসার ভাই! অথচ আমার জীবন্ত প্রতিচ্ছবি··এতটুকু পার্থক্য নেই··কৈশোরের কমনীয়তাটুকু ছাড়া। তখনি বুঝলাম, তখনি জানলাম ওকে··প্রকৃতির খামখেয়ালীপনা এর চেয়ে চরম আর কি হতে পারে?

আমার মনে হোলো আমাদের দু'জনার প্রথম পরিচয়ের এতগুলি সাক্ষী টেরেসা না রাখলেই ভালো করতো। আমি যত

বার ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করলাম তত বারই ও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। আর সেই কিশোরটি এমন একাগ্র তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইলো যে টেরেসা ওকে কি বলছে তা ওর কানেও গেল না। আর ঘরশুদ্ধ সবাই একবার আমার মুখে আর একবার ঐ কিশোরটির মুখের দিকে তাকাতে লাগলো! যে কোনো লোকের মাথায় এক ফোঁটা বুদ্ধি থাকলেই ধরে ফেলতে পারবে কিশোরটির বাপ মায়ের পরিচয়।

কথাবার্তা ওর অতি মার্জিত আর সব চেয়ে বড় কথা হোলো ও কথা কইতে জানে। তাছাড়া কি শোভন ভদ্র ব্যবহার! ওর মা বললে সঙ্গীত ওর একমাত্র সঙ্গী।

—"তুমি ওর 'হার্পসিকর্ত' বাজনা শুনো…সত্যিই শোনবার মত। যদিও ও আমার চেয়ে আট বছরের ছোটো তবুও অনেক ভালো বাজায় আমার চেয়ে।"

সত্যি কঠিন সমস্যার হাত এড়িয়ে যেতে মেয়েরা যত সহজে পারে পুরুষরা কিছুতেই পারে না।

সবাই বিদায় নেবার পর ঘরে টেরেসাকে একলা দেখে অভিনন্দন জানালাম, অমন সুকুমার দর্শন সহোদরের জন্যে।

—"ও তো তোমারই…আর আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ। মনে আছে, ডিউক অফ কাস্ত্রোপিনানোর কথা? তিনিই ওকে মানুষ করেছেন। মনে পড়ছে তোমার 'রিমিনি' থেকে যিনি আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর আশ্রয়ে? ছেলে জন্মাবার পরই ওকে সোরোন্টাতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। নয়টি বছর ও সেখানে ছিলো। ডিউক ওকে সিজার ফিলিপ লান্টি এই নামে দীক্ষিত করেন। ও বরাবরই আমাকে বড় বোনের মতই জানে। কিন্তু আমার হৃদয়ে

একটি আশার ক্ষীণ আলো আমি নিবতে দিইনি···আমাদের আবার দেখা হবে আবার মিলবো তুমি আর আমি···আর তখন তুমি তোমার সন্তানকে স্বীকার করে তার জননীকে দেবে সহধর্মিণীর সম্মান।"

—"কিন্তু এখন তো তুমিই সে পক্ষ বন্ধ করেছো টেরেসা ?"

—"হায় রে, আমারি দুর্ভাগ্য ছাড়া কি বলি ? ডিউকের মৃত্যুর পর যখন আমি নেপল্‌সে আসি তখনও আমি বিত্তবান। আর তোমার ছেলেও বিশ হাজার টাকার মালিক। আমার আর পালেসির যদি কোনো সন্তান না হয় তবে আমার যা কিছু সবই ওর—"

আমাকে টেরেসা ওর শোবার ঘরে নিয়ে গেল। আলমারি খুলে দেখালে হীরা মুক্তা আরও নানা মূল্যবান রত্ন, তাছাড়া প্রচুর রূপার বাসন।

"সিজারিনোকে আমায় দাও টেরেসা—ওকে আমি দুনিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

—"না, না, না, অন্য কিছু বলো, আর কিছু চাও, আমার ছেলেকে নিয়ে নিও না। জানো, ভয়ে আমি কোনো দিন ওকে ভালো করে চুমা খাইনি। আচ্ছা বলো তো ভেনিসের লোক কি মনে করবে যদি দ্যাখে ক্যাসানোভা আবার কিশোর হোয়ে ফিরে এসেছে···"

—"তুমি কি ভেনিসে যাবে ঠিক করেছো ?"

—"হ্যাঁ, আর তুমি ?

—"রোম তার পরে নেপল্‌স।"

আমার জীবনে এক চরম সুখের দিন। আমার সিজারিনো··· হৃদয়ের অনেকখানি জায়গা জুড়ে নিলো সে আপন স্বভাবে···শুধু

সন্তানস্নেহে নয়। ওর দুষ্টুমিভরা স্বভাবে, ওর সরল কৌতুকের উচ্চ মধুর হাসিতে—ওর এক ঝলক দখিণ-হাওয়ার মত উচ্ছল প্রাণের খুশীতে···ও যে কী মায়া জড়ালো জানি না।

ওর 'হার্পসিকর্ড' বাজিয়ে মজার গান শোনানো কখনও ভুলবো না—ঘরশুদ্ধ লোকের হাসতে হাসতে দমবন্ধ হবার যোগাড়। আর টেরেসার দৃষ্টি শুধু আমার দিকে একবার আর সিজারের দিকে একবার···কি ভাষাভরা তন্ময় দৃষ্টি! অথচ ওরই মধ্যে দেখেছি ঘনিষ্ঠ হোয়ে বসে পালেসিকে মিষ্টি করে আদর করে বলছে—"যাদের সবচেয়ে ভালোবাসি তাদের সান্নিধ্যের চেয়ে স্বর্গসুখও বড় নয়···"

বিচিত্ররূপিণী! কিন্তু ওর ছলনার ব্যথা আমি বুঝি।

সুখের মুহূর্তগুলি আসে আর যায়···নিবিড় করে ধরতে গিয়ে শুধু তার রেশটুকু নিয়েই শান্ত হোতে হয়।

আমারও যাবার মুহূর্তটি ঘনিয়ে এলো এক অবাঞ্ছিত ঘটনায়। এক অকৃতজ্ঞ স্বল্পপরিচিতকে সাহায্যের বিনিময়ে পেলাম জুয়াচুরির অপবাদ। বিতৃষ্ণায় ফ্লোরেন্স ছাড়তে বাধ্য হোলাম।

কিন্তু যাবার আগে টেরেসার কাছে না গিয়ে পারলাম না। আর বিদায় মুহূর্তে আমাদের অশ্রুসজল নিবিড় আলিঙ্গন ওর স্বামী বেচারার চোখে যে সর্ষেফুল ফুটিয়েছিল, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে আমি রোমে। আমার কাছে কার্ডিন্যাল পাসিয়োনের নামেও একটি পরিচয়-পত্র ছিলো। সেখানি নিয়ে আমি দেখা করতে গেলাম ওঁর সঙ্গে। তিনি আমার পরিচয় পেয়ে আমার নিজের মুখ থেকে আমার পলায়নের কাহিনী শুনতে চাইলেন।

—"কিন্তু সে যে বিরাট কাহিনী", সবিনয়ে জানালাম।

—"ভালোই তো, আমি শুনেছি তুমি বলতে কইতে বেশ ভালো পারো।"

—"কিন্তু তাহলে আমি বরং এই মেঝের উপর বসেই বলি।"

—"না, না, তা কি হয় ? তোমার অমন দামী জামা কাপড় !"

একজন ভৃত্য একটি টুল এনে হাজির করলো। না আছে তার হাতল, না আছে ঠেসান দেবার জায়গা। প্রচণ্ড বিরক্তি আর অস্বস্তিতে জ্বলে উঠলাম। যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি আর দায়সারা গোছের করে গল্পটি বললাম পনেরো মিনিটের ভিতর।

—"তোমার বলার চেয়ে লেখার ভঙ্গী ভালো।"

—"আরাম করে না বসলে আমার কথা বলার জুত হয় না।"

—"কেন, এখানে তুমি আরাম পাচ্ছ না ?"

—"নাঃ বিশেষ করে আপনার এই টুলটা।"

—"তুমি তোমার স্বাচ্ছন্দ্যটাই বুঝি পছন্দ করো ?"

—"তা' করি।"

—"এই নাও প্রিন্স ইওজেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে আমার ভাষণ…এটা তোমাকে উপহার দিলাম। আশা করছি আমার লাতিনে কোন খুঁত পাবে না। হ্যাঁ, কাল দশটার সময় মহানুভব পোপ তোমাকে দর্শন দেবেন।"

বিদায়ের ইঙ্গিত বুঝে উঠে এলাম।

আমি পোপকে আগে জানতাম যখন তিনি পাদুয়াতে সামান্য একজন বিশপ ছিলেন। ওঁর পবিত্র পাদুকার পবিত্রতম ক্রশচিহ্নকে চুম্বন করতেই উনি আমাকে আশীর্বাদ করলেন। আর আমার সবিনয় নিবেদনের উত্তরে জানতে চাইলেন—রোমে উনি আমার জন্যে কী করতে পারেন।

—"এটুকু ব্যবস্থা করার চেষ্টা করুন, যাতে আমি নিরাপদে ভেনিসে ফিরে যেতে পারি।"

—"আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে রাজদূতের সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে তাঁর মত জানাবো।"

এরপর কিছুক্ষণ বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনায় দর্শনের সময় উত্তীর্ণ হোলে আমি বিদায় নিলাম।

কিছুদিন পরে রোম থেকে চলে যাবার সময় আর একবার পোপের দর্শনপ্রার্থী হোলাম। উদ্দেশ্য আমার প্রার্থনা মঞ্জুর কি না জানা। অবশ্য আমাকে উনি এমন সহৃদয়তায় অভ্যর্থনা করলেন যে আমি প্রায় অভিভূত। গদগদ চিত্তে জানালাম ভগবানের মূর্ত প্রতীক—পৃথিবীতে উনি ছাড়া আর কে? যে কোনো খৃষ্টানের জীবনে সবচেয়ে বড় উৎসব ওঁর দর্শন—সবচেয়ে বড় কামনা ওঁর সঙ্গ।...গর্বোজ্জল মুখের স্মিত প্রসন্ন হাসিটুকু আমার চোখ এড়ায়নি। একটি ঘণ্টা ধরে আমার সঙ্গে ভেনিস, পাদুয়া আর প্যারিসের গল্প করতে লাগলেন। খুব আগ্রহ দেখলাম ওঁর ঐ সব জায়গা ঘুরে আসতে। সব আলাপ আলোচনার শেষে আবার আমার প্রার্থনাটির কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম...অতি বিনীতভাবে। উত্তরে তিনি আশীর্বাদ জানিয়ে বললেন—"ঈশ্বরের কাছে নিবেদন কর বৎস। আমার প্রার্থনার চেয়ে তাঁর করুণার শক্তি অনেক বেশী।"

আর দু'টি দিন ছিলাম রোমে। তারপর কোন খেয়ালের বশে সোজা পাড়ি দিলাম ট্যুরিণে।

দশম অধ্যায়

কাউণ্ট এ, বি'র সঙ্গে পরিচয় হয় কাউণ্ট বোরোমিওর বাড়িতে। আর প্রথম দর্শনেই ভদ্রলোক আমাকে কী যে পেয়ে বসলেন জানি না। প্রায় দুবেলাই একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া তো করতেনই, মাঝে মাঝে বিশেষ প্রয়োজনে টাকাও ধার নিতেন···অবশ্য একদিন মনের আবেগে আমার কাছে স্বীকার করে ফেললেন যে, আমি না থাকলে ওঁকে না খেয়ে মরতে হোতো। সম্প্রতি এমন অর্থাভাব চলেছে। উনি স্পেনে কাজ করতেন, বিয়েও করেছেন ওখানে। ওঁর সহধর্মিণী?·· ওঁর মতে একটি বিদ্যুল্লেখা···বয়স এই পঁচিশ কি ছাব্বিশ। ভদ্রলোক আমাকে সাদর আমন্ত্রণ জানালেন মিলানে ওঁর বাড়িতে কিছুদিন থাকার জন্য। প্রত্যাখ্যান করাই উচিত ছিলো আমার, যখন জেনেছি পরিবারে সাচ্ছল্যের অভাব···কিন্তু স্বভাবের ধর্ম—সে যাবে কোথায়? ঐ স্পেনীয় বিদ্যুল্লেখাটিকে একবার প্রত্যক্ষ করবো না?···চিঠি পড়েছি যে টুকরো টুকরো কথার ফুলকি চমক্ জাগায় মনে··ছবি এঁকেছি ইংরেজ মেয়ের বোধশক্তি, স্পেনের নিবিড় অনুভূতি আর ফ্রান্সের লাবণ্য আর মাধুর্যে গড়া সেই বিদ্যুল্লেখা।

কিন্তু হায় রে কপাল—যোগফল মিললো না বরাতে। দেখতে মন্দ না, নেহাৎ ছোটোখাটো গড়ন আর তেমনি গম্ভীর। আমাকে যাবার আগে চিঠিতে জানিয়েছিলেন দু'টুকরো তাফেতা কিনে নিয়ে যেতে। ওখানে পৌছে তাঁকে যখন জানালাম যে হুকুম তামিল হোয়েছে, তখন মাত্র একটা শুষ্ক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ওঁর পুরুত ঠাকুরকে বলবেন আমাকে দামটা দিয়ে দেবে। খেতে বসে কাউণ্ট

এ, বি উচ্ছ্বসিত কিন্তু শ্রীমতীকে দেখলাম দারুণ গম্ভীর, মাঝে মাঝে আমাদের হাস্যকৌতুকের উত্তরে একটু মৃদুহাসির প্রত্যুত্তর। খাবারের থালা থেকে একটি বারও চোখ তুলতে দেখলাম না—অথচ প্রতিটি খাদ্যের অসংখ্য ত্রুটি ধরে অজস্র বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখলাম পুরুত ঠাকুরের উদ্দেশ্যে। অবশ্য এই ফাঁকে একটা কথা বলে রাখা ভালো—ইতালীতে প্রায় প্রতি বাড়িতেই একটা ক'রে পুরুত ঠাকুরের চলন। গৃহস্থের কাছেই তাদের খাওয়া শোওয়া সব চলে, বদলে ঘরকন্নার হাজার খুঁটিনাটির দায়িত্বও তাদের ঘাড়ে। এ বাড়ির পুরুত ঠাকুরটি কাছেই একটা গীর্জায় ভোরবেলা প্রার্থনা করাতে যান —ফিরে এসে সারাদিন সমস্ত সংসারটা চালাতে হয়, সেই সঙ্গে কর্ত্রীটিরও হাজারো ফরমাস।

খাবার পর কাউন্ট আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘর অবধি এলেন—স্ত্রীর নীরস ব্যবহারে বিব্রত, লজ্জিতও বটে, তবে আশ্বাসও দিলেন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হলে মাধুর্যের সন্ধান পাবো নিশ্চয়ই।

সে যাক্‌। আপাততঃ বাড়ির সেরা ঘরটি পেয়ে মনটা খুসী। বাড়ির আসল অবস্থা সত্যিই অভাবগ্রস্ত। বাসনপত্র মাটির, দাগলাগা টেবল-ঢাকা,—রাঁধুনী, ঝি, সবই একটি মেয়ে, পরিচ্ছদও জীর্ণ। আমার ফরাসী পরিচারক ক্লেয়ারমঁও তো তার শোবার আস্তানা দেখে ভেবেই আকুল—ছোট্ট, নোংরা, অন্ধকার খুপরী একটা।

ভোরবেলা বিছানা থেকে ওঠার আয়োজন করতে যাচ্ছি, এমন সময় পুরুত ঠাকুরের প্রবেশ। আমাকে অনুরোধ করলেন যে কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করলে আমি যেন বলি যে পুরুত ঠাকুরের কাছ থেকে আমি তিন শ' ফ্রাঙ্ক ঐ তাফেতার দাম হিসাবে পেয়েছি। আমার তো চক্ষু স্থির।

—"একজন পুরোহিত হোয়ে আপনি আমাকে মিথ্যা বলবার জন্যে অনুরোধ করছেন ? আশ্চর্য ! নাঃ বলতে হলে সত্যি কথাই বলবো"—

—"আপনি তাহলে গিন্নীমাকে চেনেন না মশায়···আর এ বাড়ির ধারাও কিছু জানেন না দেখছি। বেশ আমি কর্তার সঙ্গেই কথা বলবো তাহলে।"

পুরুত ঠাকুরের মত কাউণ্টকে দেখলাম শ্রীমতীর মেজাজের ভয়ে সদা শঙ্কিত। স্ত্রীর মিথ্যা দম্ভ বাঁচাবার জন্যে আমাদের মধ্যে দামটা ঠিক হয়ে গেছে বলতে রাজী হলেন।

ঘরে বসে কতকগুলি চিঠিপত্র লিখছি। দরজা ঠেলে ঢুকলেন স্বামি-স্ত্রী—তাঁদের একজন পারিবারিক বন্ধুর সঙ্গে আমার পরিচয় করাতে। ভদ্রলোকের নাম মার্শিস ক্রলৎসি, প্রায় আমারই সমবয়সী। অভিবাদন জানিয়ে বললেন আমার সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য এড়াতে চান না—তাছাড়া এই ঘরখানিতেই একমাত্র আগুন রাখার ব্যবস্থা, তার আরাম থেকে বঞ্চিতও হোতে চান না। ক্লেয়ারমঁও ইতিমধ্যে আমার বাক্সটাক্স খুলে জামাকাপড় জিনিসপত্র সব বের করে ফেলেছিলো—চেয়ারগুলোও প্রায় সবকটাই স্তূপীকৃত। তারমধ্যে মার্শিস্ কাউণ্টেসকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে ছোট্টো একটা পুতুলের মত নিজের হাঁটুর উপর বসিয়ে দিলেন। লক্ষ্য করলাম কাউণ্টেসের মুখ রাঙা হোয়ে উঠেছে—জোর করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন।

—"যথেষ্ট বয়স তো হয়েছে···তবু শিখলেন না আমাদের মত মহিলাদের সঙ্গে কি করে মান রেখে চলতে হয় ?"

—"ঠিক কথা কাউণ্টেস। মান্য করি বলেই তো আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসতে পারি নি"—

তারপর জামা-কাপড়ের স্তূপের দিকে চেয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কোন মহিলাকে আশা করছি কি না?

—"নাঃ, তবে আশা আছে. মিলানে এমন একটির সন্ধান. পাবো নিশ্চয়ই, যাকে এগুলি উপহার দিতে পারবো"—

সেদিন রাত্রে আহার্য থেকে সুরু করে আহার্য-পাত্রগুলি, মদ এমন কি টেবিল-ঢাকাগুলি অবধি এলো ঐ ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে। খেতে বসেও লক্ষ্য করলাম, মার্শিস অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন কাউণ্টেসের রুক্ষ গাম্ভীর্যের ত্রুটি শোধরাবার জন্যে। খাবার পর সকলে মিলে গেলাম অপেরা দেখতে—সুখবর মিললো সেখানে টেরেসার দর্শন পেলাম। ঠিক করলাম শীগগিরই যাবো ওর সঙ্গে দেখা করতে।

ভোরবেলা ক্লেয়ারমঁও এসে খবর দিলে, একটি মেয়ে দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে। সম্মতি পেয়ে ঘরে এসে ঢুকলো দীর্ঘাঙ্গী সুশ্রী লাবণ্যময়ী একটি তরুণী, আবেদন জানালো আমার জামা-কাপড় কাচা আর সেলাই-ফোঁড়াই ইত্যাদি করার ভার নেবার জন্যে। ভারী ভালো লাগলো ওকে,—"কোথায় থাক তুমি?"

—"এই বাড়িরই নীচের তলায় আমার মা-বাবার সঙ্গে।"

—"তোমার নাম?"

—"জেনোবিয়া।"

—"বাঃ! রূপের মতো নামটিও মিষ্টি। তোমার করপল্লবে চুম্বন জানাতে পারি?"

—"না, তা আর হয় না, এ করপল্লব আগেই অধিকৃত। এখানকার কার্ণিভেলের শেষেই একজন দর্জির সঙ্গে আমার পরিণয় স্থির।"

—"কেমন দেখতে তোমার ভাবী স্বামীটি? সুন্দর?…বেশ ভালো রোজগেরে তো?"

"না, না, কোনটাই নয়…শুধু নিজের একটি বাড়ি হবে এই আশাতে বিয়ে করছি।"

—"খুব ভালো বলেছো। ভারী খুসী হলাম শুনে। আমার যে তাকে দেবার মতোও কিছু কাজ আছে—যাও, গিয়ে ধরে নিয়ে এসো।"

আমার সজ্জা সমাপন হতে না হতেই জেনোবিয়া তার হবু বরকে ধরে নিয়ে এসে হাজির। ছোটখাটো মানুষটি সম্পূর্ণ বৈশিষ্ট্যহীন।

—"এই যে, আপনিই এই মিষ্টি মেয়েটিকে বিয়ে করছেন?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ মশায়! আর দিন দশেক পরেই বিয়েটা হবে।"

—"দিন দশেক, কেন? কালই বা নয় কেন?"

—"উঃ আপনার এত তাড়া?"

—"নিশ্চয়ই, অন্তত আপনার জায়গায় আমি তাই-ই করতাম। যাক, এই সিল্কটা দেখুন। কাল বল-নাচে যাবার জন্যে একটা 'ডোমিনো' করে দিতে হবে। তার জন্যে রইলো দশ সেকুইন—আপনার রশিদের টাকা হিসাবে।'…

লোকটা তো আহ্লাদে আটখানা হোয়ে চলে গেলো। একটু পরেই আমিও মিলানে টেরেসার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কেন জানি না টেরেসার প্রতি আমার একটা অতিকোমল মমতা ভরা ভালবাসা বরাবরই ছিলো…দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর সেটা বরং না কমে বেড়েই চলেছিলো।

আনন্দে অধীর হোয়ে টেরেসা আমাকে স্বাগত জানালো। অপ্রত্যাশিত ভাবে আবার দেখা হওয়ার আনন্দে আবেগে ও ভালো

করে কথাই বলতে পারছিল না। একটু প্রকৃতিস্থ হোয়ে প্রথমেই জানালো ও আর স্বামীর সঙ্গে থাকে না। অসহ্য হয়ে উঠেছে স্বামীর সঙ্গ। টেরেসা অবশ্য স্বামীকে অর্থ সাহায্য করে, তবে এক সর্তে যে, তাকে রোমেই থাকতে হবে। সিজারো এসেছে ওর সঙ্গে মিলানে। টেরেসা কথা বলে যাচ্ছিল আর আমি মনে মনে বিশ্লেষণ করছিলাম আমার নিজের অনুভূতি। আজ আঠারো বছর ধরে টেরেসার' প্রতি আমার ভালোবাসা কোথাও মলিন কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি···কিন্তু আজ আমার মনের গঠন এমন হোয়ে দাঁড়িয়েছে যে একটির উদ্দেশ্যেই সর্বস্ব অঞ্জলি দিয়ে শূন্য হোতে আর পারে না। মনের বেদীতে একম্ অদ্বিতীয়মের পূজায় সে নারাজ।

সেদিন বাড়ি ফিরে খাবার টেবিলে দেখলাম কাউন্টেসের মেজাজটা বেশ খুশী খুশী···এমন কি আমার দীর্ঘ অনুপস্থিতে রহস্য করে বললেন—

—"সারাটা দিন কাটলো কোথায় জানি না ভেবেছেন? কিন্তু শ্রীমতীর যে একটি শ্রীমান আছেন, আপনার এত ঘন ঘন যাতায়াতে তিনি না সরে পড়েন।"

—"সরলেই সেই শূন্য জায়গা পূর্ণ করবো।"

"আপনার উপহারে যারা বিগলিত হয়ে পড়ে, তাদের কাছেই শুধু আপনি দাসত্ব স্বীকার করেন।"

—"ঠিক বলেছেন, পারতপক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম করি না··· কারণ দেখেছি এই পন্থাটি অবলম্বন করলে আর কিছুতেই হতাশ হতে হবে না"—

"কিন্তু আপনার বান্ধবীটির মনের খবর জানেন বলে মনে হচ্ছে না তো···অত্যন্ত অর্থলোভী ছাড়া আর কেউ পারে গ্রেপ্পির সঙ্গিনী হতে?"

আর কাউন্টেস সোজা বক্সের দিকে। সে রাত্রে প্রচণ্ড হার হোলো আমার। ফেরার পথে আবার কাউন্টেসের সঙ্গে খিটিমিটি বাধলো—

—"আজ রাতে অনেক টাকা হেরেছেন শুনলাম···বেশ হোয়েছে, খুব খুশী হোয়েছি। মার্শিস হাজার সেকুইন দিতে রাজী আপনাকে ঐ পোষাকটার জন্যে। বেচতে পারেন এখনও, বরাত খুলে যাবে।"

—"আপনার বরাতও খুলে যেতে পারে তো। ওটা লাভ হবে কেমন—আপনার জন্যেই যে উনি কিনতে চেয়েছেন সেটা আমি জানি।"

—"হয়তো।"

—"না, অত সহজে আপনি ওটা পাচ্ছেন না। ওটা পাবার একমাত্র উপায় আমার কথায় রাজি হওয়া। না হলে আপনাদের টাকার জন্যে আমার থোড়াই কেয়ার।"

এই রকম সুমধুর বাক্য বিনিময় করতে করতে আমরা বাড়ি পৌছলাম। কাউন্ট আমার ঘরে ঢুকলেন আমাকে একটু বোঝাতে। আমার জুয়ায় হেরে যাওয়াটাই ওঁর লাগে বেশী।

—"ক্রুলংসি আপনাকে হাজার সেকুইন দিতে রাজী। তাতেও তো আপনার খানিকটা আয় হবে।"

—"ঐ লোমের পোষাকটার জন্যে? ওটা তো আপনার স্ত্রীকে আমি বিনা পয়সায় দিতে রাজী। কিন্তু আমার কাছ থেকে উনি নেবেন না।"

—"অবাক কাণ্ড মশাই। অথচ বলতে কি পোষাকটার জন্যে ও ক্ষেপে উঠেছে। নিশ্চয়ই আপনি ওর আত্মসম্মানে ঘা' দিয়েছেন কোন সময়। আমার উপদেশ নিন ওটা ক্রুলংসিকে বেচে ফেলুন।"

—"ভেবে দেখবো, কাল আপনাকে সঠিক জানাবো।"

ভোরে উঠেই গ্রেপ্পির কাছে গেলাম। হাজার সেকুইন বার করে আনলাম ব্যাঙ্ক থেকে। আর গ্রেপ্পিকে জানালাম এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু না জানাতে। বাড়ি ফিরে এসে দেখলাম কাউণ্ট আমার ঘরে আগুনের ধারটিতে বসে অপেক্ষা করছেন।

—"কি ব্যাপার বলুন তো মশাই? আমার স্ত্রী আপনার উপর ভয়ঙ্কর রেগে আছে অথচ কিছুতেই কারণটা খুলে বলছে না—"

—"কারণটা আর কিছুই নয়। ওই লোমের পোষাকটা আর কারো হাত থেকে ওঁকে আমি নিতে দেবোনা, আমার হাত থেকে ছাড়া। উনিও নেবেন না। কিন্তু এতে ভয়ঙ্কর রাগের কি আছে?"

—"হুঁঃ স্রেফ বোকামি ছাড়া কিছু নয়। শুনুন আমার কথা, আপনার ধরণ দেখে মনে হয় টাকা আপনার হাতের ময়লা…এরকম মনে হওয়া খুবই ভালো। তবে কি না ঐ টাকাটা পেলে আমি বড় খুশী হতাম। বন্ধুত্বের খাতিরে ওসব আত্মসম্মান ছাড়ুন মশাই… মার্শিস এর কাছ থেকে হাজার সেকুইন নিয়ে আমাকে ধার দিয়ে ফেলুন"—

ওঁর কথায় প্রবল হাসির দমকে আমার বিষম খাবার যোগাড়। বেচারা কাউণ্ট অপ্রস্তুত হোয়ে লজ্জায় লাল হয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে যেতে গেলেন। আমি ওঁকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম অবশ্য একটু জ্বালাভরা কণ্ঠেই।

—"বেচারা, কথা দিলাম ক্রলৎসিকেই বেচবো ওই পোষাকটা। কিন্তু টাকাটা আপনাকে ধার দেবোনা। ওটা দান করবো আপনার স্ত্রীকে। কিন্তু মনে রাখবেন তাঁকে সহজ নম্র শোভন হতে হবে—

এই সর্তে। বুঝতে পেরেছেন তো? এখন এই ভাবে ব্যবস্থা করতে পারেন"—

—"তাই দেখি"—বলে বেচারা কাউন্ট বিদায় নিলেন।

সেইদিন সন্ধ্যায় অপেরাতে ক্রলৎসির সঙ্গে দেখা করলাম…সে বললে,—"শুনলাম আপনি নাকি ওই লোমের পোষাকটা আমাকে বিক্রী করতে রাজী হোয়েছেন। সত্যি আমি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে। আপনি যখনি বলবেন তখনি আপনাকে পনেরো হাজার ক্রাঙ্ক পাঠিয়ে দেবো"—

—"কাল সকালেই আপনি লোক পাঠাতে পারেন পোষাকটা নিয়ে যাবার জন্যে।"

পরদিন সকালেই ওর লোক এলো। এসে এত আলোচিত পোষাকটি নিয়ে গেল। দুপুরে উনি নিজেই এলেন আমাদের সঙ্গে একত্রে খাবার জন্যে। তার আগে প্রচুর সুখাদ্য আহার্য পাঠিয়েছিলেন। খাবার টেবিলে রীতিমতো আড়ম্বর সহকারে বাক্সটি রেখে তার থেকে পোষাকটি বের করে গর্বিত আনন্দে ওই দর্পিতা স্পেনীয় মাহলাটিকে উপহার দিলেন। আর তিনি ধন্যবাদে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলেন। আর ভদ্রলোক এমনভাবে হাসতে লাগলেন যে এসব ব্যাপারে তিনি অতি অভ্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ বলে বসলেন যে কাউণ্টেস যদি সত্যিই বুদ্ধিমতী হ'ন তবে ঐ পোষাকটি আবার বিক্রী করে ফেলবেন—কারণ সবাই জানে যে অত দামী পোষাক কেনার মত আর্থিক সঙ্গতি ওদের নেই। কথাটা অত্যন্ত শ্রুতিকটু সন্দেহ নেই—তাই এবার ধন্যবাদের বদলে কটুবাক্যের বর্ষণ সুরু হোলো। শেষে রাগের জ্বালায় কাউণ্টেস বললেন যে মার্শিস এত বড় বোকা যে এমন উপহার দিলে যা তিনি ব্যবহার

করতে পারবেন না। এই ঝড়ের মধ্যেই একটি প্রতিবেশিনীর আগমন হোলো। ঘরে ঢুকেই টেবিলের উপর ছড়ানো বহুমূল্য পোষাকটির দিকে নজর পড়লো তাঁর—

—"ভারী চমৎকারতো। আমার কিনতে ইচ্ছে করছে।"

—"ওটা বিক্রী করে দেবার জন্যে কেনা হয়নি"—রুক্ষ উত্তর কাউণ্টেসের।

ব্যাপার সুবিধার নয় দেখে মহিলাটি তৎক্ষণাৎ প্রসঙ্গান্তরে উপস্থিত হলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি বিদায় নিলেই আবার সেই চাপা আক্রোশের বিস্ফোরণ সুরু হোলো। কাউণ্টেসের সক্রোধ কুৎসিত বাক্যবাণের উত্তরে ক্রুল্‌ৎসিও তীব্র, তীক্ষ্ণতম শ্লেষে তাঁকে বিধতে লাগলেন···কিন্তু ওঁর প্রত্যেকটি সুতীক্ষ্ণ শ্লেষভরা বাক্যবাণই আশ্চর্য ভদ্রয়ানার খাপে ঢাকা···শেষকালে বিপর্যস্ত ক্লান্ত অবস্থায় রণে ভঙ্গ দিয়ে কাউণ্টেস সোজা চলে গেলেন শয্যার আশ্রয়ে শয়ন কক্ষের অভিমুখে।

ক্রুল্‌ৎসি আমার হাতে পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক গুঁজে দিয়ে উঠে চলে গেলেন। সবাই চলে গেলে কাউণ্ট আমাকে ধীরে ধীরে বললেন যে, যদি আমার হাতে সময় থাকে আমি যেন ওঁর স্ত্রীকে একটু সঙ্গ দিই কারণ ওঁরও হাতে কয়েকটা জরুরী কাজ রয়েছে।

—"দেখুন আমার পকেটে হাজার সেকুইন রয়েছে, যদি কাউণ্টেস একটুও বুঝদার হন তবে সব টাকাটা ওঁকে দিয়ে আসবো।"—

উঠে ঘরে গিয়ে ক্রুল্‌ৎসির দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি রেখে ব্যাঙ্ক থেকে আনা নোটের তাড়াটি পকেটে পুরলাম। ছেলেমানুষি ছাড়া কি? দেখাতে চাইলাম কারো টাকাতেই আমি নির্ভর করি না, আমার নিজের যথেষ্ট আছে।

দেখলাম কাউন্টেস শয্যালীনা। তাঁর একপাশে বসে অত্যন্ত কোমলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম শারীরিক সুস্থতা সম্বন্ধে, বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সম্বন্ধে দু'একটা মন্তব্যও করলাম।

—"আপনি বাইরে বেরোননি? ঘরোয়া পোষাক পরে রয়েছেন? চুলগুলোও আঁচড়ানো নেই?"

—"সম্ভব হলে আপনার সঙ্গেই সময় কাটাবো ভাবছি," আমার উত্তর।

"আপনার জুয়ার আড্ডা ছেড়ে আমার সঙ্গে সন্ধ্যাটা মাটি করবেন?"

—"আনন্দের সঙ্গে। ইতিমধ্যে অনেক টাকা হেরেছি তার উপর আজ মার্শিস-এর কাছ থেকে যা পাওয়া গেল সেটাও আর খোয়াতে রাজী নই...আমার হাত থেকে তো আর নিলেন না..."

—"অত টাকা হাতছাড়া করা সহজ?"

—"হাতছাড়া নয়, আমি তো আপনাকেই দিতে চেয়েছিলাম। সে যাক, বড্ড ঠাণ্ডা আসছে, দরজাটা বন্ধ করে দেবো কি?

—"নাঃ, আমার খোলাই ভালো লাগছে—খোলা থাক।"

—"তাহলে মাদাম, এখান থেকেই বিদায় নিতে হলো। আমার ঘরের আগুনের ধারটি অনেক বেশী লোভনীয়।"

—"আপনি লোকটা খুবই খারাপ তবুও বসতে পারেন কিছুক্ষণ কারণ মন্দ লাগছে না সময়টা।"

কি জানি কেন মনটা কেমন অন্যমনস্ক আর বিস্বাদ হোয়ে গিয়েছিলো—পোষাকটা নিয়ে এত কচকচিতে আসার সময় ঘরে দেখে এসেছি জেনোবিয়ার মিষ্টি হাসিভরা সুন্দর মুখখানি ঝুঁকে পড়ে আমার জামা সেলাই করছে...তার সেই মুখখানি মনে পড়াতে? কি জানি কিছুতেই ঢাকতে পারিনি নিজের অস্বাচ্ছন্দ্য, সাড়া দিতে

পারিনি সহজ শোভন ভাবে···কি জানি কতখানি আঘাত করলাম দর্পিতা রমণীর আত্মগর্বে···

আমার নীরস ব্যবহার ওঁকে কতখানি গভীর ব্যথা দিয়েছে তা' শুধু মেয়েরাই বলতে পারবে···জানি না কোন দুর্গ্রহ আমাকে দিয়ে বলালে,—"আমার দোষ নেই মাদাম, আপনার সৌন্দর্য আমাকে একটুও আকর্ষণ করতে পারছে না···এই রইলো পনেরো হাজার ফ্রাঙ্ক আপনাকে সান্ত্বনা দিতে···আমি চললাম"—

টেবিলের উপর নোটগুলি রেখে সোজা বেরিয়ে এলাম। অন্যায় অপ্রীতিকর সবই বুঝছিলাম কিন্তু কে যেন জোর করে অমন করালে আমাকে।

কিন্তু পরদিন খাবার টেবিলে কাউণ্টেসের ব্যবহারে আমি অবাক্, অনুতপ্ত, লজ্জিত। যেমন মধুর, তেমনি ভদ্র তেমনি শোভন সংযত। বিবেকের দংশন-জ্বালা সহ্য করলাম···কেন রাত্রে অমন করে অপমান করেছি। যেমনি ওঁকে একা পেলাম তখনি অনুতপ্ত কণ্ঠে স্বীকার করলাম কাল রাত্রে অমন দুর্বৃত্তের মত ব্যবহারের জন্য ওঁর আমাকে ঘৃণা করা উচিত।

—"দুর্বৃত্ত আপনি? বরং উল্টোটাই আমি ভেবেছি, আমি তো আপনার কাছে রীতিমত কৃতজ্ঞ···ভাবতেই পারি না আপনার এ আত্মগঞ্জনা কেন?"

আমি ওঁর হাতখানি ধরে ধীরে ধীরে আমার ওষ্ঠের কাছে আনতেই হঠাৎ উনি ঝুঁকে পড়ে আমার গালের উপর চুমো খেলেন··· আমি তখন লজ্জায় রাঙা, অনুতাপে দিশাহারা···

সেরাত্রে অপেরাতে মুখোশ পরে 'বল' এর ব্যবস্থা ছিলো। আমি এমনভাবে সেজেছিলাম যে, ভাবলাম কেউ আমাকে চিনতে

পারবে না। আমার নস্যির কৌটা, ঘড়ি, এমন কি মণিব্যাগটাও বদলে ফেলেছিলাম। আর মণিব্যাগটাতে ছিলো প্রায় সাতশ' সেকুইন। জুয়ার আড্ডায় সর্বস্ব তো খোয়ালাম একঘণ্টার মধ্যেই। সবাই আশা করেছিলো এবার নিরস্ত হবো। কিন্তু আর এক পকেট থেকে আর একটা ব্যাগ বার করে আবার খেলতে স্থরু করলাম—এবার বরাত খুললো, একেবারে দুহাজার আটশ' ছাপ্পান্ন সেকুইন জিতলাম।

সেদিন বাকী সময়টুকু নাচ, গান আর হুল্লোড়ের ভিতর দিয়ে কাটিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলাম কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিতে। কারণ তারপরই সবাই মিলে যেতে হবে জেনোবিয়ার বিবাহোৎসবে যোগ দিতে। আমাদের সঙ্গে ক্রুলৎসিও গিয়েছিলেন। গ্রামের বাড়িতে ওদের বিবাহের ভোজসভা আমরা সবাই গান গেয়ে আবৃত্তি করে মুখর করে তুললাম। প্রচুর আহার্যের আয়োজন, সবার অলক্ষ্যে ভোজসভার ব্যয়ভারটা আমিই বহন করেছিলাম। বহু গ্রাম্য স্থন্দরীর আবির্ভাব হোয়েছিলো, কিন্তু শ্রীময়ী বধূবেশিনী জেনোবিয়ার সঙ্গ আমি একমুহূর্তও ছাড়িনি। উৎসব যখন চরমে তখন উৎসবমত্ত অবস্থায় সবাই টেবিল ছেড়ে উঠে পার্শ্ববর্তীর সঙ্গে আলিঙ্গন আদান প্রদান করতে লাগলো…আমি আড়চোখে দেখে নিলাম বরবেশী বিহ্বল দর্জিটির চুম্বনে কাউন্টেসের মুখখানি বিরক্তি আর রাগে টক্টক্ করছে…

বিবাহের শেষে জেনোবিয়াকে আমার গাড়ীতেই তুলে নিলাম…ওর সদ্য স্বামীর সাগ্রহ সম্মতিতে।

* * * *

পরদিন রাত্রে আবার গেলাম অপেরাতে। জুয়া খেলাতেই কাটতো সন্ধ্যাটা কিন্তু হঠাৎ দেখা হোয়ে গেলো সিজারোর সঙ্গে।

আমার সিজারিনো? দুটি ঘণ্টা ওর সঙ্গে আলাপে কাটলো…কি মনভরা সময়টুকু। ওর মনের সব কথা আমার কাছে উজাড় করে দিলে। বারবার অনুরোধ করলে আমি যেন ওর হোয়ে টেরেসার সঙ্গে আলোচনা করি। ব্যাপারটা কিছুই নয়…ওর সাধ নাবিক হবার, ওর নিশ্চিত ধারণা যে ওর মা যদি ওকে আপাততঃ প্রয়োজন মত টাকা দিয়ে সাহায্য করে ওর ভবিষ্যৎ ও নিজে গড়ে তুলবে। আমি কথা দিলাম টেরেসাকে রাজী করাবো। সেদিন রাত্রে ওর সঙ্গে একসঙ্গেই খেলাম। বাড়ি এসে সোজা বিছানায়। পরদিনও সারাদিন ঘর থেকে আর বেরোইনি। শুনলাম কাউণ্ট গেছেন সান এঞ্জেলোতে। মাদাম একা আছেন। সাধারণ ভদ্রতাবোধেই রাত্রে খাবারের পর মাদামের সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম, খাবার টেবিলে যোগ দিতে না পারার জন্য ক্ষমাও চাইলাম। কাউণ্টেসের ব্যবহার আশ্চর্য সৌজন্যে ভরা। ওঁর বাড়িতে আমার কোনো লৌকিকতার প্রয়োজন নেই, যেমন খুশী তেমনি ভাবে থাকতে পারি। কিন্তু আমার মনে হোলো ভিতরে ভিতরে কোনো প্যাচ খেলছেন। কারণ ওঁর মুখে কেমন এক মোহময় হাসির আভাস অমন হাসি শুধু সেই মেয়েরাই হাসতে পারে, যাদের মনে জ্বলছে প্রতিহিংসার অনির্বাণ শিখা। আমার মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে আমার দিকে নস্যির কৌটোটা বাড়িয়ে দিলেন এক টিপ নেবার জন্যে। নিজেও নিলেন একটিপ।

—"কিন্তু মাদাম এটা কি বলুন তো? এ তো ঠিক নস্যি নয়?"

—"না, একরকম গুঁড়ো, মাথা ধরার পক্ষে অব্যর্থ। তবে নাক দিয়ে রক্ত পড়ে নিলেই।"

আমি কি রকম অপ্রস্তুত বোধ করতে লাগলাম। জোর করে হেসে বললাম, "আমার মাথার রোগ নেই, তাছাড়া নাক দিয়ে রক্ত পড়াটা আমার একটুও ভালো লাগবে না।"

—"ভয় নেই বেশী রক্ত ঝরবে না।" তখনও সেই মোহময় হাসির টুকরো ঠোঁটের কোণায়—কিন্তু রক্ত ঝরবেই এটা ঠিক।"

বলতে না বলতেই দুজনে একসঙ্গে চার পাঁচবার হেঁচে ফেললাম—টপ করে একফোঁটা রক্ত আমার নাক থেকে পড়লো আমার হাতের উপর। কাউণ্টেস একটি রূপার বাটি নিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

—"সরে আসুন কাছে, আমারও নাক থেকে রক্ত পড়ছে।" কাউণ্টেস বললেন। দু'জনে কাছাকাছি এগিয়ে এসে বাটির উপর ঝুঁকে পড়লাম। দু'জনার নাক থেকেই বাটিটাতে রক্ত ঝরতে লাগলো। অবশ্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই থেমেও গেল। তখন অন্য আর একটা পাত্র আনিয়ে ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম।

—"আমাদের রক্তের এই মিলন আমাদের দু'জনার মনে গভীর দরদ জাগাবে, হয়ত এমন নিবিড় বন্ধুত্বের বন্ধন সৃষ্টি করবে যার বিচ্ছেদ মৃত্যুর আগে নেই,"...কাউণ্টেস ধীরে ধীরে বললেন।

আমি ওঁর কথায় বিশেষ মন দিইনি। আমি একটু গুঁড়ো চাইলাম কিন্তু উনি কিছুতেই দিতে রাজী হোলেন না আর নামটাও বললেন না কোনো মতে। শুধু বললেন ওঁর এক বন্ধু ওঁকে দিয়েছে। আমি তখনি বেরোলাম একজন ওষুধ প্রণেতার খোঁজে। একজনকে খুঁজে পেলাম। গুঁড়োটার পূর্ণ বিবরণ দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ওটা কি হোতে পারে, কিন্তু কোনো সদুত্তর তো দূরের কথা আমার চেয়ে বেশী জানেন বলে মনে হোলো না। বাড়ি ফিরে

ভারাক্রান্ত মনে বিছানায় গিয়ে শুলাম। নানা ভাবে চিন্তা করতে মনে হোলো মাদাম স্পেনের মেয়ে—তার উপর যতই ভাল এখন দেখান, অন্তরে আমার প্রতি ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই নেই··· অতএব—

পরদিন ক্লেয়ারমঁও একসময় এসে জানালে যে একজন সন্ন্যাসী আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে—কিছু কথা বলতে চায়। আমি কিছু সাহায্য দিয়ে ভাগিয়ে দিতে বললাম। কিন্তু সন্ন্যাসী এক-পয়সাও সাহায্য চায় না, কেবল আমার সঙ্গে একা দেখা করতে চায়। গেলাম দেখা করতে। লোকটি বেশ বৃদ্ধ। ঈষৎ নীচু হোয়ে অভিবাদন জানিয়ে একটা নীচু টুল এগিয়ে দিলাম। কিন্তু সে ওসব গ্রাহ্যই না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলতে লাগলো।

—"মশায়, আমি যা বলবো মন দিয়ে শুনবেন। আমার সাবধান করায় আপনি কান না দিলে, আপনার প্রাণহানির আশঙ্কা আছে। আমার কথা সমস্তটা শোনা হোলে আমি যা বলবো ঠিক তাই করবেন। কিন্তু একটি প্রশ্নও আমাকে করবেন না—কারণ কোনো কথারই আমি উত্তর দেবোনা। আপনি নিশ্চয় মানবেন যে আমার এই নীরবতা বিশ্বস্তভাবে বিশ্বাসের মর্যাদা দেবার জন্যেই! আমার প্রতিজ্ঞায় আমার কথায় সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ আপনাকে খুঁজে বার করার মধ্যে আমার কোনো স্বার্থই নেই। আমি নিজেই বাধ্য হচ্ছি আপনাকে জানাতে। আমার স্থির বিশ্বাস যে আপনার জীবন দেবতাই আমাকে দিয়ে আপনার মুক্তির উপায় দেখিয়ে দিচ্ছেন। ঈশ্বর আপনাকে ত্যাগ করেননি। এখন বলুন আমার কথায় আপনার মনে বিন্দুমাত্রও সাড়া জাগছে কি না, আমার সব কথা আপনি বিশ্বাস করে শুনবেন কি না।"

—নিশ্চিত থাকুন মহানুভব, আপনার প্রতিটি কথাই আমি মন দিয়ে শ্রদ্ধাভরেই শুনবো। বলুন···আপনার কথা শুধু সাড়া জাগায়নি, সারা মন ছেয়ে এক অজানা আশঙ্কাও জাগিয়ে তুলেছে। আমি প্রতিজ্ঞা করছি আপনার উপদেশ মানবো—যদি অবশ্য আত্মসম্মানে 'ঘা' না লাগে, আর সাধারণ বুদ্ধির অগম্য না হয়"—

—"খুব ভালো। কিন্তু আপনাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, এ ব্যাপারটার ফলাফল যাই হোক না কেন, আমাকে তার মধ্যে টানতে পাবেন না, আর আমার সম্বন্ধে কারো কাছে একটি কথাও উচ্চারণ করবেন না। আমাকে চেনেন তাও বলবেন না, চেনেন না তাও জানাবেন না। কেমন, রাজী?"

—"খুব। প্রতিজ্ঞা করছি কথা রাখবো। কিন্তু এবার সুরু করুন। কৌতূহল যে অসহ্য হোয়ে উঠছে"—

—"আজ দুপুরে আপনি একেবারে একা অমুক পার্কের সামনে অমুক রাস্তায় অমুক নম্বরের বাড়িতে ঢুকবেন। তিন তলায় উঠে গিয়ে বাঁ দিকের দরজায় বোতাম টিপবেন। যে দরজা খুলতে আসবে তাকে বলবেন যে আপনি মাদাম—কে চান। আপনার তারপর বাড়ি ঢুকতে কোনো বাধাই হবে না···মনে হয় আপনার নামও বোধহয় কেউ জিজ্ঞাসা করবে না। যদিই জিজ্ঞাসা করে যাহোক বাজে একটা নাম বলবেন। যখন মাদাম-এর সঙ্গে দেখা হবে তখন খুব ভদ্র আর সংযতভাবে আলাপ করবেন—চেষ্টা করবেন তার বিশ্বাস অর্জন করতে। মহিলাটি গরীব, তাকে দু'চারটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে কুণ্ঠিত হবেন না—তাতেই তাকে জয় করা সহজ হবে। তখন তাকে বলবেন যে, কাল রাতে একজন চাকর এসে একটি চিঠি আর একটি ছোটো বোতল যা দিয়ে গেছে—সেই

বোতলটি না নিয়ে আপনি বাড়ি থেকে নড়বেন না। মহিলাটি রাজী না হওয়া অবধি ছাড়বেন না কিন্তু সাবধান বেশী গোলমাল চেঁচামেচি না হয়। তাকে ঘর থেকে বেরোতে কিম্বা কাউকে ডাকতে যেতে দেবেন না। দরকার হোলে বলবেন যদি বোতলটা আপনাকে দিয়ে দেয় তাহলে অপরপক্ষ যা টাকা দেবে তার দু'গুণ বেশী টাকা আপনি দেবেন। ভয় নেই, টাকার অঙ্ক এমন কিছু বেশী নয়···কিন্তু আপনার জীবনটা অনেক বেশী মূল্যবান। ব্যস্, আর কিছুই আমার বলবার নেই। এখন কথা দিন আমার কথা আপনি ঠিক ঠিক রাখবেন ?"

—"বিশ্বাস করুন নিশ্চয়ই রাখবো। আমার জাবন-দেবতা সত্যিই আপনার মত মহানুভবকে আমাব কাছে পাঠিয়েছেন···সঙ্কট থেকে ত্রাণের উদ্দেশ্যে।"

—"তাই হোক, ঈশ্বর তোমাকে আশীর্বাদ করুন"—

সন্ন্যাসীর ওই অদ্ভুত আষাঢ়ে কাহিনীতে কিন্তু আমার একটুও হাসি পেল না। কেন জানিনা আমার মনের কোণে কোথাও একখানি ছোট্টো কুসংস্কারের মেঘ আছে, হাজার আলোর ঝড়েও তা' সরেনা···। তাছাড়া সন্ন্যাসীব চেহারাটাও বিশ্বাসযোগ্য, দেখলেই মনে হয় অত্যন্ত সাধুপ্রকৃতির।

ঠিকানা-লেখা কাগজটা নিলাম আর দুটো ছোটো পিস্তলও পকেটে ভরলাম। তারপর সেই রহস্য-কুঠির সন্ধানে যাত্রা করলাম। ক্লেয়ারমঁকেও সঙ্গে নিয়েছিলাম। কিছু দূরে ওকে অপেক্ষা করতে বলে আমি সোজা সেইখানে গেলাম।

এক অতি কুৎসিত-দর্শনা বৃদ্ধার সামনে শেষপর্যন্ত হাজির হলাম। তার হাতে দুটি সেকুইন দিতেই সে খনখনে গলায় বলে

উঠলো যে সে জানে আমি প্রেমে পড়েছি, জানে যে নিজের দোষেই আমি নিজে অসুখী আর আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতেও সে পারবে। এই ধরনের কথায় মনে হোলো এ নিশ্চয়ই যাদুকরী ডাইনী ধরনের স্ত্রীলোক। কিন্তু আমি যেই বললাম যে সেই ছোটো বোতোলটি না পেলে আমি এক পাও নড়বো না, তখন তার মুখখানা কী বীভৎস আর ভয়ঙ্কর হোয়ে উঠলো ধারণা করা যায় না। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ও ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলে—তৎক্ষণাৎ আমি আমার পকেট-ছুরিটি বার করে ওর মাথার উপর তুলে ধরলাম। আর সেই অবস্থায়ই যেই বললাম অপরপক্ষের চেয়ে দুগুণ টাকা বেশী দেবো সঙ্গে সঙ্গে ওর সমস্ত বিক্ষোভ শান্ত হোয়ে গেল।

—"আমি ছয় সেকুইন হারালাম, কিন্তু আপনি যখন সব জানবেন খুশীমনেই ওর দুগুণ টাকা আমাকে দেবেন। কারণ এবার আমি আপনাকে চিনতে পারছি।"

—"কে আমি ?"···

"জিয়াকোমো ক্যাসানোভা দি ভেনেসিয়ান।"

তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে বারোটি সেকুইন বার করে টেবিলের উপর রাখলাম। দেখলাম খুশীতে বৃদ্ধার চোখে জল এসে গেছে।

—"আপনার জীবনহানি করতে চাইনি তবে প্রবলভাবে প্রেমে পড়িয়ে প্রচণ্ড দুঃখ ভোগ করাতে চেয়েছিলাম।"

—"খুলে বলুন সব কথা।"

আমি ওর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছোটো ঘরে গিয়ে ঢুকলাম—বিচিত্র অদ্ভুত সব জিনিসে ঘরখানি ভরা—নানা আকারের নানা ধরনের শিশি বোতল, নানা রঙের পাথর, ধাতু, নখ—বিভিন্ন প্রাণীর, সাঁড়াশী, উনুন আর রাশীকৃত বীভৎস মূর্তি।

—"এই আপনার বোতল।"

—"এতে কি রয়েছে?"

—"আপনার আর কাউন্টেসের রক্ত একসঙ্গে মেশানো আছে। এই লেখাটা পড়ুন, বুঝতে পারবেন।"

এতক্ষণে বুঝলাম ব্যাপারখানা কি। আজ অবাক লাগে ভাবতে সেদিন সেই মুহূর্তে কেন উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠিনি। বরং তার বদলে ওই অতি শয়তানী স্পেনিয়ার্ডটার কথা মনে করে আমার চুলগুলো খাড়া হোয়ে উঠেছিলো···আর বিন্দু বিন্দু ঘামে আমার সর্বাঙ্গ ভিজে গিয়েছিলো।

—"এই রক্ত দিয়ে আপনি কি করতেন?"

—"আপনার সর্বাঙ্গে মাখাতাম। কেমন করে দেখবেন? এই দেখুন।"

এই বলে একটা দু' ফুট লম্বা বাক্স টেনে এনে টেবিলের উপর রাখলো। তারপর একটু রহস্যময় হাসি হাসতে হাসতে বাক্সের ডালাটি খুলে ধরলে। আমি ঝুঁকে পড়তেই দেখি আধ হাত লম্বা একটা মোমের তৈরী নগ্ন মূর্তি উপুড় করে শোয়ানো···আর···আরে এ কি! তার পিঠের উপর পরিষ্কার করে লেখা আমার নাম।

কিন্তু কি অপটু কাঁচা হাতে কুৎসিত অদ্ভুত-দর্শন হোয়েছে মূর্তিটি! তবে আমার চেহারার আদলটা মোটামুটি এনেছে। কিন্তু কয়েকটি জায়গা এত সামঞ্জস্যহীন বিকৃতভাবে গড়া হোয়েছে যে ওই বেঢপ সঙের মত মূর্তিটা আমার ভাবতেই আমি হো হো করে চেঁচিয়ে হেসে উঠলাম—

হাসছেন? বেশ, হাসুন যত খুসী, ডাইনী বিড়-বিড় করে বলতে লাগলো—কিন্তু ওই মোমের মূর্তিটিকে যদি রক্তে ধুয়ে দিতাম তবে

আপনার কি সর্বনাশ হোতো দেখতেন। ও-সব মন্তর-তন্তর আমি ছাড়া এই তল্লাটে জানে আর কেউ? একটা মন্তর পড়ে যদি ওই মূর্তিটাকে আবার আগুনে ফেলতাম, তাহলে তো সর্বনাশের কিছু আর বাকী থাকতো না।

—হুম্, কিন্তু আপাতত তো এটা আমার অধিকারে। এই রইলো আপনার বারো সেকুইন। এবার একটু আগুন জ্বালান, এই বিকট মূর্তিটাকে পোড়াই—আর ওই বোতলের রক্তটা জানালা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিই।

বৃদ্ধা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো মনে হোলো মূর্তিটাকে গলিয়ে ফেলাতে। ও ভয় পেয়েছিলো বিষম। ভেবেছিলো বুঝি ওগুলো আমি বাইরে নিয়ে যাবো ওর শয়তানীর প্রমাণস্বরূপ। এইবারে আহ্লাদে আটখানা হোয়ে বলতে লাগলো, আমি হচ্ছি সাক্ষাৎ দেবদূত, আমার মত এমন সৎ এমন উদার দেখা যায় না। সঙ্গে সঙ্গে মিনতিও করলো, যাতে যা কিছু হোয়েছে কারো কাছে আমি না বলি। প্রতিজ্ঞা করলাম—না, কাউণ্টেসও জানবে না বিন্দু-বিসর্গও তখন ডাইনীটা আরও বারো সেকুইন চেয়ে বসলো—কি ব্যাপার? না তাহলে মন্তরের জোরে ওই কাউণ্টেসকেই আমার প্রেমে হাবুডুবু খাওয়াবে। আমি স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম আমি তার জন্যে একটুও গ্রাহ্য করি না। সেই সঙ্গে একথাও বললাম, ভালোয় ভালোয় এইবেলা ওই জঘন্য ব্যবসা ছেড়ে দিতে, না হলে শীগ্‌গিরই ধনে-প্রাণে ডুবতে হবে।

এতগুলো টাকা গেলো বটে কিন্তু সন্ন্যাসীঠাকুরের কথা বর্ণে বর্ণে মানার জন্যে একটুও অনুতাপ করিনি। সন্ন্যাসীর কেমন যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো আমার একটা অমঙ্গল ঘটবে বলে। খুব সম্ভব চাকর-

বাকরের মধ্যে কেউ যে হয়ত ডাইনীর কাছে ওর রক্তটা দিতে গিয়েছিল তাকেই জেরা করে কিছু জেনেছিলেন। আমি কিন্তু ঠিক করেছিলাম কাউণ্টেসের ওই মতলব যে পুরোপুরি ফাঁস হয়ে গেছে আমার কাছে একথা কোনদিনই তাঁকে জানতে দেবো না। তাই আমার ব্যবহার আরও কোমল, নম্র আরও বিনীত করে আনলাম। অবশ্য আমার সৌভাগ্য ডাইনীর মন্তরে কাউণ্টেসের একেবারে অন্ধ বিশ্বাস ছিলো—কারণ তা' না হলে আমার উপর প্রতিশোধ নেবার জ্বালা মিটোতে আমাকে হত্যা করার জন্য গুণ্ডা ভাড়া করতেও পিছপাও হোতেন না বলেই আমার বিশ্বাস। আমি ইচ্ছে করেই একদিন ওঁকে একটা চমৎকার সৌখীন উপহার দিয়ে ওঁর হাত দুটি চুম্বন করে বললাম,—আমি স্বপ্ন দেখছিলাম, আমার উপর আপনি এত রেগে গেছেন যে আমাকে খুন করবার জন্যে গুণ্ডা ভাড়া করেছেন।

বলতে না বলতেই লক্ষ্য করলাম ওঁর মুখ টক্‌টকে লাল হোয়ে উঠলো কিন্তু চট্ করে সামলে নিলেন নিজেকে। চলে আসবার সময় দেখলাম, বেশ ভারাক্রান্ত মনে বসে রয়েছেন। ভালো কি মন্দ করেছিলাম, জানি না। কিন্তু তার পর থেকেই কাউণ্টেসের ব্যবহার একেবারে বদলে গেল। এক দিনের জন্যেও এতটুকু ত্রুটি আর ঘটতে দেখিনি কোথাও।

একাদশ অধ্যায়

এবার ইংল্যাণ্ডের পথে। কিন্তু ভারাক্রান্ত মন; মনের তটপ্রান্তে আছড়ে পড়ছে স্মৃতির ঢেউ, একের পর এক।

কি আশ্চর্য ভাবেই না মনের সূক্ষ্মতম তন্ত্রীতে আঘাত করে করে যায় হেনরিয়েটা, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে কি অভাবনীয়রূপে আসে ওর চকিত স্পর্শ! মনে পড়ে—

এক মঙ্গলবারের সকালে ক্লেয়ারমঁ এসে বলে, এক জন সাধু খুঁজছেন। আবার সাধু? ভাবতে না ভাবতেই আমার সবচেয়ে ছোটো ভাই সাধুর বেশে এসে হাজির। আমাকে দেখেই উচ্ছ্বসিত আবেগে আমার দুটি হাত জড়িয়ে ধরলে। ওর উচ্ছ্বাসে বিরক্তই হলাম। কারণ চিরকালের বাউণ্ডুলে এই ভাইকে কোনো দিনই আমি দেখতে পারতাম না ওর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত স্বভাবের জন্যে। তাছাড়া গত দশ বৎসর ধরে কোনো খোঁজই রাখিনি। ভালো করে চেয়ে দেখলাম ছেঁড়া ময়লা জামা-কাপড়, রুক্ষ শীর্ণ অপরিচ্ছন্ন চেহারা, ভিখারীরও অধম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমার ঠিকানা পেলে কোথায়? জানালে, মঁ্যসিয়ে ব্রাগার্দার কাছে।

—সে কি! তুমি তাঁকে আমার ভাই বলে পরিচয় দিয়েছো! শিউরে উঠলাম আমি।

—নিশ্চয়ই। তিনি বললেন, আমি যেন তোমার জীবন্ত প্রতীক

—তোমার মতো ওই আহম্মুক জড়ভরত চেহারাকে?

—তিনি তা' ভাবেননি। আমি যে তাঁর সঙ্গেই খেলাম।

—ওই পোষাকে? আমার মাথা হেঁট করিয়ে ছেড়েছো।

—তিনি আমাকে এখানে আসার ভাড়াটাও দিয়েছেন।

—হুম্। তাহলে সত্যিই ভিখিরী হোয়েছো। কিন্তু এখন আমার কাছে কি চাও শুনি? সোজাসুজি বলে রাখছি, আমার দ্বারা কিছু হবে না। যা বলবার, চলো তোমার সরাইখানাতে গিয়েই বলবে চলো, এখানে নয়। আর সাবধান, আমার চাকর-বাকরের কাছে আমার ভাই বলে পরিচয় দিও না।

এবার আমার ভাই জানালে সে একা নয়, সাধুগিরি করা সত্ত্বেও প্রেমে পড়ে একটি তরুণীকে বিবাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার পিতৃ-গৃহ থেকে তাকে ভুলিয়ে এনেছে—তাই ভেনিসে ফিরে যাবার সাহস নেই। এতদূর অধঃপতনও হোয়েছে তাহলে! মনে মনে ভাবলাম, তাহলেও একবার দেখেই আসা যাক ব্যাপারটা।

উজ্জ্বল শ্যামলা, দীর্ঘাঙ্গী, অত্যন্ত সপ্রতিভ অথচ অপরূপ শ্রীময়ী তরুণী। আমাকে দেখেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে প্রশ্ন করলো—আপনিই বুঝি এই মিথ্যাবাদীটার ভাই হ'ন? ওই জোচ্চোরটা যে আমার সর্বনাশ করেছে?

মেয়েটির বক্তব্য স্থির হোয়ে শুনলাম। আমার শ্রীমান্ ভ্রাতা মেয়েটিকে একটার পর একটা মিথ্যা সাজানো ভাঁওতা দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে এখান থেকে সেখান করে। একটি পয়সা সম্বল নেই। আজ যদি আমার দেখা না পেতো তবে কাল থেকে মেয়েটিকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে হোতো। দুঃখে, অপমানে, হতাশায়, বঞ্চনায় পাগল হোয়ে উঠেছে মেয়েটি। ওর যথাসর্বস্ব বিক্রী করে দিয়েছে আমার শ্রীমান ভ্রাতা। মেয়েটি কাতর অনুরোধ জানালে আমাকে ওকে নিরাপদে ভেনিসে পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করতে। আর আমার ভাইএর লিখিত অঙ্গীকার-পত্র—বিবাহের প্রতিশ্রুতি জানিয়ে—সেটা যেন আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলি। ওই জুয়াচোর

বদমায়েশের সান্নিধ্য আর এক মুহূর্তও সহ্য করতে চায় না মেয়েটি। আমার সামনে দুটি মূর্তি—হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে দুই হাত জড়ো করে অপরাধীর নীরবতায় আমার ভাই আর নির্ভীক, তেজোদৃপ্ত স্পষ্ট—প্রকৃত ভেনিসের মেয়ের মুখ। ভালো লাগলো আমার। দায় আর দায়িত্ব বোঝার মত ভারী রইলো না আর। ওকে নিরাপদে পিতৃগৃহের স্নেহনীড়ে পৌঁছে দেওয়া একটুও কঠিন নয় জানতাম, তাই সহজেই এবার বললাম, আমি তোমাকে কোনো বিশ্বাসী ভদ্রমহিলার সঙ্গে ভেনিসে পাঠানোর সব ভার নিলাম।

—মনে রেখো, মনে রেখো, তুমি কিন্তু শপথ করেছো আমার প্রতি চিরদিন বিশ্বস্ত থাকবে, বুঝেছো? মনে রেখো সেটা—বলতে বলতে যেই আমার ভাই ওর দিকে এগোলো সেই মুহূর্তেই ওই কোমল পেলব হাতের প্রচণ্ড কানমলা খেয়ে শ্রীমান কাঁদো-কাঁদো হোয়ে পিছিয়ে এলেন।

—বাঃ, তুমি তো দেখছি একটি ক্ষুদে বিচ্ছু, আমি বললাম মেয়েটিকে—আমার ভাইএর এত লাঞ্ছনা ভোগ তো তোমাকে ভালোবাসে বলেই না?

—সেটা তো আমার অপরাধ নয়—তাছাড়া আমার কাছে কানমলা খাওয়াও এই প্রথম নয় ওর—

বাঃ রে মেয়ে!

—কিন্তু সাধুর গায়ে হাত তোলার জন্যে তোমাকে একঘরে করেছিলো মনে আছে?—ফোঁস করে উঠলো আমার ভাই।

—ভারী বয়েই গিয়েছিলো কিন্তু ফের বকবক করলেই আবার কানমলা খাবে।

—চুপ করো, চুপ করো, একটু শান্ত হও। তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও। চলো আমার সঙ্গে। তোমার যাবার সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই বলে ভাইয়ের হাতে সবশুদ্ধ বিশটি সেকুইন দিয়ে ওকে চলে যেতে বললাম। হাতে টাকা পেয়েই শ্রীমান সন্তুষ্ট।

মেয়েটির নাম মার্কোলিনা। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম! আমার কাছে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম, সুন্দর সজ্জা আর ভবিষ্যতের আশ্বাস পেয়ে ফোটা ফুলের মত সজীব হোয়ে উঠলো মার্কোলিনা। হাসিতে, কৌতুকে, ভঙ্গীতে, ইঙ্গিতে ওর সহজ মাধুরী উপচে উঠলো।

কয়েকদিন পর মার্কোলিনাকে নিয়েই আমি মার্সেলস-এ একটা বিবাহ উৎসবে যোগ দিতে গেলাম। উৎসব শেষে আমাদের যাত্রা সুরু হোলো। আমি ঠিক করেছিলাম, একটু সুবিধা পেলেই মার্কোলিনাকে ভেনিসে পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। যাই হোক, আমাদের গাড়ী বেশ কিছুদূর এসেই বিগড়ে গেল। না হেঁটে আর এগোবার উপায় নেই। পথের দু'ধারে কোনো বাড়িও নেই। একটি মাত্র সুন্দর বাড়ি দেখা যাচ্ছিল, একটু দূরে মস্ত বাগানের মধ্যে। দুধারে উঁচু গাছের সারি দেওয়া লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে বাড়িটার ফটক অবধি। কোনো উপায় না দেখে ক্লেয়ারমঁকে পাঠালাম ওই বাড়িটায়—কাছাকাছি কোনো মিস্ত্রী পাওয়া যাবে কি না এই সব জেনে আসতে।

একটু পরেই ও ফিরে এলো, সঙ্গে দুজন পরিচারক! তারা আমাকে অভিবাদন করে অত্যন্ত নম্রভাবে জানালে যে, তাদের উপর আদেশ হোয়েছে, গাড়ীটা মেরামতের ব্যবস্থা করার আর আমাদের এই সময়টুকুর জন্যে ওই বাড়িটিতে আতিথ্য নিতে অনুরোধ জানাবার। উপায়ান্তর ছিল না। জিনিসপত্র সবই আমার বিশ্বস্ত ক্লেয়ারমঁ-এর

জিম্মায় রেখে মার্কোলিনাকে নিয়ে এগোলাম! বাড়ির ফটকের কাছে আসতেই দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে, ওঁদের পিছনে তিন জন মহিলা। ভদ্রলোক দু'জন বার বার বলতে লাগলেন, মাদামের অর্থাৎ গৃহকর্ত্রীর অত্যন্ত আনন্দ হোয়েছে আমরা আতিথ্য স্বীকার করাতে। তা ছাড়া আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য-বিধানের জন্য উনি সর্বদাই উৎসুক, আমরা যেন সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে বিশ্রাম করি। আমি বিনীত ভঙ্গীতে গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশে অভিবাদন আর ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, আশাকরি বেশীক্ষণ ওদের ওপর অত্যাচার করতে হবে না। গৃহকর্ত্রী লীলায়িত ভঙ্গিতে অভিবাদন করলেন কিন্তু ওঁর মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কারণ ওড়নাতে সমস্ত মুখখানা এমনভাবে ঢাকা ছিলো যে একটু অংশও দেখা গেল না। আমার পাশেই মার্কোলিনার লাবণ্যভরা মুখখানি পূর্ণ বিকশিত; মুখের চার পাশে অবাধ্য চুলগুলি সাপের ফণার মত ঢেউ তুলে উড়ছে, কোনো আবরণের বালাই নেই! ওঁদের মধ্যে একজন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, মার্কোলিনা আমার মেয়ে কি না। আমি বললাম ও আমার সম্পর্কিতা বোন, আমরা দু'জনাই ভেনিসের লোক। আমাদের কথার মাঝখানে একটা মস্ত স্প্যানিয়েল কুকুর তীরের মত ভিতর থেকে ছুটে এলো; মাদাম ওকে তাড়াতাড়ি ধরতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। যেই ওঁর সহচরী ওঁকে ধরে তুললে, উনি বললেন, ভালো করে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, ভীষণভাবে পা'টা মচকে গেছে। ওঁকে ধরে ওঁর ঘরে নিয়ে গেল যাবার কয়েক মিনিটের মধ্যেই সহচরীটি ফিরে এসে খবর দিলে যে, ওঁর পা'টা দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে, উনি বিছানায় শুয়ে আছেন আর সেখানেই আমাদের আহ্বান জানিয়েছেন।

শয়নাগারে প্রবেশ করেও ওঁর মুখচন্দ্রিমা দর্শনের সৌভাগ্য হোলো না, তবু দুঃখিতভাবে স্বীকার করলাম, ওঁর এই দুর্ঘটনার জন্যে আমিই দায়ী। পরিষ্কার স্বচ্ছন্দ ইতালীয় ভাষায় উনি জানালেন, আমাদের অতিথি হিসাবে পাওয়ার আনন্দের কাছে ওই ব্যথা নিতান্তই তুচ্ছ।

—মাদাম, আমার দেশের ভাষা এত চমৎকার বলেন আপনি? নিশ্চয়ই আপনি ভেনিসে ছিলেন?

—তা নয়। তবে আমার একটি ঘনিষ্ঠ বন্ধু আছেন ভেনিসেরই অধিবাসী।

এই সময় একজন পরিচারক এসে জানালো, বেশ কয়েক ঘণ্টা দেরী হবে গাড়ীটা মেরামত করতে। মাদাম অনুরোধ জানালেন, রাত্রিটাও তাহলে এখানেই কাটাতে। কৃতজ্ঞ ভাবেই সম্মতি জানালাম।

রাত্রে খাবার টেবিলে সারাক্ষণ অনর্গল ইতালীয় ভাষায় আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। কিন্তু আশ্চর্য! এক মুহূর্তের জন্যেও ওঁর মুখ দেখতে পেলাম না। আর পরিচয়? তা-ও সাহসের অভাবে খোলাখুলি জানা হোলো না।

নিদ্রার আয়োজনের সময় মার্কোলিনা জানালে, মাদামের কাছেই ও রাতে শোবে; এ দু'জনার সখীত্ব ওই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ নিবিড় হোয়ে উঠেছে দেখলাম।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই যাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। প্রাতরাশের ব্যবস্থা গাড়ীতেই করবো ঠিক করলাম। বিদায় নেবার আগে গৃহকর্ত্রীর দর্শন চাইলাম—মিললো না। তখনও তাঁর সজ্জা ও প্রসাধন হয়নি, সে অবস্থায় উনি বাইরে আসতে লজ্জিতা। তবে

তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে পাঠালেন আর পাঠালেন অনুরোধ—যখনই যাবো এ পথ দিয়ে, একা হোক, সবান্ধবে হোক, ওঁর কাছে যেন আতিথ্য স্বীকার করি। দেখা না হওয়াতে মনে মনে বিরক্ত হলাম বৈকি! কিন্তু প্রকাশ্যে শিষ্টতার কোনো ত্রুটি ঘটেনি। সবার কাছে বিদায় নিয়ে আবার মার্কোলিনা আর আমার যাত্রা স্থরু হোলো।

পথে মার্কোলিনাকে প্রশ্ন করলাম, কেমন দেখতে ওই মাদামকে? তরুণী না বৃদ্ধা? রূপসী না কুৎসিত?

—এক কথায় মনোহারিণী। কি অপরূপ সৌন্দর্য ওঁর, আপনাকে কি বলবো? বয়স তো তেত্রিশ বছর বললেন। হ্যাঁ দেখুন দেখুন, আমাকে ভালোবেসে কি দিয়েছেন—

বহুমূল্য হীরার আংটি দেখলাম ওঁর প্রসারিত আঙুলে। কিন্তু কেন আমার কাছে সারাক্ষণ ওড়নাতে মুখ ঢেকে রইলেন—এক মুহূর্তের জন্যেও ওঁকে দেখতে দিলেন না। তার কি কারণ, বার বার প্রশ্ন করেও মার্কোলিনার কাছে কোনো সদুত্তর পেলাম না। তার বদলে মঁসিয়ে কুইরিনি ভেনিসের যিনি রাজদূত তাঁর কাছে যে ওর মামা মাতিও বসে কাজ করে সেই সব অবান্তর প্রসঙ্গ তুলে আমার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড যাবার বায়না জুড়ে দিলো। শুধু ওকে থামাবার জন্যেই ওর সব কথায় সায় দিয়ে গেলাম।

সূর্যাস্তের পর আমরা আভিনোঁতে পৌছলাম। ওখানে একটা সরাইখানাতে রাত কাটাবার ব্যবস্থা হোলো। দু'জনে ঘরে বসে বিশ্রাম করছি, এমন সময় মার্কোলিনা হঠাৎ বললে,—আমরা তো আভিনোঁ-এতে পৌছে গেছি। যাক্ তাহলে মাদামের কাছে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা' পূরন করবার সময় হোলো। হ্যাঁ, উনি এখানে না পৌছানো অবধি আপনাকে কিছু বলতে বারণ

করে দিয়েছিলেন, এমন কি আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞাও করিয়ে নিয়েছিলেন।

—আরে সত্যি! বেশ মজার ব্যাপার তো? বলো বলো তারপর?…

—উনি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছেন। এতক্ষণ চিঠি আটকে রাখার জন্যে রাগ করবেন না তো আমার উপর?

—পাগল হোয়েছো? তুমি একজনের কথা রেখেছো, তা'তে আমি রাগ করবো? কিন্তু চিঠিটা কই, বার কর তাড়াতাড়ি—

—দাঁড়ান—এই বলে একতাড়া কাগজ বের করে ও বাছতে বসলো।

—ওঃ এটা আমার জন্মের সার্টিফিকেট।

—জানি তুমি ১৭৪৬ সালে জন্মেছ।

—রাখো রাখো ওসব, পরে কাজে লাগবে। এখন আসল চিঠিটাই বার কর না?

—আশা করি হারাইনি।

—ঈশ্বর না করুন—কৌতূহলে আর অদম্য আগ্রহে আমার তখন আত্মহারা অবস্থা।

—এই যে পেয়েছি—আরে না তো! এতো আপনার ভাইয়ের লেখা ক'টি কবিতা।

—চুলোয় যাক কবিতা, পুড়িয়ে ফ্যালো ওসব আগুনে। আমার চিঠিটা বার করো আগে।

—ভঃ ভগবান! এই—এই যে পেয়েছি!

ওর হাত থেকে খামটা একরকম ছিনিয়ে নিলাম। সাদা খাম কোনো ঠিকানা নেই। খামটা ছিঁড়তে গিয়ে আমার আঙুলগুলো

প্রবল উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। সীলটা ভেঙে ফেলতেই দেখলাম, নামের জায়গায় লেখা—

"আমার সারা জীবনের মহত্তম পুরুষকে।"

এ কি আমাকে উদ্দেশ্য করে লেখা? আশ্চর্য, আরও আশ্চর্য যে তখনও বাকী। সাদা পৃষ্ঠার একটি কোণে লেখা—

'হেনরিয়েটা'—আর একটি অক্ষরও নয়।

স্পষ্ট, স্বচ্ছ সেই চিরপরিচিত, লিখনভঙ্গী! আমারই হেনরিয়েটা—কোনো ভুল কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই তাতে। এর সেই অভিনব ইঙ্গিতময় রচনা-বিন্যাস—স্মৃতির পটে যে আজও জ্বলছে শেষ বিদায়ের দিনে সেই শেষ লিপি! একটিমাত্র কথা 'বিদায়'—সমস্ত না বলা কথাকে মূর্ত করে তুলেছিলো।

আমার হেনরিয়েটা! যার বিচ্ছেদ সুদীর্ঘ কালের প্রলেপে এতটুকু ম্লান হয়নি। দিনে দিনে আমার সমস্ত সত্তায় ও মিশে গিয়েছে গভীর থেকে গভীরতম অনুভূতিতে। ওকে পাওয়ার চেয়ে ওকে হারিয়েই ওকে নিবিড় করে পেয়েছিলাম।

কিন্তু হেনরিয়েটা পারলে তুমি এত নিষ্ঠুর হতে? তুমি দেখেছিলে, তুমি চিনেছিলে তবু তুমি ধরা দিলে না? তাই বুঝি অবগুণ্ঠনের আড়ালে অপরিচিতা হোয়েই রইলে? কিন্তু পারলে তুমি হেনরিয়েটা? কেন ভয় পেয়েছিলে কি? দীর্ঘকালের যাত্রায় প্রথম যৌবনের লাবণ্য কিছু ম্লান হয়েছে বলে? ষোল বছর আগে যে তরুণ তোমার মাধুর্য-সরোবরে ডুব দিয়েছিলো, তার সেই মুগ্ধ প্রেম আজও তো তেমনি আছে। তুমি সুখী হোয়েছো—শুধু সেই কথাটি তোমার মুখে শোনার আনন্দ থেকে আমায় বঞ্চিত করলে—তুমি এত নিষ্ঠুর কেমন করে হোলে হেনরিয়েটা? আমাকে আজও ভালোবাসো

কি না এ প্রশ্ন তোমায় আমি করতাম না—আমি জানি, আমি তোমার যোগ্য নই। মহিমময়ী, মাধুর্যময়ী, প্রিয়া আমার, কালই তোমার কাছে ফিরে যাবো আমি। তুমিই তো বলেছো তোমার দরজা আমার কাছে চিরদিন খোলা।

ওকে উদ্দেশ করে মনে মনে কত কথাই না বলছিলাম। কিন্তু সম্বিত ফিরে পেলাম মার্কোলিনার বিস্মিত বিষণ্ণ দৃষ্টিতে। খেয়াল হোলো মন চাইলেই ওর কাছে যাবার উপায় আমার নেই। কারণ, জানি আমি ও চায় না আমাদের দেখা হোক—ওর ইচ্ছার মূল্য আমাকে দিতেই হবে—সেইখানেই তো আমার প্রেম সার্থক। তবু সেই একই মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করলাম, মৃত্যুর আগে আর একটিবার মাত্র শুধু ওর দর্শন প্রার্থনা করবো।

মার্কোলিনা সভয়ে বলে উঠলো,—কি কাণ্ড বলুন তো মঁসিয়ে? আপনার চেহারা দেখে তো আমি রীতিমত ঘাবড়ে গেছি। একেবারে সাদা ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে মুখ—একটি কথাও বলছেন না—কাউন্টেস আপনাকে চিনতেন শুনলাম, কিন্তু ওর নাম শুনে আপনার যে এমন দশা হবে বুঝতে পারিনি।

—কে বললে তোমাকে আমরা বন্ধু ছিলাম?

—কাউন্টেসই বললেন। তাছাড়াও আমাকে বললেন, যদি জীবনে সুখী হতে চাও তবে ওঁর সঙ্গ কখনও ত্যাগ কোরো না। হায় রে, উনি কি আর জানেন যে আমাকে দেশে পাঠাবার সব ব্যবস্থাই আপনার করা হোয়ে গেছে? আমি কিন্তু তখনি সন্দেহ করেছিলাম আপনাদের দু'জনার মধ্যে বেশ নিবিড় প্রেমই ছিলো—আচ্ছা অনেক দিন হোলো কি?

—ষোলো, সতেরো বছর হবে।

—"ওঃ তাহলে নিশ্চয়ই তখন খুবই কম বয়স ছিলো ওঁর—কিন্তু আজ ওঁর যে আশ্চর্য পাগল করা রূপ এর চেয়ে সৌন্দর্য তখন নিশ্চয়ই ছিল না—

—মার্কোলিনা দোহাই তোমার—আর বোলো না—

—আপনাকে কাছে পেয়েও হারালাম—আমার কপালে এ সুখ জুটলো না।

—মার্কোলিনা, তুমি চিরসুখী হবে—তোমার সমবয়সী কেউ তোমার জীবনে নিশ্চয়ই আসবে, তার ভালোবাসা তোমাকে ঘিরে রাখবে চিরদিন।

কয়েক দিনের মধ্যেই মার্কোলিনার যাবার সুযোগ এলো। লণ্ডনের ভেনিসীয় রাজদূত মঁসিয়ে কুইরিনির সঙ্গে একদিন থিয়েটারে সাক্ষাৎ হোলো। প্রথম পরিচয়ের পর একদিন কুইরিনি আমাদের আমন্ত্রণ জানালেন। আর তাঁর বাড়ির ভোজসভায় মার্কোলিনার মামার সঙ্গে ওর নাটকীয় পরিস্থিতিতে সাক্ষাৎ।

মঁসিয়ে কুইরিনিই মার্কোলিনার পিতৃগৃহে পৌছানোর সব ভার নিলেন। তার মামাই তাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন, তাছাড়া মঁসিয়ে কুইরিনি মাদাম ভেনারেন্দা নামে একটি বিশ্বস্ত মহিলাকে মার্কোলিনার সঙ্গিনী হিসাবে পাঠালেন।

যাক, আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু মার্কোলিনার বিচ্ছেদও আমাকে এমন তীব্রভাবে কাতর করবে, বুঝতে পারিনি। ওকে বিদায় দিয়ে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বহুক্ষণ কেঁদেছি। শেষে ক্লান্ত হোয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় পুরো একটি দিন ঘুমের শেষে দেখলাম, দেহে-মনে আবার সতেজ হোয়ে উঠেছি। আশা আর আনন্দে মনের স্ফূর্তিতে ইংলণ্ডে যাবার আয়োজন সুরু করলাম।

দ্বাদশ অধ্যায়

ইংল্যাণ্ড।

বিদেশী যেদিন প্রথম পা দেয় ইংল্যাণ্ডের মাটিতে, সেদিন প্রথমেই তাকে কাষ্টম্‌সের পীড়াদায়ক অত্যাচারের কবলে পড়তে হয়। আরও হয় কর্মচারীদের রূঢ় গর্বোদ্ধত আচরণে। ইংরেজ আইন মেনে চলবে কঠোর নিষ্ঠায়। তার জন্য কর্কশ, অমার্জিত, দাম্ভিক আচরণেও দ্বিধা করবে না, বিশেষ করে কর্মচারীরা—কিন্তু ফরাসীরা জানে, কেমন করে কর্তব্যের সঙ্গে মেশাতে হয় ভদ্রতা আর আন্তরিকতার সহজ সুর।

ইংল্যাণ্ডের মাটিতে পা দিয়ে আমার মনকে প্রথম আকৃষ্ট করে ওর পরিচ্ছন্নতা। সারা দেশটাই যেন সৌন্দর্যে, প্রাচুর্যে আর পরিচ্ছন্নতায় জ্বল-জ্বল করছে। আর সবচেয়ে বেশী ভালো লাগলো কাগজের নোট। এক টুকরো কাগজের বিনিময়ে সব পাওয়া যায়, সব দেওয়া হয়। লণ্ডন, ডোভার, ক্যাণ্টারবেরী। প্রত্যেকটি শহরই আমাকে মুগ্ধ করলো। প্রথমে অবশ্য লণ্ডনেই স্থায়ী আস্তানা পাতলাম। কিন্তু নতুনের মোহ কাটবার পর থেকে কেমন বৈচিত্র্যহীন নিঃসঙ্গ কাটতে লাগলো দিনগুলি।

লর্ড পেমব্রোক আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন 'ষ্টার ট্যাভার্ণ' হোটেলে খেতে—তাহলে নাকি আমি লণ্ডনের সেরা সুন্দরীদের দর্শন পাবো। কথামত গিয়েছিলাম, হোটেল-মালিকের সঙ্গে পরিচিত হোয়ে খুশীও হোয়েছিলাম। লর্ড পেমব্রোক-এর কথা জানাতে তিনি বললেন, ঠিক ওরকম ভাবে নয় তবে আমি যদি একত্রে আহারের জন্য একটি সঙ্গিনী খুঁজি—তাহলে শুধু মুখ ফুটে একবার জানালেই

চলবে। এই বলে তিনি ওয়েটার ডেকে বললেন, একটা মেয়ে ধরে আনতে—এমন ভাবে বললেন যে, একটা শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে আয় তো। কিন্তু যেটি এলেন, তাঁকে দেখেই তো আমি মূর্ছা যাবার জোগাড়। তাড়াতাড়ি একটা শিলিং দিয়ে বিদায় করলাম। কিন্তু হা হতোহস্মি! পর পর যে কয়টি নমুনা এলেন, তাঁদের প্রত্যেকের রূপেই আমি অস্থির। শেষ অবধি ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা—বললাম, আমি একাই খাচ্ছি, দয়া করে আর কষ্ট করবেন না।

সেদিন বাড়ি এসে ভারী একটা অভিনব পন্থা মনে এলো। পরিচারিকাকে ডেকে বললাম, আমার বাড়ির তিনতলাটা ভাড়া দেবো, তাহলে আর এমন নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে না আর তার জন্যে ওর যা বাড়তি কাজ হবে, সে সবের দরুণ সপ্তাহে আধ-গিণি করে তাকে দেবো। পরদিনই ওকে দিয়ে জানালায় নোটিশ টাঙালাম :—

এই বাড়ির তিনতলাটি আসবাবপত্র দ্বারা সজ্জিত অবস্থায় ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া অল্প—প্রার্থী-তরুণী, একক এবং নির্ঝঞ্ঝাট হওয়া চাই। ইংরাজী ও ফরাসী কথোপকথনেও অভ্যস্তা এবং কোনো দর্শনপ্রার্থীরই প্রবেশ নিষেধ।

বৃদ্ধা পরিচারিকাটির তো এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপন দেখে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার যোগাড়। আমি বললাম,—হাসছো কেন বাছা? তুমি কি ভাবো, কেউ ঘর নিতে আসবে না?

—ঠিক তার উল্টো। সারা দিন-রাত কি ভিড় হয় দেখবেন। যাক্ সে, ফ্যানী ঠেকাতে পারবে।

—খুব বেশী হবে কি? ইংরেজী আর ফরাসী দুটো ভাষার কথা লিখেছি যে।

—আহা? অমন বিজ্ঞাপন পড়ার জন্যেই কত ভিড় হয় দেখুন।

সে কথা সত্যি। একবার নোটিশটা না পড়ে কেউ যায় না। দ্বিতীয় দিন আমার নিগ্রো ভৃত্য জারবি আমাকে দেখালে দু'-দুটো খবরের কাগজ কি ভাবে আমার বিজ্ঞাপনটা ফলাও করেছে।

—ভদ্রলোকটির রুচিজ্ঞান আছে আর আমোদপ্রিয় তো বটেই। কারণ, উনি যে চান তাঁর শুধু তরুণী হলেই চলবে না, একলা হওয়াই চাই, আবার নির্ঝঞ্ঝাট! তাছাড়া তাঁর কাছে কোনো সাক্ষাৎকারীর প্রবেশ নিষেধ—অর্থাৎ ভদ্রলোক নিজেই তাঁকে সর্বদা সঙ্গ দেবেন। তবে ভয়ের কথা, যদি তরুণীটি রাতে ঘুমোবার সময়েই শুধু বাড়ি ফেরেন? কিম্বা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে? আর যদি সাক্ষাৎকারী হিসেবে বাড়িওলারও প্রবেশ নিষেধ করেন!

একথা মানতেই হবে, ইংরেজী দৈনিকগুলি দুনিয়ার সেরা পত্রিকা। যা কিছু ঘটে তা' নিয়ে মুক্তকণ্ঠে আলোচনা চলে পত্রিকা মারফৎ। যে দেশের লোকেরা স্বাধীনভাবে বলতে আর স্বাধীন ভাবে লিখতে পারে সে দেশের মানুষই তো আসল সুখী।

যাই হোক, দশ দিন ধরে প্রায় শ'খানেক তরুণীকে প্রত্যাখ্যান করার পর এগারো দিনের দিন যখন খেতে বসেছি, এমন সময় একটি তরুণী এলো। সোজা আমার খাবার ঘরেই। বয়স মনে হোলো বিশ থেকে চব্বিশের ভিতর। দীঘল, তন্বী, সুঠাম দেহ—অত্যন্ত মার্জিত, বাহুল্যহীন রুচিপূর্ণ পরিচ্ছদ—শান্ত, গম্ভীর ঈষৎ গর্বিত মুখ—আর ঘন মেঘের মত কালো চুল।

সুন্দর সংযত ভঙ্গীতে আমাকে অভিবাদন জানাতেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। কিন্তু আমাকে অনুরোধ জানালে আমি যেন খাওয়া ছেড়ে না উঠি। ওর কণ্ঠস্বর আর বলার ভঙ্গীতে বোঝা গেল, বেশ

বনেদী ঘরাণা ঘরের মেয়ে। আমার সঙ্গে কিছু খেতে অনুরোধ করায় এমন সহজ মধুর ভঙ্গীতে প্রত্যাখ্যান জানালে যে, আমি মুগ্ধ হোয়ে গেলাম। মেয়েটি এসেই ফরাসী ভাষায় কথা সুরু করেছিলো, পরে কথায় কথায় অতি সুন্দর আর নির্ভুল ভাবে ইতালীয় ভাষায় কথা বলতে লাগলো। মেয়েটি জানালো আমার সব রকম সর্তেই ও রাজী। আমিও রাজী হোয়েছিলাম, ওকে দেখার আর শোনার পর থেকেই।

—সমস্ত তিনতলাটা নেওয়া আমার পক্ষে বড্ড বেশী হয়ে পড়বে। যদিও আপনি সস্তা ভাড়ার কথাই বিজ্ঞাপনে দিয়েছেন, তবুও থাকার জন্য সপ্তাহে দু'শিলিংএর বেশী খরচ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—ঠিক আছে। ওই ভাড়া আমিও ঠিক করেছিলাম। আপনি কিছু ভাববেন না। আমার পরিচারিকাই আপনার বাজার করা কাপড় ধোওয়া ইত্যাদি সব কিছু কাজ করে দেবে।

—অনেক ধন্যবাদ! তাহলে খুব সুবিধা হবে আমার। আমার পরিচারিকাকে তাহলে জবাব দেবো। কারণ সে বড্ড পয়সা চুরি করে। আমার আয়ের পক্ষে সেটা বেশ মারাত্মক হোয়ে পড়ে। আমি বরং আপনার লোকটিকে সপ্তাহে ছ'পেনী করে দেবো। বলতে লজ্জা করে কিন্তু বেশী খরচ করার সাধ্য নেই আমার।

—কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না। আপনি যদি এক পেনী দেন তো আমার রাঁধুনীকেও রোজ এক পেনী দামের খাবার আপনাকে দিতে বলবো। রান্না নিয়ে আপনি বৃথা ভাববেন না। আর তাছাড়া রাঁধুনী যা আপনাকে দিয়ে যাবে, যত খাবারই হোক সবই নেবেন দ্বিধা না করে। কারণ আমার বলা আছে রোজ চার জনের মত রান্না করতে অথচ খেতে আমি একা। আপনি এক পেনী দিলে

সেটাই ওর পুরোপুরি লাভ। কিছু মনে করবেন না আপনি এতে।

—কি আর বলবো, আপনার এ উদারতা আমি কখনো ভুলবো না।

সব ব্যবস্থা হোয়ে গেলো। মেয়েটি চলে গেলো জিনিসপত্র সব নিয়ে আসতে। এসেছিলো যখন তখন ওর মুখখানা ছিলো পাণ্ডুর ম্লান—যাবার সময় দেখলাম রক্তিম আভাসে উজ্জ্বল। ওর নাম কুমারী পলিন।

পরিচারিকার মারফৎ পলিনের সব খবরই কানে আসতো। শোবার ঘর ছাড়া বেশবাস পরিবর্তনের জন্যে ছোটো একখানি ঘর বেছে নিয়েছে, চাকর-বাকরদের চেয়েও ছোটো ঘরখানা। এমনি পানীয় হিসাবে জল ছাড়া কিছুই খায় না। সকালে ছোটো এক-টুকরো রুটী শুধু, দুপুরে স্যুপ আর একটিমাত্র ডিম।

এসব শুনে তখনি পরিচারিকাকে শিখিয়ে দিলাম পুরো প্রাতরাশ ওকে দিতে আর জানাতে, এ বাড়ির নিয়মই সব ঘরে পুরো প্রাতরাশ পাঠানো—না হলে আমি ভীষণ দুঃখিত হবো। একখানি চিঠিও লিখেছিলাম ভালো একটা ঘর বেছে নেবার অনুরোধ জানিয়ে। আর সবশেষে ক্লেয়ারমঁকে পাঠালাম সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে। প্রার্থনা মঞ্জুর হোলো। ঘরে গিয়ে দেখি বেশ কয়েকখানি বই টেবিলের উপর স্তূপীকৃত, তাছাড়া অন্য সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের টুকটাকি—যা দেখলে দারিদ্র্যের কথাই মনে হয়। আমি যেতেই পলিন এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালে।

—কি করে যে আপনাকে কৃতজ্ঞতা জানাবো।

—আপনার সঙ্গ দিয়ে—অন্তত খাবার সময়টায়। একা খেতে গেলেই গোগ্রাসে গিলি, ফলে শরীরও ভেঙে পড়ে। যদি কিছু মনে না করেন আপনি আমার সঙ্গে খেতে এলে আমার পক্ষে খুবই ভালো হয়। অবশ্য তার জন্য আপনার বিন্দুমাত্রও অসুবিধা ভোগ করতে হবে না কোন দিক দিয়েই—

—তাই হবে, কিন্তু খুব যে মনোরম সঙ্গ পাবেন তা' মনে হয় না।

সেদিন আরও অনেক কথাই হোলো। কথায় কথায় জানলাম, পলিন ইংরেজ নয়, বাইরে থেকে এসেছে। অথচ ছোটো থেকেই ইংরেজী কথা বলতেই অভ্যস্ত। ক্রমেই ওর মধুর অথচ সংযত ব্যবহার ওর শান্ত-শ্রী আমার মনকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করছিলো বুঝলাম। আর ওর কথায়-বার্তায় আমার দৃঢ় বিশ্বাস হোয়েছিলো ও রীতিমত অভিজাত-বংশীয়া। এক দিন আরও ঘনিষ্ঠ প্রশ্নই করে বসলাম পলিনকে,—আপনি বিবাহিতা ?

—হ্যাঁ।

—মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছেন আপনি ?

—না। তবে অনুভব করতে পারি বৈ কি ?

—আপনার স্বামী ? তার সঙ্গে এ বিচ্ছেদ কেন ?

—তিনি অনেক দূরে থাকেন। বিচ্ছেদ নয়—কিন্তু দোহাই আপনার, আর প্রশ্ন করবেন না।

—একটা কথার অন্ততঃ জবাব দিন—এখান থেকে যখন চলে যাবেন—সে যাওয়া কি স্বামীর সঙ্গে মিলবার আশায় ?

—হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি ইংল্যাণ্ড ছেড়ে যাবার আগে আপনাকে ছেড়ে যাবো না। এই সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরা ছোটো দ্বীপটি ছেড়ে যাবো শুধু আরও সুখী হবার আশাতেই—আমার প্রিয়তমের সঙ্গ পেলে।

একটা প্রবল বেদনার অনুভূতিতে আমার বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠলো—আর থাকতে না পেরে আবেগে রুদ্ধকণ্ঠেই বলে উঠলাম, —আর আমি পড়ে থাকবো পিছনে—হতভাগ্যের মতো! পলিন, পলিন আজ স্বীকার করছি আমি তোমাকে ভালোবেসেছি, প্রকাশ করিনি শুধু তোমার অসন্তোষের ভয়ে।

—চুপ করুন, শান্ত হোন—আমার কোনো অধিকার নেই আপনার কথা শোনবার—আমার সাধ্যও নেই আপনাকে বাধা দেবার—আমার অনুরোধ শুধু রাখুন। তা না হলে কালই আমাকে চলে যেতে হবে এবাড়ি ছেড়ে; সেটা যে আরও কষ্টদায়ক হোয়ে উঠবে।

—তোমার কথাই শিরোধার্য পলিন। থাক্ ও প্রসঙ্গ—তোমার বইগুলি আমাকে দেখাবে? তোমার ওই মহৎ সুকুমার মনের পিপাসা কি দিয়ে মেটাও, জানতে ইচ্ছে করে।

—নিশ্চয়ই দেখাবো। কিন্তু দেখলে হতাশ হবেন বলে রাখছি।

পলিন দেখালো, ইংরাজীতে মিলটন, ইতালীয়তে আরিয়োস্তো, ফরাসীতেও কিছু সংখ্যক আর বাকী সব পর্তুগীজে।

—তোমার এত চমৎকার সংগ্রহ! কিন্তু বেশীর ভাগই পর্তুগীজ ভাষায় কেন?

আমি পর্তুগালের মেয়ে বলে।

—বল কি! তুমি পর্তুগীজ? আমি ভেবেছিলাম, ইতালীয়—আশ্চর্য! এই বয়সে পাঁচটা ভাষা দখল করেছো? স্পেনীয় ভাষাও জানো নিশ্চয়ই?

—জানি বৈ কি। পাশাপাশি থাকার দরুণ ওটা আপনা হোতেই শেখা হোয়ে যায়।

—পলিন তোমার পরিচয় আমি রাখি। আর তোমার বিশ্বাস রাখার অধিকারও আমি রাখি। তুমি আমায় জানাও পলিন, তোমার সত্য পরিচয়, তোমার জীবনের অতীত কাহিনী—

—জানি আমি। বলবো আপনাকে—সব কিছুই বলবো—পরিপূর্ণ বিশ্বাসেই বলবো—কিছু গোপন করবো না। আমি জানি, আপনি ভালোবাসেন আমাকে—আমার অনিষ্ট আপনার দ্বারা কখনই সম্ভব হবে না।

—এই সব পাণ্ডুলিপি কিসের?

—আমারই জীবন-কাহিনী। আসুন আপনাকে পড়ে শোনাই সব।

এক হতভাগ্য কাউণ্টের একমাত্র কন্যা আমি। ছোট্টো ছিলাম তখন—সেই সময় রাজাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রী দল ধরা পড়ে তাদের সঙ্গেই অভিযুক্ত করে বাবারও প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। জানি না, সত্যিই বাবা অপরাধী ছিলেন—না রাজসভায় কারো গোপন হিংসা আর বিদ্বেষের কবলে পড়ে প্রাণ দিলেন।

মা আমার আশ্রমে লেখাপড়া শিখেছিলেন। সেখানে এক জন মঠবাসিনী ছিলেন আমার নিজের মাসী। আমিও সেই আশ্রমেই ছিলাম, প্রায় আঠারো বছর বয়স অবধি। আমার যা কিছু শিক্ষা, সব সেখানেই। ইচ্ছা ছিলো, যত দিন না বিয়ে হয় ততদিন ওখানেই থাকবো আশ্রমের সুন্দর সংযত পরিবেশে—তা ছাড়া আমার মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী মাসীকে আমি বড্ড ভালবাসতাম।

কিন্তু দাদামশায় নিয়ে এলেন আমাকে আঠারো বছর বয়সেই। বাবার সম্পত্তি রাজসরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় নি। তার

প্রকৃত উত্তরাধিকারিণী তখন আমিই। এক দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া, মার্কুইস দ্য এক্স-এর বাড়িতে আমার থাকার ব্যবস্থা হোলো। তাঁর বাড়ির অর্ধেকটাই প্রায় আমার জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া একজন শিক্ষিতা অভিজাতবংশীয়া ধাত্রী রাখা হোয়েছিলো—ঝি, চাকর আর অন্যান্য বহু পরিজনই আমার পরিচর্যার জন্য ছিলো বটে কিন্তু আসল কর্ত্রী দেখলাম আমার ধাত্রীটি—যাই হোক, বরাতগুণে ওর স্বভাবটা ভালোই ছিলো।

কিন্তু আসল বিপদ সুরু হলো বছর খানেক পরে। এক দিন দাদামশায় এসে জানালেন, এক কাউন্ট আমাকে পুত্রবধূরূপে মনোনীত করতে চান—তাঁর উপযুক্ত পুত্র মাদ্রিদ থেকে সবে ফিরেছে—আর এই বিবাহ আমাদের সমস্ত অভিজাত সমাজে রীতিমত আনন্দের সাড়া জাগাবে—এমন কি, রাজা আর রাজ-পরিবারেরও সাগ্রহ সম্মতি আছে এতে।

—কিন্তু দাদামশায়, আমি তাদের সুখী করতে পারবো কি?

—খুব পারবি রে পাগ্‌লী! আর ও-বিষয়ে তোকে একদম মাথা ঘামাতে হবেই না।

—কিন্তু দাদামশাই—মাথা ঘামাতে হবে না বললে চলবে না; আগে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হই।

—বিয়ের আগে একবার আলাপ হবে বৈকি। তবে তার জন্যে বিয়ের কিছু এদিক-ওদিক হবে না, সে সব আগেই যা ঠিক হবার হোয়ে গেছে।

আশ্চর্য! যাকে মন দিতে পারি নি, তার কাছে নিজেকে নিবেদন করতে হবে অন্ধের মতো? না, কখনই হোতে পারে না। সম্পূর্ণ অজানা, অপরিচিতের নাগপাশে নিজেকে এমন ব্যক্তিত্বহীন

জড় পুতুলের মত জড়াতে দেবো না—দেবো না। ধাত্রীকে বললাম সব। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো যুক্তি দেবার সাহসও নেই ওর। তখন গেলাম আমার সন্ন্যাসিনী স্নেহময়ী মাসীর কাছে। সব শুনে উনিও বললেন, কাউণ্টকে আমার ভালো লাগা উচিত, তবে বিয়ে জিনিসটাই হোলো একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা—তা ছাড়াও ব্রেজিলের রাজকুমারীর প্রিয়পাত্র ওই কাউণ্ট—এ বিয়ের সম্বন্ধ উনিই করেছেন।

হতাশায় ভেঙে পড়ি নি। শেষ অবধি কি হয়, পরিচয়ের প্রথম অনুভূতি কেমন হয়, জানবার জন্য ধীরভাবেই অপেক্ষা করতে লাগলাম। পরিচয় ঘটতে দেরী হলো না! বিরাট উৎসব-সমাবেশে পরস্পর পরিচিত হলাম। আমি নিঃশব্দে সারাক্ষণ শুধু লক্ষ্য করছিলাম কাউণ্টকে। গভীর মনোযোগে শুনছিলাম তার প্রতিটি কথা। কিন্তু প্রথমেই মনে হোয়েছিলো, এর কাছে আত্মনিবেদন কখনও করবো না—কখনও করতে পারবো না—কিছুতেই না। এই অতি প্রগল্ভ, পরচর্চাকারী, আত্মম্ভরী নির্বোধ লোকটিকে স্বামিত্বে বরণ করতে হবে? সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞানেরও অভাব যার, সর্বসমক্ষে নিজের গুণগান করতে এতটুকু যার সঙ্কোচ হয় না, এমনি মূর্খ যে, হাল্কা রসিকতা আর কাল্পনিক বীরত্ব কাহিনীই যার একমাত্র বাগ্-সম্বল, তাকে কখনও শ্রদ্ধা করা যায়? তার সঙ্গ কখনও কি মুহূর্তের জন্যেও কাম্য? তা ছাড়া চোখ দুটিকেও নিরাশ করেছিল ওর কুৎসিত রূপ।

মনের এই তীব্র সমালোচনা মনেই ছিলো। বাইরে শান্ত, নম্র, সংযত ব্যবহারে কোথাও তার চিহ্ন ফুটে উঠতে দিইনি। কিন্তু আমার এই অতি সংযত, অতি ভদ্রব্যবহারের ফলেই আশা করে-

ছিলাম ওই অতি উচ্ছ্বসিত, অতি প্রগলভ কাউণ্ট আমাকে মনোনীতা করতে চাইবেন না।

হা হতোহস্মি! দিন আষ্টেক যেতে না যেতেই দাদামশায় জানালেন, তাঁরা পিতা-পুত্রে আমাকে একটি দিন নির্দিষ্ট করবার অনুরোধ জানিয়েছেন—বিবাহের চুক্তিপত্রে সই করবার জন্যে। বিবাহের চুক্তিপত্রে না আমার মৃত্যুর পরোয়ানায়?

এই দুর্দিনে আমার একমাত্র আশ্রয় মাসীর কাছে ছুটলাম। মাসী জানালেন উনিও দেখেছেন কাউণ্টকে—ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা উনি ভাবতেও পারেন না। কিন্তু ওরা এমন ভয়ানক প্রকৃতির লোক যে, ছলে বলে কৌশলে সম্মতি আদায় করতে পিছপাও হবে না। মাসীর কথায় আমি একেবারে অকূল সমুদ্রে পড়লাম—আশ্চর্য! সেই মুহূর্তেই বিদ্যুৎ চমকের মত একটা অদ্ভুত মতলব আমার মনের মধ্যে খেলে গেলো। তখনই বাড়ি চলে এলাম। এসেই কাগজ-কলম নিয়ে চিঠি লিখতে গেলাম মার্কুইস গু পম্‌বালকে, যিনি আমার হতভাগ্য পিতাকে বন্দী করেন—যিনি আমার পিতার মৃত্যুর জন্মে দায়ী,—সেই কঠোর নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষটিকে। সমস্ত ঘটনা ওঁকে খুলে জানালাম—উপসংহারে লিখলাম—আমার এমন সহায়হীনা অনাথা অবস্থার জন্য ইনিই তো দায়ী। ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আজ আমার দায়িত্ব না নিলে—আমি আজ ওঁর আশ্রয়-প্রার্থিনী—আমাকে ব্রেজিলের রাজকুমারীর রোষবহ্নি থেকে রক্ষা করুন আর মনোমত স্বামী নির্বাচনে অধিকার দিন।

চরম উত্তেজনা আর ঝোঁকের মাথায় লিখে পাঠিয়েছিলাম—আমার ধারণা ছিল না লোকটির কঠোর হৃদয়ের আড়ালে কোথাও এতটুকু করুণার কোমলতা আছে। তবু আশার একটু ক্ষীণ শিখা

জ্বলছিলো মনে, আমার ভাষা আর লিপির অভিনবত্বে কি একটু সাড়া জাগবে না? ন্যায় বিচারের দাবীতে পিতার জীবন নাশ করে কন্যার দাবী কি প্রত্যাখান করবেন?

দু'দিন পরে আশাতীত ভাবে এলো উত্তর। না, লিপির মারফৎ নয়। লোকের মারফৎ। তিনি বললেন, মার্কুইস তাঁকে গোপনে পাঠিয়েছেন আমাকে জানাতে যে—আমি যেন জানাই এই বিবাহে আমার মতামত স্থির করতে পারছি না, যতক্ষণ ব্রেজিলের রাজ-কুমারীর সম্মতির কোনো নির্ভুল বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাই। এইটুকু বলাই যথেষ্ট হবে উনি মনে করেন। আর বিশেষ কারণে কিছুই লিখে জানানো সম্ভব নয় বলেই তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়েছেন। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই আগন্তুকটি চলে গেলেন। কিন্তু ওইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর অপরূপ সৌন্দর্য শুধু আমার দৃষ্টি নয়, আমার সমস্ত মনের উপর গভীর রেখাপাত করে গেল। সদ্য মুক্তিলাভের আশায় আর আকস্মিক সুন্দরের আবির্ভাবে আমার মনের সে সময়ের অবস্থা বর্ণনার অতীত! কে জানতো সেই তীব্র মধুর অনুভবের কেন্দ্রে অপেক্ষা করছে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ?

এর পর থেকে আমি যখনই যেখানে গেছি, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। খুবই আশ্চর্য! গীর্জায় গেছি, থিয়েটারে গেছি। কোনো উদ্যানে উৎসবে গেছি কি পরিচিতদের ভোজসভাতে, যেখানেই গেছি ওকে দেখেছি। আর যখনই গাড়ি থেকে নামতে বা উঠতে গেছি পেয়েছি ওর প্রসারিত হাতখানির নির্ভরতা। আকস্মিকতা কবে অভ্যাসে দাঁড়ালো—বিস্ময় কবে সহজ হোয়ে উঠলো জানি না। কিন্তু টের পেলাম আর একটি জিনিস—ধরা

পড়লাম আপনার মনের কাছে। যদি কোনো দিন ওঁকে দেখতে না পেতাম, সমস্ত দর্শনীয় হোয়ে উঠতো বিস্বাদ—জীবন মনে হোতো অর্থহীন।

আমার জীবনের ধূমকেতু সেই কাউণ্টের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হোতো, দাদামশাই কিম্বা তাঁর এই আত্মীয়টির বাড়িতে কিন্তু আর একদিনও সেই পুরানো কথা উঠেনি।

একদিন সকালবেলা শুনতে পেলাম, আমার পরিচারিকার ঘরে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের গলার আওয়াজ। কে এসেছে জানবার জন্যে গিয়ে দেখি, প্রচুর লেস নিয়ে একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে—আমাকে দেখেই অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে নমস্কার জানালে। লেসগুলোর দিকে একবার চেয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। এমন কিছু ভালো নয়। তরুণীটি জানালে, পরদিন অনেক ভালো জিনিস নিয়ে আসবে। ওর কথা শুনতে গিয়ে ওর দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠলাম। কি আশ্চর্য সাদৃশ্য আমার সমস্ত মন জুড়ে যে তরুণের অনিন্দ্যসুন্দর কান্তি ভাসছে তার সঙ্গে এই তরুণীর! কি করে সম্ভব? আমার দৃষ্টিবিভ্রম? না তরুণীটি আরও দীর্ঘাঙ্গী তার চেয়ে—ভাবতে ভাবতে তরুণীটি কখন চলে গেল খেয়াল করিনি। পরিচারিকাকে প্রশ্ন করাতে ও বললে, আগে কখনো দেখেনি মেয়েটিকে।

পরদিন ঠিক সেই সময় ছোটো বেতের ঝুড়ি ভরে লেস নিয়ে সে হাজির। ওকে আমার নিজের ঘরে ডেকে আনলাম। তারপর কথা বলতে সুরু করলে ওকে আমার দিকে চাইতে বললাম—পূর্ণ-দৃষ্টিতে ও চাইলে আমার মুখের দিকে—কোনো সন্দেহ রইলো না আর। কিন্তু মনের প্রবল উত্তেজনায় একটি কথাও বলতে পারলাম না। তাছাড়া পরিচারিকাটির সামনে কোনো অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি

সৃষ্টি করা ঠিক নয়। ওকে বললাম আমার টাকার ছোটো থলিটা নিয়ে আসতে। যেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তখনি ছদ্মবেশী লেসওয়ালী আমার পায়ের উপর এসে পড়লো!

—আমার ভাগ্য আপনার হাতে—আমি বুঝেছি আপনি ঠিক ধরতে পেরেছেন।

—হ্যাঁ, ঠিকই চিনেছি কিন্তু আমি ভাবছি আপনি পাগল?

—হ্যাঁ পাগলই হয়েছি—শুধু ভালোবেসে—আমি আপনাকে—

—চুপ, উঠে পড়ুন, আমার পরিচারিকা এখনি এসে পড়বে।

—সে জানে—তাকে টাকা দিয়ে হাত করেছি।

—কি! এত দূর সাহস?

সে উঠে দাঁড়ালো। তখনি দেখলাম পরিচারিকাটি মুচ্‌কি হাসতে হাসতে টাকাগুলি গুণতে গুণতে ঘরে ঢুকছে। লেসগুলি জড়ো করে ঝুড়িতে তুলে একটু মাথা হেলিয়ে নমস্কার জানিয়ে ও নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে সেই দুর্বিনীতা পরিচারিকাকেও বার করে দেওয়াই আমার উচিত ছিলো। কিন্তু আমি ভাবলাম, কিছু না জানার ভান করে থাকাই শ্রেয়ঃ; তা'তে অন্ততঃ মান বাঁচবে।

দিনের পর দিন চলে গেলো। পনেরোটি সুদীর্ঘ দিন। এক দিনও আর দেখিনি সেই তরুণ ছদ্মবেশীকে। নিজের কাছে নিজেই লজ্জা পেলাম নিজের মনের চেহারা দেখে—সারা দিন রাত আমার কাটছে শুধু স্বপ্ন দেখে। সারা মন—চিন্তা আমার ভরে গেছে এমন গভীর বিষণ্ণতায়? শুধু ওর নামটুকু জানবার জন্যে কি ব্যাকুলতা! পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসা করলেই পারতাম—কিন্তু ওর উপর কেমন বিতৃষ্ণা আর সঙ্কোচও এসে গিয়েছিলো।

তবু রইলো না ধৈর্যের বাঁধ—মন মানলো না সংযমের অনুশাসন। একদিন প্রসাধন করতে করতে নিতান্তই যেন হেলাভরে জিজ্ঞাসা করলাম। সেই লেস্-ওয়ালী আর আসেনি ?

পরিচারিকাটিও ধূর্ত কম নয়। আমার ছলনা ও ঠিকই ধরেছে। বললে, ছদ্মবেশ ধরা পড়ার ভয়েই আর আসতে সাহস করে না।

ছদ্মবেশ আমি ধরে ফেলেছি। কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি যে, তুমি একজন পুরুষ জেনেও সমস্ত লুকিয়েছিলে আমার কাছে ?

—আপনি অসন্তুষ্ট হবেন আমি ভাবিনি। আমি ওঁকে চিনতাম।

—কে উনি ?

—কঁতে গু আল্। আপনি নিশ্চয়ই চিনতে পারবেন। কারণ, মাস চারেক আগে কি প্রয়োজনে উনি যে এসেছিলেন আপনার কাছে ?

—তবে যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম লেস্ ওয়ালীকে চেনো কি না, তখন কেন মিথ্যা বলেছিলে ?

ক্ষমা করুন। শুধু আপনি অপ্রস্তুত হবেন বলে। আমিও এই গোপন ব্যাপারে আছি জানলে আপনি রাগ করবেন বলে।

ওর এই স্বাভাবিক সত্য ব্যাখ্যাতে আমি খুসীই হলাম। তাছাড়া আরও খুসী হলাম জেনে আমার কুমারী মনের প্রথম নৈবেদ্য তাহলে অপাত্রে নিবেদিত হয়নি। আমি শুনেছিলাম, তরুণ কঁতে গু আল—এর নাম বহু ক্ষেত্রে—বিখ্যাত অভিজাত পরিবারে। কিন্তু এখন সম্পদহীন। তবু মার্কুইস পমবালের মত প্রবল প্রতাপশালীর অধীনে পদস্থ কর্মচারী সে—ভবিষ্যৎ উন্নতি তো সহজলভ্য তার। আর আমি তো আছি—ভাবতেই সমস্ত চিন্তাধারায় কেমন যেন সুখের আবেশ লাগলো। তার অভাব মেটাতেই বিধাতা আমাকেই নির্দিষ্ট

করেছেন—ভাবতেও মধুর—মধুর কল্পনাতে আবার মুহূর্তগুলি ভরে উঠলো আকাশ-কুসুম চয়নে—কিন্তু যাকে অমন করে বিদায় দিয়েছি—সে কি আর ফিরবে?

আমার গোপন কথাটি সে তো জানে না? সে কি আসবে?

আশা-নিরাশার দ্বন্দে তখন এমনি দুলছে মন!

ধরা পড়ে গেছি আপন মনের কাছে—হৃদয়ের দাবীর দুর্নিবার আকর্ষণে ভেসে গেছে সব যুক্তি-তর্ক আর বিচার-বিবেচনার ছোটো ছোটো আড়াল। বিস্মিত পুলকে স্তব্ধ হোয়ে শুধু অনুভব—মনের কানায় কানায় ভরা জোয়ারের প্রবল উচ্ছ্বাস—

সে কি আসবে?

এমনি সময়ে একদিন আমার পরিচারিকা ঘরে এসে ঢুকলো, চোখে-মুখে খুশী উপছে পড়ছে,—"মাদাম, সেই লেস-ওয়ালী আবার এসেছে—তাকে নিয়ে আসবো এখানে?"

—"তুই কি পাগল হলি?" প্রচণ্ড বিস্ময়ে আমি চমকে উঠি।

—"বেশ তবে বিদায় করে দিয়ে আসি?"

—"না, না, এখানেই নিয়ে এসো, আমি নিজে কথা বলবো ওর সঙ্গে।"

কঠিন হবো, তিরস্কার করবো, অনেক প্রতিজ্ঞাই তো ছিলো—কিন্তু চোখের সামনে ওকে দেখে কোথায় ভেসে গেলো সব—দ্বিধাহীন সঙ্কোচহীন স্পষ্ট ভাষায় শুধু জানালাম আমার ভালবাসা—নিবেদন করলাম আমার প্রেম—ওকে ঘিরেই যা' মঞ্জুরিত হোয়ে উঠেছে। আর এ-ও জানালাম—বৃথাই এ ভালোবাসা, আমাদের মিলন—সুদূর-পরাহত—শুধু স্বপ্নলোকেই সম্ভব—কোনো আশাই নেই। ও জানালে সম্প্রতি মার্কুইস ওকে একটি বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ

কাজের ভার দিয়ে ইংল্যাণ্ডে পাঠাচ্ছেন—কিন্তু যাবার সময় আমাকে পাবার প্রতিশ্রুতি যদি পাথেয়রূপে না পায় তবে সে ব্যর্থতা সহ্য করার চেয়ে মৃত্যুও ভালো। আমাকে ছাড়া জীবনের কোনো অর্থ, কোনো মূল্যই ওর কাছে নেই। আমাকে অনুরোধ জানালে যেন আমি ওর এখানে আসায় সম্মতি জানাই। আমি তো সম্মতই।

মাত্র বাইশ বছর বয়েস ওর। আমার চেয়ে মাথায় বুঝি একটু ছোটই হবে। ছিপছিপে একহারা চেহারা—অপরূপ লাবণ্যভরা—গলার স্বর আরও মিষ্টি—সবে দাড়ির আভাস দেখা দিয়েছে। লেস-ওয়ালীর ছদ্মবেশ তাই নিখুঁতই হোতো।

তিনটি মাস কাটলো। সপ্তাহে তিন চার দিন করে না এসে ও পারতো না। বেশীর ভাগ সময়েই আমার পরিচারিকাটি তার অসীম কৌতুহল নিয়ে চার পাশে ঘুরঘুর করতো। কিন্তু সে না থাকলেও আমার স্থির বিশ্বাস যে, নিবিড় বিহ্বল মুহূর্তেও ওর আমার প্রতি সম্মান আর সংযমের বিন্দুমাত্রও অভাব হোতো না।

—এমনি শান্ত ভদ্র প্রকৃতি ওর। আর এই মার্জিত রুচি আর সংযমই আমার ভালবাসাকে নিবিড়তর করে তুলছিলো।

বিপদের মুহূর্তটিও আকস্মিক ভাবেই এসে পড়লো। দু'জনের কেউই এর জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একদিন সকালে ও এলো—দু'চোখ ভরা জল। আদেশ এসেছে যাত্রা করার—লণ্ডন অভিমুখে মঁসিয়ে স্থ সা'এর কাছে পত্রবাহকরূপে। এমন কি ফেরোলে ইতিমধ্যেই একটি ছোটো ষ্টীমার অপেক্ষা করছে ওর জন্যে যতশীঘ্র সম্ভব লণ্ডন পৌছবার তাগিদে। দেখলাম, হতাশার তীব্র বেদনায় ওর শুধু কণ্ঠই রুদ্ধ হয়নি, স্থিরভাবে চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে ফেলেছে। ওকে আশা দিতে গিয়ে আমি একটা মতলব ঠিক করে

ফেললাম। জানি না, কোথা থেকে মনের এত জোর এত সাহস পেয়েছিলাম যে বলে বসলাম আমি ওর সঙ্গেই যাবো ওর পরিচারকের ছদ্মবেশে। কিন্তু তাতেই ধরা পড়বার সম্ভাবনা আছে—শেষ অবধি দু'জনে মিলে ঠিক করলাম যে আমি ওর ছদ্মবেশ নেবো আর ও যাবে আমার সহধর্মিণীর ছদ্মবেশে।

আর ইংল্যাণ্ড পৌঁছেই আমরা যদি বিয়ে করি, তাহলে এই পালিয়ে আসার কলঙ্ক মুছে যাবে। ওকে বোঝানোর আর সাহস যোগানোর জন্য যুক্তি কিছু কম ছিল না আমার—একটি মেয়ের সম্মতি না থাকলে তাকে নিয়ে কেউ পালাতে পারে না। অতএব ও দায়ী কোথায়? তাছাড়া আমার সম্পত্তির অধিকারী হোতে যাচ্ছে তাঁরই প্রিয়পাত্র—এতে মার্ক্ইস আমাকে শাস্তি তো দেবেনই না বরং খুশী হবেন। আর ততদিন আমার বহুমূল্য গহনা, হীরে জহরৎ তো আছেই।

দিন এসে গেলো। আমি আমার ঘরের দরজা বন্ধ করে অসুস্থতার ভান করে পড়ে রইলাম। তারপর ছোট্ট একটি ব্যাগে বিশেষ দরকারী কয়েকটি জিনিস আর গহনার বাক্সটি ভরে পুরুষের ছদ্মবেশ পরে বাড়ির পিছনে চাকরদের সিঁড়ি দিয়ে সোজা নেমে গেলাম। আশ্চর্য, কেউ আমাকে চিনতে পারলো না! এমন কি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার সময় বেয়ারাটাও চিনলো না! যাক্ নিশ্চিন্ত। কিছু দূরেই অপেক্ষা করছিলো ও। দু'জনে মিলে জাহাজে গিয়ে উঠলাম…স্বামি-স্ত্রী পরিচয়ে। বিনা বাধায় কেটে গেলো যাত্রা করার মুহূর্তটিও। মধ্যরাতের আগে ক্যাপ্টেনেরও দেখা মেলেনি। তিনি সদলে এসে আমাকে জানালেন, তাঁর উপর আদেশ আছে যেন আমার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি না হয়। আমি কঁতে দ আল-কে

পরিচয় করালাম আমার স্ত্রী হিসাবে। ক্যাপ্টেন ওকে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানালেন।

দিন কাটতে লাগলো স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক গতিতে। চোদ্দ দিনের দিন আমাদের জাহাজ নোঙর ফেললো প্লিমাউথে। সেখান থেকে ক্যাপ্টেনের কাছে কয়েকটা চিঠি এলো। দেখলাম, একটা চিঠি খুব মন দিয়ে পড়ে আমাকে এক পাশে ডেকে আনলেন। তারপর সঙ্কোচের সঙ্গে জানালেন, ওঁর উপর হুকুম এসেছে মার্কুইসের কাছ থেকে যে একজন তরুণী পর্তুগীজ মহিলা এই জাহাজে আছেন। তাঁকে যেন কোথাও নামতে না দেওয়া হয়। আর তিনি নিজে তাকে নিয়ে সোজা লিসবনে চলে আসেন যেন—এই হুকুমের অন্যথায় তাঁর প্রাণদণ্ড দিতে দ্বিধা করবেন না। ক্যাপ্টেন সাহেব আরও সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, এই জাহাজে একমাত্র আমার স্ত্রী ছাড়া অপর কোনো মহিলাও তো নেই—অতএব ও যে সত্যিই আমারই স্ত্রী, তার প্রমাণ আমাকে দেখাতে হবে। তা' না হলে আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা তাঁর নেই।

—"উনি তো আমারই স্ত্রী", খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই বললাম। "কিন্তু প্রমাণ করবার মত কোনো কাগজপত্রই তো আমাদের সঙ্গে নেই!"

—"দুঃখিত, অত্যন্ত দুঃখিত। ওঁকে তাহলে আমার সঙ্গে লিসবনেই ফিরে যেতে হবে। কিন্তু আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, যতদূর সম্ভব সম্মানের সঙ্গেই ওঁকে নিয়ে যাওয়া হবে। এটাও মার্কুইসের আদেশ।"

—"কিন্তু ক্যাপ্টেন, স্ত্রী তো স্বামীরই সহগামিনী?"

—"মানছি, একশোবার মানছি, কিন্তু হুকুম যে মানতেই হবে। আপনিও লিসবনে ফিরে যেতে পারেন। চাই কি আমাদের আগেই সেখানে পৌঁছতে পারেন।"

—"তবে আপনাদের সঙ্গেই যাই না কেন?"

—"সেটা যে হবার নয়। আমার উপর কড়া হুকুম আছে আপনাকে এখানে নামিয়ে দেবার। কিন্তু আমিও ভাবছি, এটা কেমন হোলো যে আপনাকে ইংল্যাণ্ডে পৌছে দেবার কথায় মার্কুইস একবারও আপনার স্ত্রীর কথা উল্লেখ করেন নি? যাই হোক, মার্কুইস যে ভদ্রমহিলাটির খোঁজ করছেন তিনি যদি আপনার স্ত্রী না হ'ন, তবে তাঁকে লণ্ডনে আপনার কাছে পৌছে দেওয়া হবে।"

—"আচ্ছা, ওর সঙ্গে কয়েকটা কথা বলে নিতে পারবো কি?"

—"নিশ্চয়ই, তবে আমার সামনে।"

কেবিনে গিয়ে কাউণ্টকে 'প্রিয়তমা পত্নী' সম্বোধন করে সব ঘটনা বললাম—ভয় ছিলো পাছে ও উত্তেজিত হয়ে সব ফাঁস করে দেয়—কিন্তু ও ধীরভাবে সব শুনে জানালে, আমাদের হুকুম না মানা ছাড়া আর গতি নেই—তবে আশা আছে শীগ্‌গিরই আবার আমরা মিলবো। ক্যাপ্টেনের সামনে কোনো কথাই বলা গেল না, তবু জানিয়ে দিলাম, লণ্ডনে পৌছেই আমি মঠবাসিনী সেই সন্ন্যাসিনীকে চিঠি দেবো—আর ও যেন পৌছেই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এদিকে আমার গহনার বাক্স দামী হীরা জহরৎশুদ্ধ ওর কাছেই রয়ে গেলো। চাইতে পারলাম না পাছে ক্যাপ্টেনের সন্দেহ হয় যে ওকে রীতিমত ধনীকন্যা দেখে আমি ঠকিয়েছি।

ভাগ্যের পায়ে নিজেদের সঁপে দিলাম। যাবার আগে চোখের জলে পরস্পরকে অভিষিক্ত করে আলিঙ্গন করলাম। ক্যাপ্টেনের চোখও শুষ্ক ছিল না।

ওকে নিয়ে যাবার পর আমাকে নামতে হোলো একটি মাত্র ব্যাগ সঙ্গে করে—তাইতে শুধু পুরুষের পোষাক, বই, কাগজ-পত্র, একটি

তলোয়ার আর একজোড়া পিস্তল। ক্রাস্টমস-এর হাঙ্গামা চুকিয়ে একটা সরাইখানায় এসে ঢুকলাম। মালিকের কাছে জানা গেল লণ্ডনে একটা দল যাচ্ছে, আমি সহজেই সেই দলে ভিড়ে পড়তে পারি। খরচ শুধু একটি ঘোড়ার দাম। মালিকই সেই দলটার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভালোই লাগলো তাঁদের। যাত্রা সুরু করলাম। কিন্তু পুঁজি তো নিঃশেষ—তাই দু'এক দিন পরেই আরও সস্তার একটি আশ্রয়ে উঠলাম। বেশ পরিচ্ছন্ন সুন্দর তিনতলা একটি বাড়ির একটি ঘর নিলাম। বাড়িওয়ালী শুধু ভদ্র নয় মনটিও ভারী নরম। সহজেই বিশ্বাস করতে পারলাম ওঁকে। অনুরোধ জানালাম আমাকে মেয়েদের পোষাক কিছু কিনে এনে দিতে—কারণ আর পুরুষের ছদ্মবেশে বাইরে বেরোবার সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই ছিল না—সম্বল তখন মাত্র পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা—সামনে অন্ধকার ভবিষ্যৎ। দুদিনের মধ্যেই নিজেকে পেলাম—কঠিন ভাগ্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সম্বলহীনা একটি তরুণী—যার জানা হোয়ে গেছে সোজা পথে চলতে গেলে ভয় করলে চলবে না।

দশ শিলিং সপ্তাহের ভাড়া। তাও বেশী দিন চালানো সম্ভব হোলো না। তাছাড়া আমার প্রতি লোকদের বিশেষ করে যুবকদের কৌতূহল একটু বাড়াবাড়ি রকম উগ্র হোতে লাগলো। শেষ অবধি হাতের আংটিটা বাড়ির পাশেই এক বৃদ্ধকে বেচে দিলাম—দেড়শ' গিনি পাওয়া গেল। বাড়িওয়ালীও আমার অবস্থা বুঝে আরও সস্তার একখানা ঘর খোঁজ করছিল। বাইরে খেতে যাবার সঙ্গতি ছিল না বলে একটি পরিচারিকাও জোটাতে হোয়েছিলো—আর সেটাই সবচেয়ে বিরক্তিকর—ভাবতাম, দুনিয়াশুদ্ধ সবাই বুঝি ষড় করে আমাকে ঠকাতে চায়। আসলে

একটু-আধটু চুরি লোকজন করেই থাকে কিন্তু যার কাছে দৈনিক এক শিলিংএর বেশী খরচ করা সম্ভব নয়, তার কাছে ওই একটু চুরিও অনেকখানি গায়ে লাগে। বেশী কিছু খাওয়া ছেড়ে দিলাম। শুধু রুটী আর জল। দিনে দিনে শরীরও হোতে লাগলো শীর্ণ থেকে শীর্ণতর। এমনি সময়ে একদিন আপনার ওই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি চোখে পড়লো—চোখে পড়লো বিভিন্ন পত্রিকায় আপনার প্রতি কটাক্ষ। স্বভাব যাবে কোথায়? কৌতূহল দমন করা সহজ হোলো না—তারপর তো সবই জানা আপনার—হ্যাঁ, ইতিমধ্যে একটা ঘটনা বলা হয়নি। আমি ইংলণ্ডে পৌছবার দিন তিনেক পরই আমার সন্ন্যাসিনী মাসীকে একটি চিঠি লিখে সব ঘটনা জানাই—আর তার সঙ্গে সকাতর মিনতি জানাই, যাকে মনে মনে স্বামী বলে বরণ করেছি তাকে রক্ষা করতে, তাকে আশ্রয় দিতে। আরও জানালাম, যত দিন না আমাদের দু'জনার মিলনের পথে সব বাধা সরে যায় তত দিন লিসবনে ফিরবো না। চিঠিটা প্যারিস দিয়ে মাদ্রিদে পাঠালাম—স্থলপথে এটাই সবচেয়ে সোজা রাস্তা। দীর্ঘ তিনটি মাস পরে মাসীর চিঠি পেলাম। সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন মহিলাটির পৌছানো খবর মার্কুইসকে দিলে তিনি সোজা আদেশ দেন, তার একটা চিঠি সমেত মহিলাটিকে সন্ন্যাসিনী মাসীর আশ্রমে পাঠিয়ে দিতে। চিঠিটায় মাসীকে লিখে জানিয়েছেন যে তাঁর বোনঝিকে পাঠানো হোলো, এবার মাসী যেন তাকে ঘরে চাবি-বন্ধ করে রেখে দেন। সৌভাগ্যক্রমে আমার চিঠিটা মাসী আগেই পেয়েছেন। তিনি ওকে নিরাপদেই একেবারে ঘরে বন্ধ করে রাখলেন যাতে কেউ কিছু টের না পায়। এদিকে মার্কুইসকে চিঠি দিলেন, যাকে পাঠানো হোয়েছে সে তাঁর বোনঝি নয়, তারই

ছদ্মবেশে একটি তরুণ। এখন মার্কুইস তরুণটিকে এখান থেকে সরাবার ব্যবস্থা করলেই ভালো—কারণ আশ্রমে পুরুষদের বসবাস নিষিদ্ধ।

ইতিমধ্যে কাউণ্টের সঙ্গেও মাসী দেখা করেছেন, ও মাসীর পায়ে পড়ে ক্ষমা চেয়েছে আর আমাদের দু'জনার জন্যই ভিক্ষা চেয়েছে ওর স্নেহের আশ্রয়ের—আমার সমস্ত হীরা জহরৎ গহনাগুলিও মাসীর হাতে তুলে দিয়েছে। মাসী ওর সততায় আর সুন্দর ব্যবহারে খুব খুসী।

এদিকে মার্কুইস চিঠি পড়ে নিজেই চলে এলেন মাসীর কাছে। মাসী তাঁকে ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আশ্রমের সুনাম আর পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এখনি একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার, আর সব ব্যাপারটাই সম্পূর্ণ গোপন থাকা দরকার। কারণ তাঁর নিজের মান-সম্ভ্রমও এর উপর নির্ভর করছে। কাউণ্ট যে মাসীকে সব গহনাগুলি ফিরিয়ে দিয়েছে তাও জানিয়ে দিলেন। মার্কুইস সব ঘটনাটাই গোপনে রাখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করলেন—তবে উনি যে একটুও রাগ করেন নি তার প্রমাণ মাসীকে সহাস্য পরিহাসে ওর জিজ্ঞাসা—এমন একটি অপরূপ সুন্দর কান্তি তরুণকে যে তার সঙ্গদান করতে পাঠিয়েছিলেন তার জন্যে মাসী নিশ্চয়ই মার্কুইসকে ক্ষমা করবেন। যাই হোক, কাউণ্টকে সঙ্গে নিয়ে তখনি তিনি চলে গেলেন। তারপর থেকে চিঠি লেখার দিন অবধি মাসী ওদের আর কোনো খবরই পাননি। ওদিকে সারা লিসবন জুড়ে উল্টোটাই রটেছে যে কাউণ্ট লণ্ডনে আর মার্কুইস আমার প্রতি কোনো দুর্বলতার জন্যেই আমাকে লুকিয়ে রেখেছেন! এটাও ঠিক, মার্কুইস আমার সব খবরাখবর রাখার জন্য চর নিযুক্ত করেছেন। আর

মাসীর কথা মত আমিও তাঁকে লিখেছি যে আমি এখনি লিসবনে ফিরতে রাজী, যদি উনি কথা দেন যে সাধারণ সমক্ষে সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত ভাবে কাউণ্টের সঙ্গে আমার পরিণয় হবে। তা না হলে ইংল্যাণ্ডেই আমি সারাজীবন কাটাব—এখানে আর যাই হোক, মুক্ত স্বাধীন জীবনযাত্রায় পদে পদে আইনের বাধা আসবে না।

এখন আমি মার্কুইসের উত্তরের অপেক্ষা করছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মার্কুইস আমার সর্তে রাজী হবেন আর খুশী হয়েই আমার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেবেন। বাবার মৃত্যুর খানিকটা ক্ষতিপূরণ হবে।

* * *

—"কি ভাবছো ?"

—"কিছু না !"

—"মোটেই কিছু না নয়—ভাবছো যে আমার প্রেমে তুমি মরতে পারো, তাই না ? কিন্তু দিন দিন যে ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছো—রাত কাটাচ্ছো নিদ্রাহীন চোখ মেলে, এ কি দেখিনি আমি ? নাঃ, যদি সত্যিই আমাকে খুশী দেখতে চাও তবে বেরিয়ে এসো ঘোড়ায় চড়ে···দিন-রাত এই নির্জন অলস মুহূর্তগুলোকে কোন মতে পার করে দিলেই কি স্বাস্থ্য থাকে ?"

—"পলিন, প্রিয়তমা—তোমার কোনো কথাই তো আমি না রেখে পারি না—কিন্তু ফিরে এসে ?"

—"দেখবে আমি কৃতজ্ঞ—দেখবে তোমার আহারে রুচি—রাতের ঘুম—"

—"ব্যস্ ব্যস্—এক্ষুনি ঘোড়া সাজাতে বলছি।"

শুভ্র কোমল হাতখানিতে চুম্বনের মৃদু স্পর্শ দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম কিংসটনের রাস্তায়। আমাদের দু'জনার পরিচয় আজ নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত—কিন্তু আমার পিপাসিত মনের তৃষ্ণা যে শুধু বন্ধুত্বে তৃপ্ত হতে চায় না—ক্ষুব্ধ, লুব্ধ আকাঙ্ক্ষার জ্বালা আমার রাতের ঘুম আমার দিনের আনন্দ সব কিছু হরণ করেছে। অথচ পলিন দিনে দিনে ভরে উঠছে অপরূপ মাধুর্যে—কোন অফুরাণ লাবণ্যের সুধা-স্রোতে? চিন্তায় বিভোর—ভ্রূক্ষেপ ছিল না আশে-পাশে—হঠাৎ কিসের ধাক্কায় ঘোড়াটা তীব্রবেগে মুখ থুবড়ে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে আমিও একেবারে শূন্যে লাফিয়ে উঠে সজোরে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলাম। ওঠবার ক্ষমতা রইলো না যন্ত্রণায়—সৌভাগ্যক্রমে দেখি, কিংসটনের ডিউকের প্রাসাদের সামনেই পড়েছি। ডিউকের লোকজনের সাহায্যে বাড়ি এলাম গাড়ীতে শুয়ে। বাড়ি এসে বিছানায় শুয়েই ডাক্তারকে খবর দিলাম।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করলেন—বেশী রকম মচকে গেছে। হাড়-ভাঙ্গার সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা অমূলক। অবশ্য এ-ও জানালেন, হাড় ভাঙ্গলে মন্দ হতো না, তাঁর কৃতিত্ব ফলাবার সুযোগ ঘটত।

এতক্ষণ পলিনের সঙ্গে দেখা না হওয়াতে আশ্চর্য লাগছিলো। শুনলাম ও বাড়ি নেই, কোথায় বেরিয়েছে। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে এসে হাজির—গভীর উত্তেজনায় সমস্ত মুখখানি রক্তরাঙা—দুটি চোখে অনুতপ্ত বেদনার ছায়া—

আমার পাশে বসে পড়ে বললে—"শুধু আমার জন্যেই তোমার এই দশা, আমার জেদের ফলেই তোমাকে হাড়ভাঙ্গার নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে—"

বলতে বলতে ওর দুটি চোখ ছাপিয়ে ঝর-ঝর করে জল পড়তে লাগলো—অনুশোচনা আর সমবেদনা? না আরও কিছু?...দেখলাম,

ওর মুখখানি মৃতের মত বিবর্ণ, মূর্ছাহতের মত আমার পাশে ঢলে পড়ছিলো—তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেললাম।

—"করুণাময়ী, শোনো শোনো, অত অধীর হোয়ো না, ভাঙ্গেনি, শুধু মচকানোর ব্যথা"—

—"সর্বরক্ষা! উঃ ঝি-চাকরগুলো কি মিথ্যাই না বলতে পারে? আমাকে কি ভয়ই না পাইয়ে দিয়েছিলো! দেখো দেখো এখনও আমার বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপছে!"

—"পারছি—বুঝতে পারছি—আমার সমস্ত অনুভূতি দিয়েই পারছি, এই আকস্মিক দুর্ঘটনা আমার সারা মন যে ভরিয়ে দিলে!"

তৃষিত ব্যাকুল দুটি অধর দিয়ে ওর রক্তিম কোমল স্ফুরিত দুটি অধর স্পর্শ করতেই অনুভব করলাম প্রতিদান, এ যে কী প্রাপ্তি, এ যে কী পরম প্রাপ্তি, আমার সমস্ত অণু-পরমাণু ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো নিবিড় পুলকে।

হাসছে পলিন।

—"হাসছো যে? কেন হাসছো বলতেই হবে।"

—"প্রেমের এই চকিত ছলনায়, যা সব সময় জয়ী হয়। জানো, আমি সেই বুড়োটার কাছে গিয়েছিলাম আমার আংটিটা ফিরিয়ে আনতে। ওটা তোমাকে দেবো, আমার ওই ছোট্ট চিহ্নটি সারাজীবন তোমার কাছে থাকবে"—

—"পলিন—পলিন, আমার মনটাকে তুমি কি ভাবো বলো তো? শোনো, 'সোনার চেয়ে সোনামুখের ঢের বেশী দাম বুঝবে সে'— চাই না তোমার তুচ্ছ জহরৎ—তোমার প্রেম ঢের বেশী দামী"

—"আচ্ছা গো আচ্ছা! আর যদি দুটোই পাও? শোনো, এখন থেকে আমার যতদিন না ডাক আসে ততদিন আমরা দু'জনে

থাকবো মধুচন্দ্র-উৎসবমত্ত দম্পতির মত, কেমন? শোনো, তুমি নড়বে না এই বিছানা থেকে—আমাদের খাবার এইখানেই দেবে। জানো, এই ক'দিন পাশাপাশি থেকে গোপন প্রেমের দ্বন্দ্বে আমিও ক্লান্ত হোয়ে উঠেছিলাম। আমি আজ ভোরে মনে মনে ভেবেছিলাম ভেঙে দেবো এই ছলনার লুকোচুরি, নিবেদন করবো আপনাকে তোমার ব্যগ্র-ব্যাকুল বাহুবন্ধনে। যতক্ষণ না সেই 'কাল' পত্র আসে আমাদের বিচ্ছেদের সূচনা জানিয়ে ততক্ষণ আমি থাকবো তোমার পাশে—"

—"সেই পত্রবাহক রাস্তায় চোর-ডাকাতের হাতেও পড়তে পারে!"

—"অত সৌভাগ্য আমাদের বরাতে নেই প্রিয়তম!" চুপ করে চেয়ে থাকি পলিনের মুখের দিকে।

পর্তুগালের সেরা সুন্দরী—কোন বনেদী, সম্ভ্রান্ত, অভিজাত পরিবারের শেষ প্রতীক—আজ প্রেমের মাধুর্যে অঞ্জলি পূর্ণ করে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে—ক'টি মুহূর্ত ভরে দিতে রঙে-রসে, ছন্দে-সুরে—তার পর মিলিয়ে যাবে এই চকিত বিদ্যুল্লেখা মনের প্রান্ত ভরে দিয়ে ঘন কালো মেঘে—

নিঃশব্দ বেদনায় মন ভরে ওঠে।

এই বাড়িটা ছাড়বো না ঠিক করে ফেললাম। অন্ততঃ যত দিন পলিন এখানে আছে। ও সহজে বাড়ি থেকে বেরোতো না, এক রবিবার উপাসনায় যাওয়া ছাড়া। ওর মনটা ছিলো ভারী ধর্মপ্রবণ কিন্তু স্বাধীন চিন্তাও কোরতো।

আমি সোজা হুকুম দিয়েছিলাম আমার সঙ্গে কেউ যেন দেখা করতে না আসে—আমার বাড়িতে কেউ যেন না ঢোকে। এমন কি ডাক্তার অবধি নয়। সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি এখন

ক্লেয়ারমঁকে মাদ্রিদ অবধি পৌঁছে দিতে পলিনকে। যাবার আগে ওর শেষ কথা—

'একটি মিনতি রেখো। আমি না ডাকলে কখনো লিসবনে এসো না। না—কোনো কারণ দেখানোর প্রয়োজন আছে কি? তুমি বুঝবে, আমার মনকে অশান্ত বিক্ষুব্ধ করে তুলো না। অসুখী চঞ্চল মনে সব কিছু করা যায় কিন্তু তুমিতো আমাকে ভালবাসো তুমি কি চাইবে আমার মান, সম্ভ্রম, ন্যায়নিষ্ঠা সব ভাসিয়ে দেবার একমাত্র কারণ হোতে? আমি কি স্থির করেছি জানো? দিনরাত মনকে বোঝাবো আমার স্বামী ছিলে তুমি, দুজনার মিলিত দিন কেটে গেছে, আজ আমি বিধবা, আমি লিসবন যাচ্ছি দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্যে।'

কোথায়—কোথায় যেন একটা ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে এই দু'টি বিচ্ছেদে—আমার জীবনের দু'টি মর্মান্তিক বিচ্ছেদে। যা আমার সমস্ত সত্তাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, যার গভীর ক্ষত সারা জীবনের অশ্রুসিঞ্চনেও মিলিয়ে যায়নি।

একটি পনেরো বছর আগে হেনরিয়েটার বিদায়ের দিন আর একটি আজ। আশ্চর্য! এই দুটি নারীর চরিত্রে কি আশ্চর্য সাদৃশ্য! শুধু শিক্ষার সাধনা একজনকে আরও বিকশিত হাস্যোচ্ছলা, আরও সুরুচিসম্পন্না আরও সংস্কারমুক্ত করে তুলেছে অপরের চেয়ে। পলিনের ছিল আভিজাত্যের গর্ব, ও আরও গম্ভীর, আরও ধর্মপ্রবণা কিন্তু হেনরিয়েটার চেয়ে বেশী আবেগময়ী। এই দু'টি নারীই আমার জীবন ভরে দিয়েছে সুধা-রস-ধারায়!

কালের প্রলেপে মিলিয়ে গেছে দু'জনেই, যেমন সব কিছু মিলিয়ে যায়। কিন্তু বিস্মৃতির আবরণও তো মাঝে মাঝে সরে যায়, তখন

দেখি হেনরিয়েটার হাসিভরা মধুর মুখখানিই উজ্জ্বলতর হোয়ে ফুটে উঠেছে মনের পটে। কেন তা' আজ বুঝি। যেদিন হেনরিয়েটাকে পেয়েছিলাম সেদিন ছিলাম বাইশ বছরের তরুণ, ছিলো স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্ন রচনার বয়স। আর পলিন এসেছিলো সাইত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন একটি মনের কাছে, আজ বেশ বুঝতে পারি বয়সের ভার কেমন করে মনের মধ্যে বিচারের দাঁড়িপাল্লা ঝুলিয়ে তার অকারণ পুলকের গতিরোধ করে।

ফিরে এলাম লণ্ডনে। সমস্ত রাত্রি গভীর অবসাদে কাটলো। ভোরবেলা আমার ছোকরা চাকর জারবি ঘরে ঢুকলো গরম চকোলেটের গ্লাস হাতে করে।

—"আপনার পরিচারিকা জানতে চায় সেই বিজ্ঞাপনটা আবার ঝুলিয়ে দিতে হবে কি না"—

—"শয়তানী! ও কথা বললে আমি ওকে খুন করে ফেলবো।"

—"রাগ করবেন না, ও আপনার ভারী অনুগত। আপনাকে অমন কাতরভাবে মুষড়ে পড়তে দেখেই ও জিজ্ঞাসা করছিলো।"

—"দূর হও! আর বলে রাখছি ও সম্বন্ধে কথা বলা তো দূরে, মনেও স্থান দেবে না তোমরা"—

আমার আনন্দ তখন কল্পনাতীত। উৎসাহের চোটে নির্দিষ্ট সময়ের এক ঘণ্টা আগে গিয়েই হাজির। খুবই সাদামাটা একটা কালো রঙের পোষাক পরে। ভিতরে ঢুকে কাউকেই দেখতে পেলাম না। একজন প্রহরী, শান্ত্রী অবধি না। ছোটো একটা সিঁড়ি দেখে সোজা উঠে গেলাম, সামনেই খোলা দরজা—ঢুকে পড়ে দেখি চিত্রশালা। একজন লোক এগিয়ে এসে আমাকে সংগ্রহগুলি দেখাবেন কি না, জানতে চাইলেন।

—"আমি এখানে শিল্প-সংগ্রহ দেখতে আসিনি। এসেছি রাজার দর্শনার্থী হয়ে—তিনি যে জানিয়েছিলেন বাগানেই থাকবেন"—

—"ঠিক এই মুহূর্তে তো তিনি কন্সার্ট-এ বাঁশী বাজাচ্ছেন। আহারের পর এই-ই তাঁর অবসর বিনোদনের রীতি। রোজই তাই করেন। আচ্ছা, কোনো সময় ঠিক করে দিয়েছিলেন কি ?"

—"হ্যাঁ, চারটার সময়—হয়তো ভুলে গেছেন তাহলে।"

—"তিনি কখনোই ভোলেন না। ঘড়ির কাঁটা ধরে ওর কাজ—আপনি বরং বাগানেই অপেক্ষা করুন"—

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না—দেখলাম উনি আসছেন। সঙ্গে সেক্রেটারী আর একটা চমৎকার স্প্যানিয়েল কুকুর। যেই আমাকে দেখতে পেলেন অমনি আমার নাম ধরে ডাকলেন মাথার বিশ্রী পুরানো টুপীটা খুলে নিয়ে। কি জলদগম্ভীর স্বর! ঠিক এমনটিই আমি চেয়েছিলাম।

নিঃশব্দে চেয়ে রইলাম।

—"কি! কথা বলতে পারেন না আপনি? আপনিই না আমাকে লিখেছিলেন ?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই মনে করতে পারছি না, কি বলবো? আমি ভাবতে পারিনি রাজার উপস্থিতি আমার সমস্ত অনুভূতি এমন করে আচ্ছন্ন করে দেবে। আমি ভবিষ্যতে বরং প্রস্তুত হোয়েই আসবো। লর্ড মার্শালের আমাকে সাবধান করে দেওয়া উচিত ছিলো—"

—"ওহো' উনি আপনাকে চেনেন নাকি? আসুন বেড়াতে বেড়াতে কথা হবে। কি বলতে চেয়েছিলেন আমাকে? আচ্ছা এই বাগানটা কেমন লাগছে বলুন তো?"

ওঁর বাগানের সম্বন্ধে মতামত জানতে চাইলেন! বলা উচিত ছিলো এ সম্বন্ধে কোনো ধারণাই আমার নেই। কিন্তু প্রথম সাক্ষাতেই অজ্ঞতা প্রকাশ! যা' থাকে বরাতে বলে সোজা বললাম—"চমৎকার!"

—"কিন্তু ভার্সাই-এর বাগান এর চেয়ে অনেক সুন্দর!"

—"তা' ঠিক কিন্তু সেটা শুধু অজস্র ফোয়ারার জন্যে।"

—"সত্যিই তাই; কিন্তু এখানেও আমার ত্রুটি নেই কিছু। জলই নেই এখানে—তিনশ' হাজার ক্রাউন খরচ করেছি কিছুই হয়নি।"

—"তিনশ'—হাজার ক্রাউন! যদি এত খরচ করা হয়ে থাকে তবে জল তো প্রচুর পরিমাণে ওঠার কথা"—

—"ওহো! আপনি দেখছি জলের কারিগরিতে বিশেষজ্ঞ!

বলা উচিত কি ভুল দেখছেন? অসন্তুষ্ট করা তো মোটেই সমীচীন নয়। তাই চুপচাপ মাথা হেঁট করে রইলাম—যে অর্থে হ্যাঁ, না, দুই-ই বোঝায়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এবার উনি প্রসঙ্গটা চেপে গেলেন। তারপর বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, ভেনিসের নৌশক্তি আর সৈন্যসংখ্যা কত? ধাতস্থ হলাম আমি।

—"বিশটি যুদ্ধজাহাজ আর বহুসংখ্যক নৌকা।"

—"আর স্থলপথে ?"

—"সত্তর হাজার সৈন্য। সবাই রাষ্ট্রের প্রজা। সেদিক থেকে হিসাব করতে গেলে গ্রাম-পিছু একজন লোক"—

—"না আপনার উক্তি ভ্রান্ত। মনে হয় আষাঢ়ে গল্পে আমাকে ভোলাতে চান। তার চেয়ে আপনাদের করপ্রথা সম্বন্ধে বলুন।"

রাজা-রাজড়ার সঙ্গে এভাবে কথোপকথন আমার এই প্রথম। ওঁর বলার ধরন, হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়া, এসব দেখে নিজেকে মনে হচ্ছিল যেন আমি কোনো ইতালীয় নাটকে অভিনয় করছি—যেখানে একটা কথা ভুল হোয়ে গেলেই দর্শকদের নিষ্ঠুর টিটকারী সুরু হবে। যাই হোক, আমি বললাম, করপ্রথার পুঁথিগত জ্ঞানের সঙ্গেই আমি পরিচিত।

—"তাই-ই আমি চাই।"

—"তিন রকম কর আছে। একটি ধ্বংসাত্মক, একটি দুর্ভাগ্যক্রমে অতি প্রয়োজনীয় আর একটি নিঃসংশয়ে ভালো। প্রথমটি রাজকর দ্বিতীয়টি যুদ্ধকর, তৃতীয়টি জনপ্রিয় কর।"

—"বেশ বেশ, কিন্তু রাজকরকে ধ্বংসাত্মক বলার অর্থ কি ?"

—"প্রজার তহবিল শূন্য করেই তো রাজার কোষাগার পূর্ণ হয়। তাছাড়া এতে মুদ্রা চালু থাকতে না পারায় ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হোয়ে রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে।"

—"তবু যুদ্ধকরকে তো প্রয়োজনীয় বলে স্বীকার করছেন ?"

—"দুর্ভাগ্যক্রমে প্রয়োজনীয়—কারণ যুদ্ধ যে সর্বনাশা, আত্মরক্ষার প্রস্তুতি তো রাখতেই হবে—আর তৃতীয় করটির জনপ্রিয়তার কারণ, সেটি জনকল্যাণেই ব্যয়িত হয়, প্রয়োজনীয়

জলসেচ, প্রণালী খনন, বিজ্ঞানচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতি বিভিন্ন হিতকর কাজে”—

—“হ্যাঁ এ কথাগুলি ঠিকই। আচ্ছা আপনি নিশ্চয়ই কাল্‌সাবিগিকে চেনেন ?”

—“নিশ্চয়ই ! আমরা একসঙ্গেই তো ‘জেনোস’ লটারী প্রতিষ্ঠা করি—প্রায় সাত বছর আগে প্যারিসেতে—”

—“কি জানি আপনাদের ঐ ‘জেনোস্’ লটারীটা আমার একটুও ভালো লাগেনি। মনে হয় স্রেফ জুয়া ছাড়া কিছু নয়। জিতবার স্থির নিশ্চয়তা জানলেও আমি কখনও ওতে যোগ দিতাম না।”

—“ঠিকই বলেছেন। কারণ, জনসাধারণ কখনোই লটারীর পিছনে ছুটতো না যদি না তার আড়ালে ওই ভূয়া নিরাপত্তার লোভটি থাকতো।”

হঠাৎ কথা পালটিয়ে রাজা আমার দিকে চেয়ে বললেন,—“আচ্ছা, আপনি যে অত্যন্ত সুপুরুষ, সেকথা আপনি জানেন ?”

—“এ-ও কি সম্ভব যে এতক্ষণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনার পর আপনি আমার মধ্যে সব গুণ ছেড়ে শুধু ওই তুচ্ছ রূপটুকুই দেখলেন, যেটা শুধু আপনার দেহরক্ষী নির্বাচনেই প্রয়োজন !”

হেসে ফেললেন রাজা—পরক্ষণেই বললেন,—“লর্ড কেইথ তো চেনেন আপনাকে। আমি তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে কথা বলবো।”

টুপীটা মাথা থেকে খুলে নিলেন—বুঝলাম বিদায়ের ইঙ্গিত। সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম।

তিন-চার দিন পরে লর্ড মার্শাল আমাকে ডেকে পাঠিয়ে জানালেন, রাজা খুব খুশী আমার সঙ্গে সেদিনের পরিচয়ে, আর আমার জন্যে কাজের চেষ্টাও করবেন বলেছেন। খুব উৎসুক হোয়ে

রইলাম, কোন কাজের জন্য ডাক আসে…কিন্তু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নাই।

এই স্মৃতিকথা লেখার সময়তেই রাজা ফ্রেডারিকের বোন ডাচেস অব্ ব্রান্সউইক সকন্যা এসেছিলেন রাজার কাছে। পরের বছরই প্রুশিয়ার যুবরাজ ওঁর কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। ওঁদের আগমন উপলক্ষে রাজা একটি ইতালীয় অপেরা অনুষ্ঠানের আদেশ দেন। সেখানে সেই উৎসবে রাজাকে আবার দেখলাম—কালো পোষাক, প্রতিটি সেলাইএর উপর সোনার কাজ, কালো সিল্কের মোজা—সব জড়িয়ে কেমন একটা হাস্যকর মূর্তি—যেন অভিনয়ের ঠাকুর্দা—প্রতাপশালী সম্রাট নয়। এক বগলে লম্বা টুপী আর এক হাতে বোনের হাতটি ধরে উৎসব-গৃহে প্রবেশ করলেন। প্রত্যেকেই নির্বাক হোয়ে চেয়ে রইলো ওঁর দিকে—এক বৃদ্ধরা ভিন্ন রাজাকে ইউনিফর্ম ছাড়া অন্য কিছু কখনও পরতে দেখেছে কি না স্মরণেও আনতে পারে না।

রাজার প্রাসাদ দেখেছি—তাই দেখেছি সেখানে অন্যান্য বিরাট সুসজ্জিত কক্ষগুলির সঙ্গে রাজার নিজস্ব শয়নকক্ষটির কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! ছোট্টো একটি ঘর—একধারে পর্দার আড়াল দেওয়া অতি সাধারণ ছোটো একটি বিছানা। কোনো পাদুকা, কোনো রাত্রিবাস কিছুই নাই, একটি পুরানো রাত্রে পরার টুপী ছাড়া। শীতের সময় ওই টুপীটির উপরই তিনি ওঁর বাইরের টুপীটি পরেন। ঘরের একধারে একটি সোফা, তার সামনে একটি টেবিল—কাগজ কলম আর দোয়াতদানীতে স্তূপীকৃত, আধপোড়া অবস্থায় খাতাও কয়েকটি দেখলাম। ওই ঘরখানির পরিচারক জানালে—ওই কাগজপত্র আর খাতাগুলিতে গত যুদ্ধের ইতিহাস লেখা আছে।

আকস্মিক ভাবে কয়েকটি খাতা পুড়ে যায়। সম্প্রতি রাজা আর লিখছেন না—তার পরে বোধহয় অসমাপ্ত লেখাটা আবার ধরেছিলেন। কারণ, তাঁর মৃত্যুর ঠিক পরেই ওটি প্রকাশিত হয়।

পাঁচ-ছয় সপ্তাহ কেটে যাবার পর লর্ড কেইথ জানালেন যে, রাজা আমাকে একটি অফিসারের পদে নিযুক্ত করেছেন—সেটি হোলো পমিরেনিয়ান ক্যাডেটদের দলপতি বা শিক্ষক—সম্প্রতি এই ক্যাডেট দলটি খোলা হোয়েছে। সংখ্যায় মাত্র পনেরো জন ক্যাডেট—দলপতি পাঁচ জন, প্রত্যেকের অধীনে তিন জন ক্যাডেট। আর পারিশ্রমিক ছ'শো ক্রাউন—আহার, ক্যাডেটদের সঙ্গে একই টেবিলে। আর কাজটা? ক্যাডেটদের সঙ্গে সর্বত্রই থাকা; এমন কি রাজসভাতেও অবশ্য তখন ফিতাটিতা বাঁধা ইউনিফর্ম পরতে হবে। আমাকে এখনি মনস্থির করে ফেলতে বলা হোয়েছে কাজটা নেওয়া সম্বন্ধে। কারণ বাকী চার জন দলপতি অথবা শিক্ষক নিযুক্ত করা হোয়ে গেছে। আমি লর্ড কেইথকে জানালাম, পরদিন নিশ্চয়ই আমি মতামত জানাবো, আজকের দিনটা চিন্তা করে নিয়ে।

কি অসীম প্রচেষ্টায় প্রবল হাস্য দমন করে বাড়ি ফিরে এলাম, সে আমিই জানি। কিন্তু আরও বেশী অবাক হোলাম শুনে এই পনেরো জন পমিরেনিয়ান রীতিমত ধনী আর অভিজাত বংশীয়। তিনটি বিরাট হলঘর আসবাবপত্র শূন্য এবং কয়েকটি ছোটো ছোটো সাদা চুণকাম করা শোবার ঘর—শয্যা আর শয্যাধার দুই-ই শোচনীয়! একটা কাঠের টেবিল আর দুটি চেয়ার, ব্যস! ক্যাডেটরা জোর বারো-তেরো বছর বয়সের হবে। টাইট পোষাক, রুক্ষ চুল ছোটো করে ছাঁটা, বিশ্রী বোকা-বোকা ভাব আর যন্ত্রের মত ভঙ্গী। তাদের শিক্ষকদের তো প্রথমে ভৃত্যশ্রেণীতেই ফেলেছিলাম—পরিচয় পাবার আগে।

হঠাৎ কে যেন বললে 'ঐ জারিনা (রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী) আসছেন'। উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখি, সামনেই গ্রেগরী আরলফএর দীর্ঘ বলিষ্ঠ মূর্তি আর তার পিছনে একটি মুখোশ-ঢাকা মূর্তি অতি সাধারণ হতশ্রী পোষাকে আচ্ছাদিত। লক্ষ্য করলাম মুখোশ-ঢাকা মূর্তিটি কেমন স্বচ্ছন্দভাবে জনতার মধ্যে মিশে গেলো। কত জায়গায় সম্রাজ্ঞীর সম্বন্ধে বিভিন্ন আলোচনা জটলা ইত্যাদি স্বাভাবিক নিয়মেই চলেছিলো। দেখলাম, সেই সব সমাবেশের এক পাশে, তাদেরই একজনের মত মূর্তিটি স্থির হোয়ে রয়েছে। সাম্রাজ্ঞীর সম্বন্ধে জনসাধারণের মনোভাব যা কোনো দিনই তাঁর কর্ণগোচর হোতো না, সেই সব মন্তব্য আর মতামত···এমন কত কিছু আলোচনা যা তাঁর পক্ষে এতটুকুও শ্রুতিমধুর নয়, যা সম্রাজ্ঞীর গর্বে সহজেই আঘাত হানে, এমন সব মন্তব্যই নিঃশব্দে জেনে চললেন সম্রাজ্ঞী। আভিজাত্যে আঘাত হানলেও অভিজ্ঞতার হোলো অমূল্য

কিছুদিন কেটে গেলো রাশিয়াতে। তবে মস্কোতে থাকার সময় একথা বার বার মনে হয়েছিলো যে মস্কোতে না এলে রাশিয়া দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কারণ, পিটাসবুর্গ ঠিক রাশিয়া নয় প্রকৃতপক্ষে ওটা শুধু রাজধানী। জাতির প্রকৃত পরিচয় পাবার জন্যে মস্কো। মস্কোর অধিবাসীদের ধারণা, উচ্চকাঙ্ক্ষা ছাড়া বেঁচে থাকা মৃত্যুরই সামিল। আর মস্কোর বাইরে বেঁচে থাকাটাও সেই একই কথা। পিটাসবুর্গের প্রতি ওদের ঈর্ষা আর সন্দেহ সদাজাগ্রত। ওদের ধারণা ওদের ধ্বংসের মূল ঐ পিটাসবুর্গ। রূপমাধুরীতেও মস্কোর ললনারা হার মানায় পিটাসবুর্গকে। মস্কোর আবহাওয়াটাও দেহে, মনে সজীবতা এনে দেয়।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম এই রাশিয়ান জাতিটার মধ্যে। সেটা হোলো কয়েকটা বিষয়ে এদের অসাধারণ সংযত ভদ্রতা। মস্কোতেও বেশ অভিনব উপায়ে আমার একটি সঙ্গিনী জুটেছিলো; তার নাম 'জায়েরা'—কিন্তু কখনও কোনো কৌতুহলী দৃষ্টির প্রশ্ন শুনিনি—মেয়েটি কে? আমার কন্যা সঙ্গিনী পরিচারিকা?' অকারণ কৌতুহলের প্রগলভ্‌তা এদের মধ্যে দেখিনি। তবে দেখেছি আহার্যের প্রাচুর্যতা। আত্মীয়, বন্ধু, পরিচিত সবার জন্যে ওদের খাবার ঘরের দরজা খোলা। যখন তখন কোনো খবর না দিয়ে পাঁচ-ছয়জন অতিথির আগমন, এমন কি সারা পরিবারের আহারপর্ব শেষ হবার পরও, তাতে তারা অভ্যস্ত। কখনোও কোন রাশিয়ানকে বলতে শোনা যাবে না—"বড্ড দেরী করে ফেলেছেন. আমাদের তো খাবার পর্ব শেষ।" ওদের মধ্যে সে নীচতা নেই।

ঠিক করেছিলাম শরতের প্রথমেই পিটাসবুর্গ থেকে বিদায় নেবো। কিন্তু কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধু জানালেন, সম্রাজ্ঞী দি গ্রেট ক্যাথারিণের সঙ্গে পরিচয়ের আগে চলে যাবার কোনো অর্থই হয় না। আমারও তাই মনে হোলো—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার মত কাউকে খুঁজে পেলাম না। শেষে একজন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, ভোরবেলা সম্রাজ্ঞীর গ্রীষ্মকুঞ্জে বেড়াতে যেতে—সেখানে সম্রাজ্ঞী প্রত্যহ আসেন।" আর যদি সেখানে তাঁর দৃষ্টিপথে পড়তে পারি তবে খুব সম্ভব তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ থেকেও বঞ্চিত হবো না।

একদিন ভোরে গ্রীষ্মকুঞ্জে বেড়াচ্ছিলাম—আর পথের দু' ধারে সাজানো পাথরের মূর্তিগুলিকে সকৌতুকে লক্ষ্য করছিলাম। কারণ মূর্তিগুলি যেমন বিকৃত-রুচির পরিচায়ক তেমনি কুৎসিত, স্থূল [illegible] ভঙ্গিমা। পাথরের বেদীগুলির উপর মূর্তিগুলির পরিচিতি—তাও

তবুও রাজসভায় অবাধ অধিকারের আশায় উৎফুল্ল হোয়ে উঠলাম। প্রত্যহ গ্রীষ্মকুঞ্জে ভ্রমণ সুরু করলাম এবং সাম্রাজ্ঞীর সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাতের সুযোগ জুটে গেলো। এইবার উনি একজন অফিসারকে পাঠিয়েছিলেন আমাকে ডেকে আনতে। এই দিন একটা আসন্ন উৎসব সম্বন্ধে কথা বলছিলাম, খারাপ আবহাওয়ার জন্যে সেটা স্থগিত থাকে। সম্রাজ্ঞী জিজ্ঞাসা করলেন, ভেনিসে সচরাচর এমন উৎসব হোয়ে থাকে কি না। সবিনয়ে জানালাম, আবহাওয়ার কথা ধরতে গেলে আমার দেশ রাশিয়ার চেয়ে সুখী। কারণ সোনালী রোদে-ভরা ঝকমকে দিনই যে দেশে স্বাভাবিক যেখানে অমন একটি উজ্জ্বল আলোভরা দিন রাশিয়ায় ব্যতিক্রম।

এরই দিন দশেক পরে সম্রাজ্ঞীর সঙ্গে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ। সে দিনের আলোচনার বিষয় ছিলো রাশিয়ার দিনপঞ্জী নিয়ে। সেদিন তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যে আর বুদ্ধির প্রাখর্যে সত্যই আমি বিস্মিত হোয়েছিলাম। খুব সহজভাবে অথচ সংযত স্বরে আলোচনা করছিলেন, প্রতিটি যুক্তির আড়ালে গভীর জ্ঞানের আর দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাসের পরিচয় ছিলো। ওঁর সুচিন্তিত যুক্তিগুলিই শুধু অখণ্ডনীয় নয়, ওঁর হাস্য-পরিহাসের ধারাও অমনি। ওঁর আচার ব্যবহার ফ্রেডারিক দি গ্রেটের চেয়ে কত উন্নত কত মার্জিত, তাই দেখে আশ্চর্য হলাম। ওঁর নম্র কোমল অথচ সংযত গম্ভীর ভাবভঙ্গী প্রতিপক্ষকেও মুগ্ধ করতো সহজেই; অথচ ফ্রেডারিক দি গ্রেটের কৃত্রিম রুক্ষ, কর্কশ ব্যবহার তাঁকে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শুধু বোকা বানাতো।

সেদিন গ্রীষ্মকুঞ্জে ভ্রমণের সময় জোরে বৃষ্টি এলো। সম্রাজ্ঞী একজন পরিচারককে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে কনসার্ট হলে নিয়ে

আসার জন্য। সেখানে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। সেদিনের আলোচনা সুরু হলো ওই দিনপঞ্জী নিয়ে। উনি জিজ্ঞাসা করলেন, ভেনিসে দিনের চব্বিশ ঘণ্টাকে যে নির্দিষ্ট ভাবে ভাগ করা হয় না শোনা যায়, সে কথা সত্যি কি না। অর্থাৎ ভেনিসে কোন বিশেষ কাজের জন্য দিনের বিশেষ সময়কে নির্দিষ্ট করা হয় না—যে কোনো সময় যে কোনো কাজ করা হয়। সম্রাজ্ঞী বলতে লাগলেন,—এটা খুবই অসুবিধার ব্যাপার নয়? তা ছাড়া বাকী দুনিয়াটার কাছে তো রীতিমতো হাস্যকর ব্যাপারটা। এর পর তিনি ভেনিসের রীতি-নীতি আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করলেন, এমন কি, জুয়াখেলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণের উল্লেখ করলেন। জেনোয়ার সেই লটারী স্থায়ী ভাবেই চলছে কি না, তা-ও জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন—ওরা এখানেও ওই লটারী চালু করার জন্য আমাকে প্ররোচিত করেছিলো যাতে আমি সম্মতি দিই। যদি আমি রাজীই হতাম, তাহলে শুধু মাত্র এই সর্তে যে এক রুবলের কমে কেউ বাজী ধরতে পারবে না। তাইতে গরীব লোকেরা ওই জুয়াখেলায় নেশা থেকে নিবৃত্ত হোতে বাধ্য হতো।

ওঁর এই দূরদৃষ্টিকে আমি সসম্ভ্রম অভিবাদন জানালাম। মহিমময়ী সাম্রাজ্ঞীর সঙ্গে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ। পঁয়ত্রিশ বছর উনি রাজত্ব চালিয়েছেন সচ্ছন্দ ভাবে—এই দীর্ঘ দিনের রাজ্য পরিচালনায় ঘটেনি একটি মাত্রও বিশেষ ত্রুটি।

পিটার্সবুর্গ আমাকে ছাড়তে হলো ভ্রমণের নেশায়। পা বাড়ালাম ওয়ারশ'এর পথে।

পোলাণ্ডে থাকতেই পেলাম এক নিদারুণ সংবাদ। আমার পিতৃসম মঁসিয়ে দ্য ব্রাগাঁদার মৃত্যু। গত বাইশ বৎসর ধরে তিনিই

কাউণ্ট ত আরান্দার কাছে আমার একটি পরিচিতি পত্র ছিলো। তিনি সে সময় মাদ্রিদে রাজার চেয়েও ক্ষমতাশীল ছিলেন। লম্বা কোর্তা আর মস্ত চওড়া টুপীর প্রবর্তক তিনিই। কাউন্সিল অফ ক্যাস্টাইলের প্রেসিডেণ্টও উনি আর দেহরক্ষী ছাড়া একটি পা'ও বেরোতেন না। তাঁর মত বিরাট রাজনীতিজ্ঞ, অসীম সাহসী দৃঢ়চেতা লোক সারা স্পেনে বিরল। কিন্তু সর্বদাই একটা কঠিন দৃঢ়তার আবরণে নিজেকে ঢেকে সব রকম বিধি-নিষেধই নিজে লঙ্ঘন করে চলতেন, অপরের বেলায় সে-সব নিষিদ্ধ বলে হুকুমজারী সত্ত্বেও। ওঁর আকৃতি যেমন কদাকার তেমনি ভীষণ। চিঠিটা পড়ে অভ্যাসবশতঃ দুটি চোখ পিট্ পিট্ করতে করতে অত্যন্ত নিরাসক্তভাবে প্রশ্ন করলেন—আপনি স্পেনে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন ?

—এই মহান জাতির রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার দেখে নিজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে। আর সেই সঙ্গে যদি শাসকসম্প্রদায়ের অধীনে কোন কাজ পাই আমার সাধ্যমত, তবে সেই কাজও গ্রহণ করতে পারি।

—তার জন্য আমাকে আপনার কোনো প্রয়োজন হবে না। আপনি যদি এখানকার আইন মেনে ভদ্রভাবে থাকতে পারেন তবে কেউই আপনার কোনো ক্ষতি করবে না। আর আপনার কাজ সম্বন্ধে আপনাকে ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের কাছে যেতে হবে। তিনিই আপনাকে সেই সব লোকের পরিচয় করিয়ে দেবেন—যাঁরা আপনাকে কাজ দিতে পারবেন—

—মঁসিয়ে ভেনিসের রাষ্ট্রদূত আমার কোনো উপকারই করতে পারেন না। কারণ আমার দেশের নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে আমার

বিরোধ চলছে কিছুকাল ধরে। তাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে উনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেও অস্বীকার করবেন।

—সে ক্ষেত্রে রাজসভা থেকে আপনার কোনো কিছু আশা করা বৃথা। তার চেয়ে আমার মতে আপনি যে কয় দিন থাকবেন সে কয় দিন সব দেখে-শুনে আমোদ-প্রমোদ করে কাটিয়ে দিন।

মার্কুইস ছ মোরাস, ডিউক দ্য লোসাদা সবার মুখে ঐ একই উপদেশ—শুধু ডিউক দ্য লোসাদা আরও পরামর্শ দিলেন যে কোনো উপায়ে ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে একটা আপোষ করে ফেলতে। শেষ অবধি ভেনিসে আমার পিতৃসম মঁসিয়ে দ্য ব্রাগাঁদার বন্ধু সিনর দান্দোলোকে লিখলাম এই মর্মে যে এমন একখানি পত্র দিতে, যাতে রাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের সঙ্গে আমার বিরোধ সত্ত্বেও রাষ্ট্রদূত আমার প্রতি প্রসন্ন থাকেন। তাছাড়া রাষ্ট্রদূতকে আমি নিজেও পত্র দিলাম তাঁর আশ্রয় ভিক্ষা করে! যে রাষ্ট্রের তিনি প্রতিনিধিত্ব করেছেন সেই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসাবে আমার বিনীত দাবী জানালাম।

পরদিন সকালে আমার ভৃত্যটি এসে জানালে, কাউণ্ট মান্নুচ্চি নামে এক ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। সুন্দর চেহারা আর বিনীত ভদ্র ব্যবহার যুবকটির—আমাকে জানালেন রাষ্ট্রদূতের প্রাসাদেই তাঁর বাস। রাষ্ট্রদূতই তাঁকে পাঠিয়েছেন আমার কাছে এই বার্তা নিয়ে যে খোলাখুলিভাবে আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ বা আদান-প্রদান সম্ভব নয় কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার সঙ্গে সাক্ষাতে তিনি খুশীই হবেন।

মান্নুচ্চি জানালেন, তিনিও ভেনিসের অধিবাসী আর তাঁর মা-বাবার কাছে আমার সম্বন্ধে অনেকবার অনেক কথা শুনেছেন।

বুঝতে দেরী হোলো না এ সেই মাছুচ্চির ছেলে—যে রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের গোয়েন্দা হোয়ে আমার সমস্ত যাদুবিদ্যার বইগুলি আত্মসাৎ করেছিলো আর 'দি লেডস'এ আমাকে কারারুদ্ধ করার কাজে প্রধান উদ্যোগী ছিলো। কিন্তু এই যুবকটিকে আমি সে সব কোনো কথাই বললাম না। তবে কথায় কথায় যখন ও জানতে পারলে আমিও ওর পরিবারের পরিচয় জানি, তখন খোলাখুলিভাবেই কথাবার্তা সুরু করলে। আমাকে ওর ঘরে কফি খাবার নিমন্ত্রণ জানালে; কারণ সেখানে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা। সে কথা ও রেখেছিলো আর আমার সম্বন্ধে যতদূর প্রশংসা করবার করেছিলো, এ কথা মানতেই হবে।

হোটেলের কাছেই থিয়েটার থাকাতে প্রায়ই যেতাম আর মুখোশ-বলনাচেও যোগ দিতাম প্রায়ই; সেটা মাদ্রিদে কাউণ্ট দ্য আরান্দাই প্রতিষ্ঠা করেন। ষ্টেজের ঠিক সামনে মস্ত একটা বক্সে বসতেন রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের কর্মচারীরা—দৃষ্টি রাখতেন অভিনেতা-অভিনেত্রীরা কোথাও শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে কি না। একদিন আমি থিয়েটারে গিয়ে বসে বসে ওই সব সম্মানিত শয়তান কপটদের দিকে চেয়ে দেখছিলাম, এমন সময় প্রহরী চিৎকার করে উঠলো 'দীয়স' সঙ্গে সঙ্গে নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে যত দর্শকবৃন্দ আর অভিনেতা অভিনেত্রীরা সকলে কলের পুতুলের মত নতজানু হোয়ে পড়লো যতক্ষণ ধরে রাস্তায় ঘণ্টার শব্দ না মিলিয়ে গেলো। ব্যাপারটা হোলো রাস্তা দিয়ে পুরোহিত চলেছেন শেষকৃত্য সমাপ্ত করতে।

প্রবল হাসির আবেগে আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো—বহুকষ্টে দমন করলাম স্পেনীয়দের ভক্তির গোঁড়ামি আর উচ্ছ্বাসের

কথা ভেবে। এই জাতটার ধর্মের সব কিছুই নির্ভর করে বাইরের আড়ম্বরের প্রতি। এমন কি ভালোবাসায় আত্মসমর্পণের মুহূর্ত্তটিতেও ওরা যিশু কিম্বা ভার্জিন মেরীর ছবি ঘরে থাকলে কাপড় দিয়ে তা' ঢেকে দেয়।

মুখোশ-বল-নাচের আসরে প্রথম দিনই এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হোলো। আমাকে বিদেশী দেখে প্রশ্ন করলেন আমার নাচের কোনো সঙ্গিনী আছে কিনা। আমি জানালাম, কারো সাথেই এখনও আমার পরিচয় হয়নি—যাকে আমি আমার নৃত্য-সঙ্গিনীরূপে আহ্বান জানাতে পারি।

—কিন্তু আপনি বিদেশী, এটাই তো আপনার সবচেয়ে বড় গুণ। এই বলনাচের জন্যে এখানে মেয়েরা পাগল হোয়ে থাকে। এখানে শ' দুয়েক নাচিয়েকে আপনি দেখছেন কিন্তু একটুও বাড়িয়ে বলছি না এই শহরে অন্ততঃ হাজার চারেক তরুণী এই রাতটিতে চোখের জলে ব্যর্থ প্রহর গুণছে তাদের এই নৃত্য-আসরে নিয়ে আসবার মত কেউ নেই বলে। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, তাদের যে কোনো একজনের কাছে আপনি যদি গিয়ে দাঁড়ান নিজের নাম-ঠিকানা জানিয়ে, সে মুহূর্ত দ্বিধা করবে না আপনার নৃত্যসঙ্গিনী হতে —তার মা-বাবা কারো সাহস হবেনা বাধা দেবার। অবশ্য তাকে একটি ডোমিনো, মুখোশ, আর দস্তানা পাঠাতে হবে আর গাড়ী করে নৃত্য-আসরে নিয়ে আসতে আর যথাসময়ে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সেণ্ট এণ্টনির উৎসব দিনেতে ইচ্ছে করেই চার্চে গেলাম। সেখানে তরুণী সমাবেশে যদি মনোমত কাউকে পাওয়া যায়। যাওয়াটা সার্থক হোলো যখন একটি দীর্ঘাঙ্গী লাবণ্যময়ীর দেখা পেলাম

—মেয়েটির ছন্দোময় গতিভঙ্গী, সুললিত দেহবিন্যাস আর শুভ্র কোমল ক্ষুদ্র চরণ দুটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পিছু নিলাম খানিকটা দূরে একটা একতলা বাড়িতে ওকে ঢুকতে দেখে। সেই বাড়ির নম্বর টুকে নিয়ে চলে এলাম। ঠিক আধ ঘণ্টা বাদে সেই বাড়ির দরজায় এসে কড়া নাড়তে লাগলাম।

দরজা খুলে গেলো। ঢুকে সামনের ঘরেই দেখি একজন ভদ্রলোক, ভদ্রমহিলা আর আমার মনোনীতা সেই মেয়েটি। টুপীটা হাতে নিয়ে বিনীত নমস্কার জানিয়ে যথাসম্ভব নির্ভুল স্পেনীয় ভাষায় ভদ্রলোকটিকে আমার উদ্দেশ্য জানালাম যে তাঁর কন্যাটিকে আমি বলনাচে নিয়ে যেতে চাই। অবশ্য যদি তাঁরই কন্যা হয় মেয়েটি।

—সিনর, এ আমারই মেয়ে। কিন্তু আমি জানি না ও বলনাচে আদৌ যোগ দিতে চায় কি না। তাছাড়া আপনিও তো সম্পূর্ণ অপরিচিত।

—বাবা, তোমার অনুমতি যদি পাই তাহলে কি খুশী হবো বলতে পারি না।

—এই ভদ্রলোকটিকে তুই চিনিস?

—মোটেই না। কখনো দেখেছি বলেও মনে হয় না। উনিও আমাকে কখনও দেখেছেন কি না সন্দেহ!

ভদ্রলোকটি তখন আমার নাম-ধাম জেনে নিয়ে কথা দিলেন কিছুক্ষণ পরেই তিনি তাঁর মতামত জানাবেন। ফিরে এলাম। ঠিক সময়ই ভদ্রলোক এসে হাজির—আমার নিমন্ত্রণ গ্রাহ্য—কিন্তু মেয়েটির মা থাকবেন সঙ্গে আর গাড়ীতেই বসে থাকবেন, এই সর্তে।

রাজী হোলাম। ভদ্রলোকটির পরিচয় জানলাম, পেশা জুতা সেলাই—অবশ্য তাঁর নিজের দোকান আছে। নাম 'দন দিয়েগো'।

যথা সময়ে মাতা আর কন্যাসহ নাচের আসরে পৌঁছলাম। দেখলাম আমার সঙ্গিনীটি সত্যিই নৃত্যপটীয়সী—নাচের উদ্দাম আবেগে কখন দশটা বেজে গেছে খেয়ালও করিনি। তারপর আহার-পর্ব সমাধা করে আবার একপ্রস্থ নাচ। অবশেষে অনুষ্ঠান-পর্ব সমাধা হোতে দুজনে গাড়ীর কাছে এলাম—প্রতীক্ষাক্লান্ত মা তখন গভীর নিদ্রামগ্না। তাঁকে জাগিয়ে গাড়ীতে আমরা উঠে বসলাম। অন্ধকারে মেয়েটির হাতখানি সন্তর্পণে ধরে নিজের দিকে আকর্ষণ করলাম একটি চুম্বনচিহ্ন এঁকে দেবার জন্যে। কিন্তু নিঃশব্দে ও আমার হাতখানি দৃঢ়ভাবে ধরে রইলো যেন কোনো গর্হিত কাজে বাধা দিচ্ছে। আর সেই অবস্থায় মাকে সারা সন্ধ্যার বর্ণনা দিতে লাগলো। যতক্ষণ বাড়ির দরজায় থামলাম ততক্ষণ হাতটা ও ধরে রইলো।

দন দিয়েগো আমার বাড়িতে এলো আমাকে ধন্যবাদ জানাতে। ওর মেয়ে দোনা ইগ্নাশিয়া যে কতখানি আনন্দ পেয়েছে আমার সঙ্গে নাচের আসরে গিয়ে, বার বার সেই কথাই ভদ্রলোক জানাতে লাগলেন বিনীত কৃতজ্ঞতায়। জানালেন ওঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে আমার আগমন ঘটলে ওঁরা আন্তরিক খুশী হবেন।

সেদিন রাত্রেও বলনাচের আসর ছিলো। সকালে গিয়ে হাজির হোলাম ইগ্নাশিয়ার দরজায়। দেখি, ঘরের ভিতর পা মুড়ে বসে জপের মালা নিয়ে ও জপ করছে। আমাকে দেখে অকৃত্রিম আনন্দে ভরে উঠলো ওর মুখখানি। বললে, আবার আমাকে দেখবে আশা করেনি—ভেবেছিলো এত দিনে আমি নিশ্চয়ই যোগ্যতর নৃত্যসঙ্গিনী পেয়েছি।

—তোমার স্থান পূর্ণ করতে পারে এমন নৃত্যসঙ্গিনী আমি আজও পাইনি ইগ্নাশিয়া। যদি তুমি সম্মতি দাও আজই তোমাকে নিয়ে যেতে পারলে আনন্দের অবধি থাকবে না আমার।

—সত্যি? নিয়ে যাবেন আমাকে? যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।

সে রাত্রে নৃত্য-আসরের একটি নিরালা কোণে ওকে জানালাম, ওর নৃত্যছন্দ আমাকে এত মুগ্ধ করেছে যে, ও যা খুশী তাই করতে পারে—আমি সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করছি ওর কাছে।

—কিন্তু কি চান আপনি আমার কাছে? আমি যে দন ফ্রান্সিস গুয়ারোস নামে একটি যুবকের সঙ্গে গোপনে বাগ্‌দত্তা। ও রোজ আসে। আমার জানলার নীচে দাঁড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলে। ওই-ই তো আমার ভবিষ্যৎ স্বামী—আমার কর্তব্যচ্যুত হওয়া তো চলবে না।

এই স্পেনের মেয়েদের কর্তব্যজ্ঞান অতি প্রবল। আমার ইচ্ছা হোলো, ওর ওই কর্তব্যজ্ঞান ভেঙে চুরমার করে দিতে। কিন্তু কোনো যুক্তি-তর্কে আর কথার জালে ওই কর্তব্যের সংস্কার থেকে এক চুল নড়াতে পারলাম না ওকে।

সেদিন সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে যতদূর সম্ভব সস্নেহ কোমল ব্যবহার করলাম। ওর দুই পকেট ভর্তি করে দিলাম নানারকম মিষ্টি খাবারে—আর সেই সঙ্গে একটি স্বর্ণমুদ্রা দিতে গেলে ও পিছিয়ে গেলো। কিছুতেই নেবে না। শেষে বললে, যদি সত্যিই আমি ওটা দিতে চাই তবে ওর বাগ্‌দত্ত স্বামীকেই যেন দিই। সে আমার সঙ্গে পরিচিত হতে চায়—হয়ত শীগগিরই যাবে আমার কাছে।

দু-একদিনের মধ্যেই সে এসে হাজির আমার কাছে। নিজের পরিচয় দিয়ে বললে, দোনা ইগ্নাশিয়া বিশ্বাস করে জানিয়েছে যে আমি তাকে বলনাচে নিয়ে গেছি—আর আমার ভালোবাসা অপত্যস্নেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই ও সাহস করে আমার কাছে এসেছে অবশ্য একটি প্রার্থনা নিয়ে—একশ' ডাবলুন (ইতালীর মুদ্রা) যেন আমি ধার দিই তাকে তার বিয়ের খরচের জন্যে।

—অত্যন্ত দুঃখিত। আমার নিজেরই অবস্থা এখন শোচনীয়, এ সময় কিছু সাহায্য করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। তবে একথা আমি গোপন রাখবো নিশ্চয়ই। আর মাঝে মাঝে আপনি আমার কাছে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এলে কম খুশী হবো না।

লোকটি বিমর্ষচিত্তে চলে গেলো। এরই কয়েক দিন পর আমি তখন সবে চিত্রশিল্পী বন্ধু 'মেঙ্গস্' এর সঙ্গে আহারপর্ব সেরে বাড়ি ফিরছি, দেখি একজন বেশ সন্দেহজনক আকৃতির ভদ্রলোক আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এসে মৃদুস্বরে জানালেন একটু আড়ালে যেতে, বিশেষ গোপনীয় কথা আছে। আড়ালে গিয়ে বললেন, নিরাপত্তা বিভাগ থেকে আলকাড মেশা তাঁর পুলিসবাহিনী নিয়ে এখনি আসছেন আমার খোঁজে। উনি নিজেও সেই বাহিনী নিয়ে এখানে আছেন। তবে গোপনে আমাকে সাবধানে বলতে এসেছেন যে ওঁরা টের পেয়েছেন আমার ঘরে বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র আছে; আমি সেগুলি চিমনীর পিছনে মাদুর ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছি। আরও কিসের সন্ধান পেয়েছেন আমার বিষয়ে যার জন্যে আমাকে গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হবে। তারপর একান্ত উদ্বেগ ভরা স্বরে বললেন,—আমি আপনাকে সাবধান করে দিতে এসেছি—কারণ আমার দৃঢ় ধারণা আপনি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আপনার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ মিথ্যা। আমার কথা বিশ্বাস করুন —শীগগিরই কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান।

লোকটিকে একটি মুদ্রা দিয়ে বিদায় দিলাম। পরমুহূর্তে আমার অস্ত্রগুলি কোটের ভিতর করে নিয়ে সোজা 'মেঙ্গস্'এর কাছে চলে এলাম—মনে হোলো এটাই সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়, কারণ এটা রাজার প্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে। শিল্পী আশ্রয় দিলে বটে সে

নেই, তা ছাড়া যতক্ষণ না কাগজ, কলম, কালি, কিম্বা টাকাটা ফেরৎ পাবো, ততক্ষণ একটি পয়সাও আর কাউকে দেবো না। বন্দীদের ভিতর আমার শয়তান ভৃত্যটিও ছিলো। শুনলাম, সে মারাৎসিনিকে আমার কাছ থেকে কিছু অর্থ ভিক্ষার জন্য বলতে বলছে। সারাদিন কিছু খায়নি—একটি কাণাকড়িও নাকি ওর হাতে নেই। আমার ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা তখন চরমে। বললাম, একটি আধলাও দেবো না। তা ছাড়া ও এখন আর আমার চাকর নয়। কোনো দিন যদি ওর মুখ দেখতে না হোতো তো বেঁচে যেতাম।

বেলা চারটের সময় শিল্পী বন্ধুর ভৃত্য প্রচুর আহার্য এনে হাজির করলো আমার জন্য। নানা রকম সুস্বাদু খাদ্য আর সুপেয়—প্রায় চার জনের মত পরিমাণে। ওই শয়তান বদমায়েসগুলোকে ভাগ দেবার এতটুকু স্পৃহা আমার ছিল না। তাই বাহকটিকে অপেক্ষা করতে বলে নিজে আহার সমাপ্ত করে অবশিষ্ট ওর হাতেই ফিরিয়ে দিলাম। প্রত্যেকে ক্ষুণ্ণ আর রুষ্ট দুই-ই হোলো! হোক, কিছু এসে যায় না তা'তে।

বেলা পাঁচটা নাগাদ একজন অফিসারের সঙ্গে মারুচ্চি এসে হাজির। দু'-একটি কথার পর আমি অফিসারটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, বন্ধু-বান্ধবকে চিঠি লেখা আমার নিষিদ্ধ কি না। তিনি বললেন, মোটেই নয়। তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, প্রয়োজনীয় কিছু কিনতে দিলে সেই টাকাটা কি কোনো সিপাহী মেরে দিতে পারে?—কোন সিপাহী বলুন তো? আমি কথা দিচ্ছি আপনার টাকা সে ফেরৎ তো দেবেই, উপরন্তু এই চালাকির জন্য তার শাস্তিও কম হবে না। তা ছাড়া আপনি কাগজ-কলম-কালি ছাড়াও একটা টেবিল আর একটা আলো এখনি পাবেন।

আর আমিও কথা দিচ্ছি—মান্থচ্চি জানালে—রাত আটটার সময় রাষ্ট্রদূতাবাসের ভৃত্য এসে আপনার চিঠিগুলি নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌছবার জন্য নিতে আসবে—

আমি পকেট থেকে তিনটি ক্রাউন বার করে চিৎকার করে বললাম, যে আমাকে চোর সিপাহীটার নাম বলবে এটা তার পুরস্কার। মারাৎসিনিই বললে প্রথম। অফিসারটি অত্যন্ত কৌতুক বোধ করলেন, হাসতে হাসতে নামটা লিখে নিলেন। বোধ হয় ভাবলেন, যে লোক একটা ক্রাউন ফিরে পেতে তিনটি ক্রাউন ব্যয় করে সে অন্ততঃ কৃপণ নয়।

ওরা চলে গেলে চিঠি লিখতে বসলাম। অসহ্য গোলমাল, চেঁচামেচি আর কৌতূহলী প্রশ্নের ভিড়ে চিঠির ভাষা উঁচুদরের সাহিত্য না হোলেও প্রতিটি লাইনে আমার মনের জ্বালা উজাড় করে দিয়েছিলাম। লেখা হোয়ে গেলে আমার নিজস্ব রীতি অনুযায়ী একটি কপি নিজের কাছে রাখলাম।

তারপর এলো রাত্রি। কি বিভীষিকাময়ী রাত্রি! কোথাও শোবার এতটুকু স্থান নেই, এক আঁটি খড়ও চেয়ে জুটলো না পেতে শুতে। শেষে একটা বেঞ্চের কোণে কাঠের মত সোজা হোয়ে বসে অসহ্য ক্লান্তি আর চরম যন্ত্রণায় প্রহর গুণতে লাগলাম। মেঝেতে অবধি নোংরা দুর্গন্ধ জলের স্রোত বইছে। চারদিকে অসংখ্য ছার-পোকা আর পোকামাকড়। কখনও ঘরখানা পরিষ্কার করা হয় না, বেশ বোঝা গেল। বিভীষিকাময় রাত্রির শেষে মান্থচ্চি আবার এলো আমার কাছে। সত্যিই ওই এখন আমার একমাত্র উপকারী বন্ধু আর একমাত্র ভরসা। আমাকে কিছু চকোলেট খাইয়ে গেলো আর বলে গেলো রাষ্ট্রদূতকে লেখা আমার চিঠির ভাষাটা অত্যন্ত জ্বালাভরা।

দু'জন সিপাহী শয়তানটাকে সরিয়ে নিয়ে গেলো। এবার মান্নুচ্চির সঙ্গে সিপাহী-ব্যারাকে গিয়ে চোর সিপাহীটার শাস্তি স্বচক্ষে দেখে এলাম। ফিরে এসে দেখি আমার বসবার জন্যে একটি আরাম-কেদারা আনা হোয়েছে। আঃ! তাইতে বসে তিন দিন পর প্রথম যে কী আরাম পেয়েছিলাম!

দুপুরবেলা খাবার পর আলকাড মেশা স্বয়ং হাজির হোয়ে আমার অস্ত্রগুলি আমার হাতে দিয়ে আমার পাশাপাশি চলতে লাগলেন ত্রিশ জন প্রহরী নিয়ে—একেবারে সোজা আমার হোটেল অবধি। সেখানে গিয়ে আমার বাক্স-তোরঙ্গের শীল ভেঙে দিলে প্রহরীরা। দেখলাম সব জিনিসই ঠিক আছে।

প্রসাধন আর বেশভূষা সমাপ্ত করে প্রথমেই গেলাম দন দিয়েগোর কাছে। ইগ্নাশিয়া তো আমাকে দেখে আনন্দে পাগল হোয়ে উঠলো। বলতে কি এই উদার সরল পরিবারটির আন্তরিকতায় আমি শুধু মুগ্ধ নয় রীতিমত অভিভূত হোয়ে পড়েছিলাম। ওদের কাছ থেকে গেলাম শিল্পী বন্ধুর কাছে। সে বেচারা তখন আমার জন্যে তদ্বির করার জন্যে রাজসভায় যাবার উদ্যোগ করছে। আমাকে দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হোয়ে উঠলো। তারপর দু'খানি চিঠি আমাকে দিলে, সিনর দান্দালোর কাছ থেকে এসেছে আর তার ভিতর রাষ্ট্রদূতকে উদ্দেশ করে লেখা একখানি স্বতন্ত্র পত্র। শিল্পী আমাকে বললে স্পেনে যদি নিজের ভাগ্য ফেরাতে চাই তো এই সুযোগ। কারণ মন্ত্রিরা চেষ্টা করছেন যাতে এই অন্যায় অত্যাচারের ক্ষোভ আমি ভুলে যেতে পারি।

সে রাতে বাড়ি ফিরে পুরো বারোটি ঘণ্টা নিশ্চিত আরামে ঘুমোলাম। ভোরবেলা এলো আর একটি সুখবর—মান্নুচ্চি এসে

জানালে ভেনিসের রাষ্ট্রদূত ভেনিস থেকে নির্দেশ পেয়েছেন আমাকে সর্বত্র পরিচিত করিয়ে দেবার—আর রাষ্ট্রনিরাপত্তা বিভাগের অভিযোগ কোথাও কখনও আমার সম্মান ক্ষুণ্ন করবে না। আসছে সপ্তাহেই রাষ্ট্রদূত আমাকে রাজসভায় উপস্থিত করবেন। আর আজ রাত্রে তিনি আমাকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন তাঁর প্রসাদে—এক বিরাট ভোজসভায়।

ষোড়শ অধ্যায়

আমার এই স্মৃতিকথা আমি লিখে চলি আরও ওই সব বিস্বাদ, বিবর্ণ ঝিমিয়ে-পড়া, শ্বাসবিরোধী মুহূর্তগুলিকে সহনীয় করে তোলার জন্যে—

আমার এই স্মৃতিকথা যদি কখনো প্রকাশ পায় যদি কখনো দেখে ছুনিয়ার আলো—আমার চোখের সামনে থেকে সে আলো যখন নিবে যাবে—আমার স্মৃতিকথাকে ঘিরে সমস্ত সমালোচনার ঝড়ের মুখের উপর আমি যখন হেসে উঠতে পারবো। এই ছুনিয়াটাকে তো সহজেই ছুটি ভাগে ফেলা যায়—একটি বলতে গেলে বড় অংশটাই তো শুধু অজ্ঞতা অল্পশিক্ষার উচ্ছ্বাসে ভরা—আর একটি অংশ গভীর চিন্তাশীল আর শিক্ষিতদের। তাঁদের উদ্দেশ্যেই আমার পরিচিতি জানাই, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁরা আমাকে বুঝবেন—শুধু বোঝা নয়, আমার সমস্ত কাজ অকাজ, ভালো-মন্দ ত্রুটি-বিচ্যুতির এই নির্ভীক, স্পষ্ট আর সত্য রূপায়ণের প্রকৃত মূল্য, তাঁরাই দিতে পারবেন। এখনো অবধি যত দূর লিখেছি এই স্মৃতিকথা কোথাও করিনি এতটুকু অতিরঞ্জন, কোথাও করিনি এতটুকু অতিক্রম সত্যকে—আমার লেখনী দ্বিধাভরে থেমে যায়নি—বিচার করে দেখতে যে সত্যকে সে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করে চলেছে, সে আমার চরিত্রকে ম্লান, নিষ্প্রভ করে তুললো, না আমার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিলো।

আমার জীবনের ইতিবৃত্ত একটানা সুরে একঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয় কোথাও। এই স্মৃতিকথা কলুষিত করবে না কোনো পাঠক-হৃদয়—আমার উদ্দেশ্যও তা' নয়—কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা, আমার পাপ, আমার পুণ্য, আমার আদর্শ—এই সবের কাহিনী থেকে যা'

পাবার সেই পাবে যে জানে মৌমাছির মত অনেক ফুলের মধু সঞ্চয়ে আপন মধুকোষ পূর্ণ করে তুলতে।

* * *

মাদ্রিদে কাটলো আরও পাঁচ-ছয় সপ্তাহ—ছোটোখাট বিড়ম্বনায় ভরা। শেষের দিকে কারো সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ মেলামেশা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলাম—নেহাৎ দু'-একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু আর স্নেহ-কৌতুকময়ী ইগ্নাশিয়া ছাড়া। তারপর আবার যাত্রা সুরু করলাম। কিন্তু আমার নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবী বার্সিলোনার পথে ভ্যালেন্সিয়ায় আমার যাত্রা রোধ করলেন। কয়েক দিন বিশ্রামের জন্য থেকে গেলাম ভ্যালেন্সিয়াতে। এখানে একদিন বিখ্যাত 'ষাঁড়ের লড়াই' দেখতে গিয়ে মুগ্ধ-বিস্ময়ে দেখলাম একটি মহিলাকে—কি অপরূপ, কি আশ্চর্য সৌন্দর্য! শুধু অনিন্দ্যসুন্দর দেহসৌষ্ঠবই নয়—অগ্নিশিখার মত উজ্জ্বল সে রূপ মনে বুঝি চিরন্তন ছাপ রেখে যায়! কৌতুহল চাপতে না পেরে পাশের ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম মহিলাটির পরিচয়।

—"ও, উনি হোলেন বিখ্যাত 'নিনা'।

—"বিখ্যাত কেন?"

"সে কাহিনী যদি না জেনে থাকেন তবে এখন এখানে সে বিরাট কাহিনী বলা মুস্কিল।"

মিনিট দুয়ের মধ্যেই একজন সুবেশ ভদ্রলোক—যদিও চেহারাটায় কিঞ্চিৎ দুর্বৃত্তের ছাপ—সেই অপরূপ সৌন্দর্যময়ীর পাশ থেকে উঠে এসে আমার পাশের ভদ্রলোকটির কানে কি ফিশফিশ করে বললেন। তিনি আবার অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে জানালেন যে, ওই মহিলাটি আমার পরিচয় জানতে চান। একটু বিগলিতই

হোলাম বৈকি এই অনুরোধে—তাই জানালাম মহিলাটির সম্মতি পেলে আমি নিজেই যাবো খেলার শেষে আমার পরিচয় দিতে।

—"আপনার কথার ভঙ্গীতে মনে হোচ্ছে আপনি ইতালীয়।"

—"হ্যাঁ ভেনিসের লোক।"

—মহিলাটিও তাই।"

ভদ্রলোকটি মহিলাটির কাছে ফিরে গেলে আমার পাশের ভদ্রলোকটি এবার নিজে যেচেই এগিয়ে এলেন আমার কাছে মহিলাটির পরিচয় দিতে। নিনা একজন নর্তকী—তাছাড়া কাউণ্ট দ্য রিকলার রক্ষিতা। কয়েক সপ্তাহ ধরে নিনা ভ্যালেন্সিয়াতেই আছে; কারণ দুর্নাম আর অপবাদের জন্য বিশপ ওকে বার্সিলোনায় থাকতেই নিষেধ করেছেন। বার্সিলোনার ক্যাপ্টেন জেনারেল কাউণ্ট দ্য রিকলা নিনার প্রেমে উন্মাদ—ওঁর কাছ থেকে নিনার দৈনিক বরাদ্দ পঞ্চাশ ডাবলুন।

—"তা' বোধ হয় উনি খরচ করেন না?"

—"করতে পারেন না। কারণ দিনে অন্ততঃ হাজারটা কাণ্ড বাধিয়ে বসে থাকেন আর তার জন্য বেশ কিছু মূল্য দিতে হয় বৈকি"—

দেখার শেষে গেলাম ওই নর্তকীর কাছে। উনি তখন ছয়টি খচ্চরে-টানা ওঁর সুদৃশ্য গাড়ীটিতে উঠতে যাচ্ছেন। আমাকে অভ্যর্থনা করলেন সেখানেই, নিমন্ত্রণ জানালেন পরদিন প্রাতরাশের। বললাম এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হোতে পারে না—তখনো সেই বিগলিত ভাব আমার।

ছোটো ছোটো বহু উদ্যানঘেরা বিরাট প্রাসাদের মত বাড়ি নিনার। চতুর্দিকে বহুমূল্য সুদৃশ্য আসবাব—আর অসংখ্য পরিচারক, পরিচারিকা, প্রত্যেকেই রীতিমত মূল্যবান উজ্জ্বল সুন্দর পোষাকে

সজ্জিত। যে ঘরে আমাকে নিয়ে গেলো সে ঘরে ঢোকবার আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছিলাম তীব্র তীক্ষ্ণস্বরে কে যেন কাকে বকছে। ঢুকে দেখি সে স্বর নিনার—আর টেবিলের কাছে একজন ব্যবসায়ী ধরনের লোক বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে। তার জিনিসপত্র সব টেবিলে ছড়ানো।

—"আমার রাগ দেখে কিছু মনে করবেন না, কিন্তু এই বোকা স্পেনীয়টা জোর করে আমাকে বোঝাতে চায় যে এগুলো খুব ভালো লেস"—নিনা আমার দিকে চেয়ে বললে।

সত্যিই লেসগুলি খুবই ভালো। কিন্তু এ ব্যাপারে কোনো মতামত না দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে হোলো। বিশেষ করে এই প্রথম পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই মতবিরোধ হওয়াটা মোটেই ঠিক হবে না। চুপ করে রইলাম।

লেসওয়ালা বললে…"মাদাম, লেসগুলো যদি পছন্দ না হয় তবে থাক্। অন্য জিনিসগুলো কিছু রাখবেন?"

—"হ্যাঁ, আর ওই লেসগুলোর সম্বন্ধে, অন্তত তোমাকে বোঝাবো যে আমার ব্যয়কুণ্ঠতার জন্য যে ওগুলি কিনিনি তা নয়"—বলেই একটা কাঁচি নিয়ে সমস্ত লেসগুলি কেটে টুকরো টুকরো করে ফেললে। যে লোকটি কাল ওর কাছ থেকে আমার পরিচয় জানতে এসেছিলো, তাকে দেখলাম ওই লেসগুলির পরিণতি দেখে শিউরে উঠতে।

—"ঈশ! আহা-হা-হা। কি করলে? লোকে যে পাগল বলবে তোমাকে!"

—"খুব হোয়েছে, চুপ করো—" বলেই নিনা লোকটিকে সজোরে এক কানমলা দিলে। সেও একটা তীব্র মন্তব্য করে বসলো।

দেখলাম নিনা তাতে কৌতুক উপভোগ করে হো-হো করে হেসে উঠলো। পরক্ষণেই ফেরিওয়ালাকে টাকার বিল দিতে বললে। সে কাগজটা এগিয়ে দিতেই টাকার অঙ্কের প্রতি দৃকপাত না করেই সই করে জানিয়ে দিলে অমুক লোকের কাছে গেলেই টাকা দিয়ে দেবে।

এতক্ষণে এলো গরম চকোলেটের গ্লাস। নিনা পরিচারিকাকে পাঠালে কানমলা খেয়ে পালিয়ে যাওয়া ভদ্রলোকটিকে ডেকে আনবার জন্য। আমার দিকে চেয়ে বললে,—"আপনি অবাক হবেন না ওর সঙ্গে আমার ব্যবহার দেখে। ও লোকটার কোনো মূল্যই নেই, একদম হতভাগা ওটা! কাউণ্ট রিকলা ওকে এখানে রেখেছেন আমার উপর গোয়েন্দাগিরি করবার জন্যে। ওকে মারলাম কেন জানেন? যাতে ও এই সমস্ত খবর ওর প্রভুটিকে লিখে জানায়।"

বিস্মিত হোয়ে শুধু দেখছিলাম নিনার প্রত্যেকটি আচরণ। সাধারণ কিছুর সঙ্গে যেন ওর তুলনাও করা যায় না: হতভাগা গোয়েন্দাটা এসে হাজির হোলো। আমাদের সঙ্গে চকোলেট খেতে খেতে একটি কথাও বললে না। ও চলে যেতে স্পেন, ইতালী, পর্তুগাল নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হোলো নিনার সঙ্গে। ওর সঙ্গে পরিচয়ে শুধু উত্তরোত্তর আশ্চর্যই হচ্ছিলাম। ঠিক এমন চরিত্রের কোনো মহিলা যে সম্ভব আমার এতদিনের অভিজ্ঞতাতেও তা জানতাম না। শুনলাম ও বিবাহিতা, ওর স্বামীরও নাচের পেশা। তাছাড়া ভেনিসের বিখ্যাত হাতুড়ে ডাক্তার পেলান্দির কন্যা। সব পরিচয় দেওয়া হোলে ও আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করলে সেইদিনই। কথা দিলাম নিমন্ত্রণ রাখবো। কিন্তু তার আগে একটু বাইরে বেড়িয়ে আসবার জন্যে তখনকার মত বিদায় নিলাম। প্রয়োজন ছিলো একটু বিশ্লেষণ করার।

আশ্চর্য মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য নিনার। কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, শুধু সৌন্দর্য দিয়ে কোনো নারী পুরুষকে সুখী করতে পারে না। কারণ যত সৌন্দর্যই ওর থাক আমার কোনো অনুভূতিকেই ও জাগাতে পারেনি। নিমন্ত্রণের সময় গিয়ে দেখলাম, ওই প্রচণ্ড শীতেও গোয়েন্দাটার সঙ্গে নিনা বাগানে বেড়াচ্ছে—অত্যন্ত হালকা পোষাকে। আমাকে দেখে নিনা এগিয়ে এলো। আর খুব ঘরোয়া ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগলো। খেতে খেতে নিনার কাছ থেকে অন্ততঃ হাজারখানেক লাম্পট্যের কাহিনী শুনলাম, যার প্রত্যেকটির নায়িকা হোলো নিনা। আহারের পর প্রচুর পরিমাণে দামী সুস্বাদু মদ পরিবেশন করা হোলো। নিনা শুধু কৌতুক দেখবার জন্যে ওই হতভাগাটাকে এত মদ খাওয়ালে যে শেষে ও অজ্ঞান হোয়ে মেঝেতে পড়ে গেলো।

আসার সময় নিনা আমাকে পরদিন সন্ধ্যায় শুধু নয়, প্রতিদিন সন্ধ্যায় এখানে আহারের নিমন্ত্রণ জানালে। আরও বললে যে, আমাদের নিভৃত আলাপে কেউ বাধা হবে না; কারণ ওই গোয়েন্দাটা অসুস্থ হোয়ে পড়বে এটা নিশ্চিত।

পরদিন সন্ধ্যায় যেতেই নিনা এগিয়ে এসে কৃত্রিম বিষাদভরা কণ্ঠে বললে,—"আহা, আজ মলিনারী (গোয়েন্দার নাম) অসুস্থ হোয়ে পড়েছে।"

—"তুমি বলেছিলে অসুস্থ হোয়ে পড়বে। তবে কি ওকে কিছু বিষ-টিষ দিয়েছো?"

—"স্বচ্ছন্দেই দিতে পারতাম—কিন্তু দেওয়া হয়নি।"

—"কিন্তু অন্য কিছু নিশ্চয়ই খাইয়েছো"—

—"ও যা ভালোবাসে তাছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ওকথা থাক।

তার চেয়ে আজ রাতটা উপভোগ করি এসো। আবার কাল সন্ধ্যায় তুমি আসবে—"

—"বোধ হয় না, কারণ কালই আমি ভ্যালেন্সিয়া থেকে চলে যাচ্ছি।"

—"উহুঁ, যাওয়া তোমার হবে না। ভয় নেই, তার জন্যে তোমার গাড়ীর কোচম্যান একটা কথাও বলবে না। তাকে তার প্রাপ্য ভাড়া দিয়ে দেওয়া হোয়েছে—এই ত্যাখো রসিদ"—

এমন মধুর কৌতুকে আবদারের ভঙ্গীতে নিনা কথা বলছিলো যে রাগ হওয়া দূরের কথা হাসতে হাসতেই ওকে বললাম, ওর এতখানি সমাদরের যোগ্য নই আমি।

—"আরও অবাক লাগে আমার—এই বিরাট প্রাসাদের অধীশ্বরী হয়েও তোমার সঙ্গীর এত অভাব কেন? কেউ তো আসে না তোমার কাছে?"

—"কারণ সবাই ভয় পায় আসতে—ভয় পায় কাউন্ট রিকলাকে, ওর অতি হিংস্বক প্রকৃতিকে সবাই জানে, আর ওই অসুস্থ জানোয়ারটা এখানের প্রতিটি কথা প্রতিটি ঘটনা রিক্‌লার কানে তুলে দেবে।

—"আমাদের কথা—আমাদের একত্রে আহার আলোচনা সব কিছু?"

—"খুবই সম্ভব! কিন্তু ভয় পেলে নাকি?"

—"পাইনি এখনও—কিন্তু প্রয়োজন বুঝলে তোমার জানিয়ে দেওয়া উচিত।"

"প্রয়োজনই নেই—দোষটা তো সব আমার ঘাড়েই পড়বে।"

—কিন্তু আমার জন্যে যে তোমার আর তোমার প্রেমিকের মধ্যে ভাঙন ধরবে তা' আমি চাই না।"

—"আমি যত জ্বালাই ওকে ও ততই আমাতে মুগ্ধ হয় আর সেই মিটমাটের দাম ওকে দিতে হয় গভীর ভাবে"—

—"তার মানে তুমি ভালোবাসো না ও-কে"—

—"বাসি—ওর সর্বনাশ করার জন্যেই ভালোবাসি—কিন্তু ওর সম্পদের প্রাচুর্যের কাছে আজও পরাজিত—"

আশ্চর্য এ নারী! পাপের মতই এর মাধুর্যের আকর্ষণ—গোপন অন্ধকারের দূতীদের মতই কলুষিতা—নাগিনী-কন্যার মত বিষধরী···আর মৃত্যুর মত ভয়ঙ্করীরূপে ও সর্বনাশ করবে তারই, যে দুর্ভাগা ওকে ভালোবাসবে।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় নিনার আতিথ্যে আমি অভ্যস্ত হোয়ে পড়লাম। বিশেষ করে আমরা তাস খেলায় সময় কাটাতাম। যার ফলে আমার পকেটের শূন্যতা ভরে উঠতে লাগলো। কয়েক দিনের মধ্যেই গোয়েন্দাটা সুস্থ হোয়ে উঠলো। সে-ও এসে আমাদের আসরে যোগ দিলে। কিন্তু ওর উপস্থিতিতে আর একটুও সচেতন হবার ইচ্ছা জাগতো না। নিনা ওকে দেখিয়ে উচ্ছ্বসিত আদরে আমাকে অভিষিক্ত করে ওকে বলতো, "কাউণ্ট রিক্লাকে সব লিখে দাওগে যাও—যা খুশী তোমার।"

কিছু লিখেছিলো নিশ্চয়ই, কারণ বেচারী কাউণ্টের চিঠি এলো বার্সিলোনাতে নিনাকে ফিরে যাবার কথা জানিয়ে—আশ্বাস দিয়ে বিশপ আর তার ব্যাপারে মাথা ঘামাবেন না। নিনা আমাকেও অনুরোধ করলে বার্সিলোনা যেতে—সেখানে প্রতি রাত্রে দশটার পর আমাদের সাক্ষাৎ হোতে পারবে। আর যদি আমার অর্থাভাব থাকে তবে যত টাকা প্রয়োজন ও ধার দিতে রাজী। বার্সিলোনাতে একদিন আগে আমাকে যাবার অনুরোধ জানালে ও। তাহলে

পথে 'তারাগনা'তে আমরা মিলতে পারবো। তাই-ই হোলো। কোনো রকম অপবাদ যাতে না রটে তাই আমি আগেই গিয়ে 'তারাগনা'তে আমার পাশের ঘরটাই নিনার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছিলাম।

ভোরে উঠে নিনা বার্সিলোনাতে চলে গেল আমাকে সন্ধ্যার আগে যাত্রা করতে নিষেধ করে দিয়ে। ওর একদিন পরে আমি পৌঁছাবো। তাছাড়া ওর কাছ থেকে কোনো খবর না পাওয়া অবধি যেন আমি দেখা না করি, সে বিষয়েও আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলো।

প্রায় একটি সপ্তাহ কাটলো বার্সিলোনাতে—কোনো খবরই নেই নিনার কাছ থেকে। তারপর হঠাৎ একটা চিরকূট একজন দিয়ে গেলো—তাতে ওর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যেতে লিখেছে—কিন্তু পায়ে হেঁটে আর কোনো পরিচারক না নিয়ে—রাত দশটার পর। সত্যিই যখন ওর প্রতি আমার এতটুকুও ভালোবাসা ছিল না তখন এ ভাবে যাওয়াটা বোকামী হোয়েছিলো বৈকি—কিন্তু আমার পাঠক সম্প্রদায় জানেন পরিণামদর্শিতা আমার কোষ্ঠীতে লেখা নেই। নির্দিষ্ট সময়তেই গেলাম নিরস্ত্র, একাকী। গিয়ে পরিচয় হোলো নিনার বোনের সঙ্গে। বছর ছত্রিশের বিবাহিতা মহিলা। কিন্তু মুহূর্তের জন্যও উনি আমাদের সঙ্গ ছাড়লেন না। একটি কথাও হোলো না নিনার সঙ্গে একান্ত নিভৃতে।

পরদিন শহরের পথে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি। একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত অফিসার এগিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করতে। অতি বিনয়ী, অমায়িক ব্যবহার—আমি বললাম "আপনার কিছু বলার থাকলে বলুন, আমি কিছুই মনে করবো না।"

—"দেখুন মশায়, আপনি বিদেশী, তাই আপনি স্পেনের লোকদের আচার-আচরণ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। আপনি জানেন না রোজ রাতে নিনার বাড়িতে উপস্থিত হোয়ে কি বিপদ আপনি নিজের মাথায় টেনে আনছেন।"

—"কেন কি হোয়েছে ? আমার বিশ্বাস কাউণ্ট ভালোরকমেই জানেন আমার আসা যাওয়ার কথা। আর তাইতে তিনি বাধাও দেন না।"

—"জানেন তো নিশ্চয়ই—কিন্তু এখন বাধা না দেবার ভান করলেও ভীষণ ভাবে শাস্তি দেবেন এর জন্য। আমার উপদেশ নিন মশায়, আপনার ওই রাতের প্রমোদ বন্ধ করে দিন।"

—"উপদেশের জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কিন্তু যত দিন না কাউণ্ট নিজে আমাকে বলবেন কিম্বা নিনা আমাকে যেতে বারণ করবে, ততদিন আমি যাওয়া ছাড়বো না"—

আমি এ ব্যাপার নিনাকে জানাই নি। প্রতি রাতেই যেতাম আগের মত। কি নির্বুদ্ধিতা—প্রেমে পড়লেও একটা কথা ছিলো!

তারিখটা ছিলো ১৪ই নভেম্বর। নিনার ঘরে ঢুকতেই দেখি একজন অচেনা লোক নিনাকে কি সব শিল্পকলা দেখাচ্ছে। কাছে যেতেই চিনলাম লোকটা আমার পুরাতন শত্রু অতি কুখ্যাত এক শিল্পী। সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে গেলো। নিনার হাত ধরে পাশের ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললাম, এক্ষুনি ওই শয়তানটাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে—নয়তো আমি নিজেই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো।

"কিন্তু ও একজন চিত্রকর।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি, আমি চিনি ওকে। সব বলবো পরে, এখন আগে ওকে তাড়াও।"

নিনা ওর বোনকে ডেকে বলে দিলে লোকটাকে চলে যেতে বলতে, আর যেন কখনো না আসে তাও জানিয়ে দিতে। ওর বোন ওকে বিদায় করে এসে বললে, যাবার সময়ে লোকটা বলে গেছে এর জন্যে আমাকে ভুগতে হবে।

পরদিন রাতে আবার গেলাম নিনার কাছে। ওর প্রাসাদের প্রবেশপথটি যেমন দীর্ঘ তেমনি অন্ধকার। মাত্র কয়েক পা' এগিয়েছি এমন সময় দুজন লোক অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি চকিতে এক পা পিছিয়ে এসেই আমার তলোয়ারটা বার করে সবচেয়ে কাছে যে লোকটা তাকে সজোরে আঘাত করলাম। সেই সঙ্গে 'খুন' 'খুন' বলে চিৎকার করে একেবারে পিছন ফিরে উর্ধ্বশ্বাসে রাস্তায় পড়ে ছুটতে লাগলাম। পিছন থেকে দ্বিতীয় লোকটা গুলী ছুড়েছিলো একটুর জন্যে বেঁচে গেলাম। প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে একবার হোঁচট খেয়ে পড়ে টুপীটা ছিটকে বেরিয়ে গেলো। কিন্তু সেদিকে দৃকপাতও না করে সোজা এসে উঠলাম আমার হোটেলে। হোটেলের কর্তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে আমার রক্তমাখা তলোয়ার, দু'টুকরো হোয়ে যাওয়া কোটটা ফেলে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বললাম—"আমি শুতে যাচ্ছি, আমার কোট আর তলোয়ার আপনি রাখুন। কাল আপনাকে নিয়ে আমি বিচারালয়ে যাবো; কারণ আজ রাতে একজন খুন হোয়েছে—আপনি সাক্ষী দেবেন যে আত্মরক্ষা করতে গিয়েই হোয়েছে"—

"কিন্তু আপনি এই শহর ছেড়ে এই মুহূর্তে পালালেই ভালো করতেন"—

"—তার মানে? আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না?"

—"আপনার কথা আমি বর্ণে বর্ণে বিশ্বাস করি—কিন্তু দোহাই আপনি পালান, আমি আন্দাজ করতে পারছি কে আপনাকে আঘাত করেছে—ঈশ্বর জানেন এর পর কি হবে।"

—"কিছুই হবে না, আপনার কথায় এখন যদি আমি চলে যাই তবে নিজেকে দোষী প্রমাণিত করা হবে। আমার তলোয়ারটা রাখুন—দেখি কি হয়।"

ভোরবেলা সাতটারও আগে আমার দরজায় প্রচণ্ড ধাক্কার শব্দ। হোটেলের কর্তা আর তাঁর সঙ্গে একজন অফিসার আমার ঘরে ঢুকে আমার সমস্ত কাগজপত্র আর পাশপোর্ট চাইলেন আর আমাকে যত শীঘ্র সম্ভব বেশ পরিবর্তন করে ওঁর সঙ্গে যেতে আদেশ করলেন। অন্যথায় জোর করতে উনি বাধ্য।

—"আমি আপনাদের বাধা দিচ্ছি না, কিন্তু কার হুকুমে আর কি অপরাধে আমার কাগজপত্র পাশপোর্ট আপনি নিচ্ছেন?"

—"এখানকার শাসনকর্তার আদেশে। অবশ্য আপনার কাগজ-পত্র সন্দেহজনক না হলে যথাসময়ে আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

আমার কিছু জামাকাপড় একটা ছোটো স্যুটকেশে ভরে নিলাম আর সমস্ত কাগজপত্র ওদের দিলাম, তার বদলে অবশ্য একটা রসিদও পেলাম। তারপর অফিসার আর তাঁর লোকজনের সঙ্গে এসে পৌঁছলাম একেবারে দুর্গের ভিতর। সেখানে দোতলায় একখানি খালি অথচ পরিচ্ছন্ন ঘরে আমাকে রাখা হোলো। ঘরের জানালা থেকে সামনেই একটা পার্ক দেখা যায়, জানলায় একটা গরাদ অবধি নেই। একা-একা বসে রইলাম যতক্ষণ না আমার ছোটো স্যুটকেশটা আর একপ্রস্থ বিছানা একজন প্রহরী দিয়ে গেলো। বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিন্তা করতে লাগলাম নিনাকে কি এসব জানানো উচিত?

লিখবো একটা চিঠি ওকে? এমন সময় হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ শুনে জানলা দিয়ে চেয়ে দেখি, নিনার বাড়িতে দেখা আমার সেই পুরাতন শত্রুটিকে প্রহরীরা বন্দিশালায় নিয়ে যাচ্ছে। মুখ তুলে আমাকে দেখতে পেয়ে শয়তানটা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো! আমিও মনে মনে হেসে ফেললাম। এতক্ষণে বোঝা গেল ও নিশ্চয়ই আমার সম্বন্ধে ভয়াবহ অপরাধ কিছু আবিষ্কার করেছে। এখন সেই সব অপরাধ প্রমাণিত না হওয়া অবধি ওকেও বন্দী করে রাখা হবে।

দুপুরবেলা আহারের আয়োজন দেখলাম আশাতীত ভালো। তাছাড়া একটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে একজন সিপাহী কালি-কলম আর বাতি দিয়ে গেল। আমার খাদ্যের কিছু ভাগ ওকে দিলাম, কৃতজ্ঞতায় ও বিগলিত হোয়ে রইলো।

চতুর্থ দিন সকালে সেই অফিসারটি এসে হাজির—বিনীতভাবে জানালে দুঃসংবাদ আছে—আমায় দুর্গের ভিতর মাটির তলার অন্ধকার খুপরীর মধ্যে বন্ধ রাখার জন্য আদেশ এসেছে।

বড় বড় পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা গোল ছোটো খুপরীর ভিতর আমাকে বন্ধ রাখা হোলো। বলা হোলো, আমার খুশীমত আহার্য সব সরবরাহ করা হবে আর আমি যদি চাই একটা আলোর ব্যবস্থাও হতে পারে। যখন আমার আহার্য এলো অফিসারটিও সদলে এলেন। মুরগীটাকে ছুরি দিয়ে কেটে অন্য সব খাদ্যের ভিতর কাঁটা দিয়ে গেঁথে গেঁথে পরখ করা হোলো ভিতরে কিছু আছে কি না। আহার্য আর মদ দুই-ই ছিলো চমৎকার আর পরিমাণে অন্ততঃ আরও ছয় জন খাবার মত। সে সব আমার প্রহরীদের মধ্যে আমি ভাগ করে দিলাম। বেচারারা সারা জীবনেও এত সুখাদ্য খায়নি—কৃতজ্ঞতায় ওরা আমার কেনা হোয়ে রইলো।

দীর্ঘ বিয়াল্লিশটি দিন কাটলো মাটির নীচে এই অন্ধকার কারা-কক্ষে। এই দীর্ঘ দিনগুলি ধরে আমি লিখেছিলাম 'অ্যামেলট স্তু হোসের' ভেনিসের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস নামক বইটির একটি সম্পূর্ণ প্রতিবাদ। সম্পূর্ণ মন থেকেই লিখতে হোয়েছিলো, তাছাড়া কলমের অভাবে পেন্সিলে।

আটাশে ডিসেম্বর একজন অফিসার এসে আমাকে বেশ পরিবর্তন করে তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন।

—"কোথায় যাচ্ছি আমরা ?"

—"ক্যাপ্টেন জেনারেল আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন তাঁর কাছেই আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।"

অফিস ঘরে এসে দেখা হোলো আমাকে যিনি গ্রেপ্তার করেছিলেন সেই অফিসারটির সঙ্গে। তিনি আমাকে প্রাসাদের অপর অংশে নিয়ে গেলেন সেখানে একজন কেরাণী আমাকে একটা তোরঙ্গ এনে দিলে, তার ভিতর আমার যাবতীয় কাগজপত্র রয়েছে দেখলাম। একটি কাগজের টুকরাও নষ্ট হয়নি তিনটি পাশপোর্টও রয়েছে। অফিসারটি বললেন. ওগুলি আসলই বটে !

—"আমি জানি তা, আর বরাবরই জানতাম এগুলি জাল নয়।" আমি বললাম।

—"তা ঠিক, কিন্তু সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ছিলো। আর এখনই আপনাকে জানিয়ে রাখি যে, আপনাকে তিন দিনের মধ্যে বার্সিলোনা আর এক সপ্তাহের মধ্যে কাটালোনিয়া ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

—"মানতে বাধ্য আমি, যদিও এটা আমার প্রতি অন্যায় অবিচার করা হোলো।"

—"আপনি এর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনতে পারেন মাদ্রিদে—যদি ইচ্ছা করেন।

—"অভিযোগ করবোই তবে প্যারিসে—মাদ্রিদে নয়। স্পেনের অভিজ্ঞতা আমার যথেষ্ট হয়েছে। আপনি এখন দয়া করে আমার উপর যা কিছু আদেশ হোয়েছে সেগুলি লিখিত ভাবে দিন"—

একজন অফিসারের সঙ্গে আমরা হোটেলে ফিরে এলাম। হোটেলের কর্তাটি সত্যিই সজ্জন। ভারী খুশী হোলো আমাকে দেখে। জানালে আমার ঘর যেমন ছিলো তেমনি আছে একজনও ঢোকেনি ওই ঘরে। আমার সেই তলোয়ার, সেই দু'টুকরো কোট আমাকে ফিরিয়ে দিলে আর তার সঙ্গে অবাক হোলাম সেই পথের মধ্যে ফেলে আসা টুপীটা দেখে।

যখন আমি আমার বিলটা আনতে বললাম তখন হোটেলের কর্তা সবিনয়ে জানালেন, সমস্ত টাকাই পরিশোধ করা হোয়েছে—তা ছাড়া তার উপর আদেশ এসেছিল যতদিন আমি বন্দী থাকবো ততদিন আর তারপর যতদিন বার্সিলোনাতে থাকবো ততদিন আমার যা কিছু প্রয়োজনীয় সমস্ত সরবরাহ করতে হবে।

—"কিন্তু এ সবের জন্যে টাকা দিলেন কে?"

—"আপনিও যা' জানেন আমিও তাই।"

—"আচ্ছা আমার সম্বন্ধে বিশেষ করে এই ব্যাপারটা নিয়ে শহরে কিছু বলাবলি হয়নি?"

—"যত রকম বাজে রটনা হোতে পারে সব হোয়েছে। অনেকে বলে, আপনিই নাকি বন্দুক ছুঁড়েছিলেন, কারণ আশ্চর্য ব্যাপার, একজনও আহত পাওয়া যায়নি। সাধারণের মধ্যে রটানো হোয়েছে আপনার পাশপোর্ট জাল, তাই আপনাকে গ্রেপ্তার করা হোয়েছে—

কিন্তু প্রত্যেকেই আসল ব্যাপারটা জানে যে প্রকৃত কারণ হোলো নিনার সঙ্গে আপনার রাত্রি যাপন"—

—"কিন্তু আপনি তো জানেন মধ্যরাত্রিতেই আমি ফিরে আসতাম।"

—"সে কথা আমি সবাইকে বলেছি। কিন্তু আপনি যে রোজ ওই মহিলাটির কাছে যেতেন সেইটাই কোনো বিশেষ ভদ্রলোকের ঈর্ষা আর বিদ্বেষের কারণ। এখনো আমার অনুরোধ রাখুন, আর ওই মহিলাটির ধার মাড়াবেন না"—

—"ভয় নেই। সে বিষয়ে আমি মনস্থির করে ফেলেছি এবার।"

তিন দিন পর যাত্রা স্থরু হোলো আবার তিক্ত ভারাক্রান্ত মনে। দিন তিনেক পরে ফ্রান্সের—আমার প্রিয় ফ্রান্সের একটি বড় গ্রামের মধ্যে একটি সরাইখানায় এসে পৌছলাম রাত্রি দশটায়। বহুদিন পর সুকোমল ফরাসী বিছানায় নিজেকে এলিয়ে দিলাম নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায়, চোখ জুড়ে নামলো গভীর ঘুম—বিখ্যাত ফরাসী মদের কৃপায়।

কানিভ্যালের সময়টাতে এসে য়েকস্'এ পৌছলাম। থ্রি ডলফিন্সে উঠেছিলাম এবার। সারা শহর উৎসবের কোলাহলে মুখরিত। কয়েক দিন খুব বেড়িয়ে একদিন সন্ধ্যায় সাংঘাতিক রকম ঠাণ্ডা লেগে গেলো। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লাম—ঘুম ভাঙলো প্লুরেসির অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে। গৃহকর্তা একজন বৃদ্ধ ডাক্তারকে ডেকে আনলেন। আমার অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হোয়ে উঠলো। দু'দিনের মধ্যেই মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগলো—বাঁচবার কোনো আশাই রইলো না। এমন কি পুরোহিত অবধি ডাকা হোলো স্বীকারোক্তি শোনার জন্য। কিন্তু এত অসহ্য যন্ত্রণার শেষে দশ দিন পর পুরো

আট ঘণ্টা অচৈতন্য থাকার পর আমার জ্ঞান হোলো। বৃদ্ধ ডাক্তারও এবার জীবনের আশ্বাস দিলেন। তারপর স্থরু হোলো সম্পূর্ণ বিশ্রামের মধ্য দিয়ে শুশ্রূষার মধ্য দিয়ে, হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের কাল। কিন্তু এই সমস্ত সময়টা আমাকে সেবা করেছে একটি অপরিচিতা সেবিকা। কি আশ্চর্য তন্ময়তা, মমতা আর নিষ্ঠা—তার সদাজাগ্রত দৃষ্টি আর নিখুঁত যত্নের কোথাও এতটুকু ক্লান্তি ছিল না। বয়সের ভার তার ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো রকম অনুভূতির দুর্বলতাই কখনো প্রকাশ পায়নি ওর অনলস সেবায় কোনো মুহূর্তের অবসরে।

যখন আমি বাইরে বেরোবার মত স্বস্থ হোয়ে উঠলাম তখন আমার যথাসাধ্য পুরস্কার ওকে দিয়েছিলাম আন্তরিক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। কে ওকে আমার সেবায় নিযুক্ত করেছিলো জানতে চাইলে ও জবাব দিয়োছিলো ওই বৃদ্ধ ডাক্তার। কিন্তু কিছুদিন পর যখন আমি ডাক্তারকে বলছিলাম নার্সটির কথা তখন উনি অবাক হোয়ে আমাকে জানালেন যে ওকে আগে কখনো দেখেন নি পর্যন্ত গৃহকর্তা আর তাঁর স্ত্রীও একই কথা বললেন—দেখা গেল ওই মহিলাটির সম্বন্ধে কেউই কিছু জানেন না—ও কে, আর কোথা থেকেই বা এসেছিলো! ওর আসার মত যাওয়াটাও হোয়ে রইলো রহস্যময়।

এখানে থাকতে বার বার আমার মনের পটে ভেসে উঠতো একটি মুখ—সে মুখ হেনরিয়েটার। আমার দিনরাতের অলস চিন্তা ভরে উঠতো ওর স্মৃতিতে। ওর প্রকৃত নাম আমি জেনেছিলাম। মার্কোলিনীকে দিয়ে ও খবর দিয়েছিলো 'য়েকস্' এতে খোঁজ করতে। আমি ভেবেছিলাম কোথাও কোনো সভায় কোনো সমিতি কোনো উৎসবে ওর সঙ্গে দেখা হবেই। প্রায়ই ওর নাম শুনতাম; কিন্তু

কখনো ওর সম্বন্ধে একটি প্রশ্নও করিনি কোথাও—চাইনি যে কেউ জানুক আমি ওকে চিনি। একবার ভাবলাম ও বোধহয় বাগান-বাড়িতে আছে—আমারই অপেক্ষায়—হৃতস্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পর যাবো ওর কাছে এই আশায়—

গেলাম ওর সঙ্গে একটিবার দেখা করার উদ্দেশ্যে। পকেটে ওকে লেখা একটি চিঠি ভরে নিয়ে। চিঠিটা আগে পাঠিয়ে তারপর অপেক্ষা করবো ওর দরজায় যতক্ষণ না ও নিজে আসবে আমাকে স্বাগত জানাতে। সকাল এগারোটা নাগাদ পৌছলাম—চিঠিখানি দিলাম একজন পরিচারকের হাতে। সে বিনীতভাবে জানালে, মাদামের কাছে চিঠিখানি নিশ্চই পাঠিয়ে দেবে।

—"সে কি! উনি এখানে নেই নাকি?"

—"না, মহাশয়, মাদাম তো এখন 'য়েক্‌স্'এ"

—"কত দিন আছেন ওখানে?"

—"প্রায় ছ'মাস হোলো আছেন।"

—"কোথায় থাকেন সেখানে?"

—"ওর নিজেরই বাড়িতে। এখানে গরমের সময়ে সপ্তাহ তিনেকের জন্মে আসেন।"

—"আমার চিঠিটা একবারটি ফিরিয়ে দেবে আর কয়েকটি লাইন লিখে দেবো।"

—"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। আপনি ভিতরে আসুন। আমি মাদামের ঘর খুলে দিচ্ছি আপনাকে—সেখানে আপনার প্রয়োজনীয় সবই পাবেন"—

ভিতরে এলাম ওর পিছনে পিছনে। তারপর আমার মনের অবস্থাটা একবার কল্পনা কর, যখন দেখলাম আমার মুখোমুখি সেই

মহিলাটিকে যে মাত্র কয়েক দিন আগে অবধি আমার শুশ্রূষা করেছে সেই রহস্যময়ী সেবিকা—

—"আপনি ! আপনি এখানে থাকেন ?"

—"হ্যাঁ মহাশয় ! গত দশ বছর ধরে আমি এখানেই আছি।"

—"তাহলে আপনি আমার সেবা করতে এসেছিলেন কেমন করে ?"

—"মাদাম আমাকে জরুরী তলব করেছিলেন। আমি ওঁর কাছে যেতেই তখনি আমাকে পাঠালেন আপনার রোগশয্যার পাশে। তিনিই বলে দিয়েছিলেন আপনার প্রশ্নের উত্তরে জানাতে যে ডাক্তারই পাঠিয়েছেন আমাকে।"

—"কিন্তু ডাক্তারও যে বললেন কিছু জানেন না ?"

—"তাহলেও তিনিও বোধ হয় মাদামের নির্দেশমত চলেছিলেন কিন্তু অবাক হচ্ছি আপনি এত দিনেও 'য়েক্‌স্‌'এ মাদামের দেখা পান নি ?"

—"বোধ হয় উনি বেশী মেশেন না, কারণ আমি তো সর্বত্রই যেতাম।"

—"বাড়িতে মাদাম কারো সঙ্গে দেখা করেন না বটে কিন্তু যান তো সর্বত্রই।"

—"আশ্চর্য ! আশ্চর্য শুধু ওর সঙ্গে আমার দেখা হোলো না। ওকে কোথাও দেখে চিনতে পারি নি সে তো হোতেই পারে না। আপনি বলছেন ওর সঙ্গে দশ বছর ধরে আছেন। ওর চেহারা কি খুব বদলেছে ? কিম্বা কোনো অসুখে ভুগে ওকে কি অন্য রকম দেখতে হয়ে গেছে ? ওর চেহারায় কি বড় বেশী বয়সের ছাপ পড়েছে ?"

—"ও-সব কিছুই নয়—ওর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অবশ্য অনেক ভালো হোয়েছে—কিন্তু এখনও তিরিশের বেশী বয়স বলে মনেই হয় না"

—"আমি নিশ্চয়ই অন্ধ হোয়ে গিয়েছিলাম।"

হেনরিয়েটা, হেনরিয়েটা—ওর চিন্তাতেই আমার সমস্ত মন চঞ্চল হোয়ে ওঠে—এত কাছে এসে, এত আশার পরও ওর দেখা পেলাম না! সমস্ত মন একটা গভীর ব্যাকুল আবেগে ভরে উঠলো। কি যে করবো কিছুই যেন ঠিক করে উঠতে পারলাম না। আবার য়েক্স্-এতে ফিরে যাওয়া কি হবে? সেখানে ও একা আছে—বাড়িতে কারো সঙ্গে দেখা করে না—তবে? তবে কোথায় বাধা ওর আমার সাথে কথা বলার আমাকে কিছু ইঙ্গিতে জানাবার?—কিন্তু যদি ও আমার সঙ্গে দেখা না করে? না না, সে হোতেই পারে না—ও যে এখনও আমাকে ভালোবাসে আমার রোগশয্যার পাশে অমন অতন্দ্র প্রহরী তাহলে পাঠালে কে? কোন হৃদয়ের ব্যাকুলতা? তবে—তবে কি কোথাও আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে ওর সাগ্রহ উৎসুক দুটি গভীর চোখের উজ্জ্বলতাকে ম্লান করে দিয়ে?—তাই কি দ্বিধায় দুলছে ওর মন? ও নিশ্চয়ই জানে আমি এখন য়েক্স্-এতে নেই—ও নিশ্চয়ই বুঝেছে আমি এখানে এসেছি। তবে? আমিই কি যাবো ওর কাছে এগিয়ে? না আগে লিখে জানাবো···

লিখে জানানোই ভালো। এই সিদ্ধান্তেই এলাম শেষ অবধি। চিঠিখানি লিখে পাঠিয়ে দিলাম। চিঠির শেষে জানিয়ে দিলাম মার্সেলসে প্রতীক্ষা করবো পত্রের উত্তরের—অবশেষে এলো আমার বহু আকাঙ্ক্ষিত, বহু প্রত্যাশিত কয়েকটি লাইন—

—চির-পুরাতন বন্ধু আমার—

বলো তো এর চেয়ে রোমান্টিক আর কি হোতে পারে—সেই ছয় বছর আগে আমাদের দেখা আমার বাগান-বাড়িতে আবার এখন বাইশ বছর পরে সেই সুদূর অতীত জেনিভাতে বিদায় নেবার দিনটি থেকে ? আজ আমরা দু'জনেই এগিয়ে চলেছি বার্ধক্যের পথে প্রকৃতির নিয়মে। কিন্তু বিশ্বাস করবে আমার একটি কথা ? আজও তোমাকে ভালোবাসি তবু আমাকে চিনতে পারনি দেখে খুশীই হোয়েছি মনে মনে—না, কুৎসিত কুরূপ আমি হইনি, 'তবু তোমার সেই হেনরিয়েটা আজ নেই। স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি তাকে তার দেহগঠনে পরিবর্তন এনেছে বৈকি—বিরাট পরিবর্তন। আজ আমি বিধবা, আজ আমি সুখী, আর আজ আমার অনেক টাকা—কেন বলছি জানো, যদি তুমি কোনো অভাবে পড়ো তাহলে শুধু হেনরিয়েটার কাছ থেকেই শূন্য ঝুলি ভরে নেবে বলে। এখানে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসো না—তুমি ফিরে এলে শুধু কতকগুলি রটনারই সৃষ্টি হবে—তা' আমি চাই না। তবে যদি পরে আবার আসো তখন দেখা হবে আমাদের—কিন্তু পুরানো পরিচয়ের সূত্র ধরে নয়। শুধু এইটুকু আমার আনন্দ তোমার রোগশয্যায় দীর্ঘ বিলম্বিত দিনগুলি কিছু সহনীয় করতে পেরেছি মেয়েটিকে পাঠিয়ে। ওর নিষ্ঠার প্রতি আমার গভীর বিশ্বাস।

যদি তুমি চাও আমাদের মধ্যে এই পত্র লেখার সেতু বাঁধতে আমি সানন্দে রাজী। সেই 'দি লেডস' থেকে তোমার পালানোর পর আজ অবধি তোমার সমস্ত খবর তোমার প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি জানার জন্যে আমার মন উৎসুক হোয়ে আছে। আর এত দিন ধরে তোমার হৃদয়ের যে পরিচয় আমি পেয়েছি তা'তে আমিও আজ অসঙ্কোচে তোমাকে বলতে পারি আমার সমস্ত গোপন পূর্ব

পরিচয়—কেন সেসেনাতে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হোয়েছিলো …কেন আমাকে স্বদেশেই ফিরে আসতে হোলো—সব তোমাকে জানাবো।

প্রথম ঘটনাটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আর অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার। একমাত্র মঁসিয়ে ছ্য আঁতোয়ানই সব ঘটনাটা জানেন। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা তোমাকে জানাই তোমার সংযমের জন্য, আমার সম্বন্ধে এতটুকুও ঔৎসুক্য প্রকাশ না করার জন্যে। মার্কোলিনার কাছে আমার সব খবর পেয়েছিলে নিশ্চয়ই—সেই ছ'বছর আগে?

বিদায়—

প্রত্যুত্তরে লিখেছিলাম আমার বিচিত্র জীবনের বৈচিত্র্যের কাহিনী—সাগ্রহ সম্মতি জানিয়েছিলাম পত্রলেখার এই বন্ধনটুকু রাখতে। ফিরে এসেছিলো হেনরিয়েটা লিপির সেতু পার হোয়ে ওর সমস্ত গোপন পরিচয়ের অবগুণ্ঠন সরিয়ে—

একের পর এক চল্লিশখানি চিঠি পাই হেনরিয়েটার কাছ থেকে। যদি আমার আগে ওর মৃত্যু হয় তবে আমার স্মৃতিকথায় ওর প্রতিটি লিপি যোগ করে দেবো—আমার স্মৃতিকথার সঙ্গে ওর লেখার থাকবে অচ্ছেদ্য বন্ধন—

কিন্তু আজও হেনরিয়েটা বেঁচে আছে আর বার্ধক্যের সীমা-রেখায় দাঁড়িয়েও ও সুখী—

সপ্তদশ অধ্যায়

আমার বহু পরিশ্রমে রচিত গ্রন্থ—অ্যামেলট ছ হোসের 'ভেনিস শাসনতন্ত্রের ইতিহাসের প্রতিবাদ' আজ সমাপ্তির পথে। স্পেনের বন্দিজীবনে নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলি কাটিয়েছিলাম এই গ্রন্থটি রচনায় —কিন্তু তখন শুধু স্মৃতিটুকুই সম্বল ছিলো। ফ্রান্সে এসে সমস্ত রচনাটিকে সংশোধন করলাম। তখনি ভেবেছিলাম সুইজারল্যাণ্ড থেকে গ্রন্থটি প্রকাশ করবো। আমার উদ্দেশ্যের কথা পরিচিত বন্ধু মহলে প্রকাশ করতেই চারিদিক থেকে অযাচিত ভাবে সাহায্য পেলাম। আগেই শুনেছিলাম, লুগানোতে একটি খুব ভালো ছাপাখানা আছে আর সেখানে সেন্সারের কোনো হাঙ্গামা নেই। সবচেয়ে বড় কথা ওই ছাপাখানাটির মালিক একজন রীতিমত বিদ্বান লোক।

লুগানোতেই চলে এলাম। মালিকের সঙ্গে সব ব্যবস্থাও হোয়ে গেল। অতি সৎ প্রকৃতির লোক। প্রথমেই ভূমিকা আর সূচনাটি ছাপা হ'য়ে এলো। পরিষ্কার হরফ আর সুন্দর দামী কাগজ দেখে খুব খুশী হোয়ে উঠলাম। এই সময় পুরো একটি মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি বইটির সুষ্ঠু প্রকাশের জন্যে। রবিবার উপাসনায় যাওয়া ছাড়া ছুনিয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখিনি। অক্টোবরের শেষাশেষি সম্পূর্ণ গ্রন্থখানি তিনটি খণ্ডে প্রকাশিত হোলো —আর বছর ঘোরার আগেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ। লেখার উদ্দেশ্য টাকার চেয়েও বেশী ছিলো ভেনিসের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সুনজরে পড়ার। সত্যি, ইউরোপের দেশে দেশে এতদিন ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত দেহ-মন চাইছিলো নিজের দেশে আপন জন্মভূমিতে ফিরে যেতে—এই নির্বাসিত জীবন ছুঃসহ হোয়ে উঠেছিলো।

'হোসে'র ওই ইতিহাস গত সত্তর বছব ধরে নির্বিবাদে একচ্ছত্র আধিপত্য চালিয়ে এসেছিলো, কেউ কোনোদিন বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ জানায়নি। অবশ্য ভেনিসে থেকে কারও সাধ্য ছিলো না কোনো সমালোচনা করার…কারণ ভেনিসের শাসন বিভাগ ওই ইতিহাসের পক্ষে বা বিপক্ষে সমস্ত আলোচনাই নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলো। আমার বিশ্বাস, সে কাজটা আমারই জন্যে অপেক্ষা করেছিলো…আমার এই অস্বাভাবিক অবস্থার থেকে মুক্তি দিতে। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে আর যে সব উদাহরণের সাহায্যে আমি ওই ইতিহাসটির ভুল-ভ্রান্তিগুলি তুলে ধরেছিলাম তাইতে নিজেরই আশা হোয়েছিল শাসন বিভাগের কাছ থেকে সুবিচার পাবার। স্বদেশে ফিরে আসার অনুমতি এখন সত্যিই আমার প্রাপ্য—আজ চৌদ্দ বছর নির্বাসনের শেষে! তা ছাড়াও মনে হোয়েছিলে, দেশের গোয়েন্দা বিভাগ তাদের সেদিনের নিষ্ঠুরতার প্রতিকারের এমন একটা সুযোগ সানন্দেই গ্রহণ করবে। অনুমান আমার ঠিকই হোয়েছিলো—যদিও ওরা আরও পাঁচটা বছর আমাকে অতি তুচ্ছ একটা কারণে অপেক্ষা করালো, যেটা ইচ্ছা হোলে তখনি করা যেতো। সে যাক্, আমার পরম আত্মীয় পিতৃসম ম্যঁসিয়ে ছ ব্রাগার্দা তখন বেঁচে নেই—তবু তাঁর সেই বন্ধু দুটি ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় ভেনিসের পঞ্চাশ জন লোক গোপনে আমার বইখানির গ্রাহক হোলেন।

লুগানোতে কাজ শেষ হোলে সেখান থেকে গেলাম টুরিন। কিছুকাল সেখানে কাটাবাব পর পাড়ি দিলাম রোমে।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সুদীর্ঘ ছয়টি মাস রোমে কাটাবো মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলাম। তাই স্পেনীয় দূতাবাসের ঠিক সামনেই আমার বাসা ঠিক করলাম। রোমে এসে প্রথম দেখা করলাম পুরানো বন্ধু কার্ডিন্যাল ছ্য বার্ণাসের সঙ্গে—সত্যিকারের খুশী হলেন উনি আমাকে দেখে। আরও খুশী আমার স্বচ্ছল অবস্থায়। ভেনিসের রাষ্ট্রদূতের কাছে আমার পরিচয়পত্রটি নিজেই নিয়ে যাবেন বললেন, সেই সঙ্গে আমার পক্ষ নিয়ে বেশ দু'চার কথা বলারও সুবিধা পাবেন।

প্রিন্স ছ্য সান্তাক্রস আমাকে ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে একদিন দেখা করতে বললেন। যে কোনো দিন বেলা এগারোটা কিম্বা দুপুর দুটোর পর তাঁকে পাওয়া যাবে। দুপুব বেলা যাওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে হোলো। গিয়ে দেখি রাজবধু শয্যালীনা—যেহেতু আমি খুব একজন গণ্যমান্য পদস্থ ব্যক্তি নই, তাই লৌকিকতার প্রয়োজন ছিল না। আমাকে সোজাসুজি সেই ঘরেই আহ্বান জানানো হোলো। আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য, কিছুই আমার জানতে বাকী রইলো না। সুকুমার তরুণ দেহখানি ঘিরে শুধু সৌন্দর্য নয়, আনন্দও যেন উচ্ছল হোয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ওঁর প্রতিটি ভঙ্গীতে, অনর্গল কথায় আর উচ্ছ্বসিত হাসিতে। উত্তরের অপেক্ষা না করেই অজস্র প্রশ্ন আর অদম্য কৌতূহল—সব মিলিয়ে সুন্দর সাজানো হাসিখুশী একটা পুতুল—কার্ডিন্যালের মন ভোলানোর খেলনা!

সারাক্ষণ গভীর দায়িত্বপূর্ণ, জটিল কাজকর্মের মাঝখানে ও যেন ক্ষণিক অবসর বিনোদনের উপকরণ। কার্ডিন্যাল দিনে তিন বার আসতেন—আর প্রতি বার তাসের বাজি খেলে সুকৌশল পরাজয়ের

মধ্যে দিয়ে ওকে ছয় সেকুইন জিতিয়ে দিতেন। এমনি করে ও রোমের মধ্যে তখন সবচেয়ে ধনী মহিলা। তাই বোধ হয় প্রিন্স অন্তরের নিভৃততম কোণে ঈর্ষায় ঈষৎ জ্বালা অনুভব করলেও স্ত্রীর এই দৈনিক আঠারো সেকুইন লাভের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করার মত নির্বোধ হোতে পারেন নি। বিশেষ করে যখন একা কার্ডিন্যালের জন্য আরও পাঁচটি দরদীর ভিড় আর বাজে গুজব রটনার হাত এড়ানো যায়, তখন মন্দ কী?

মাসখানেকের ভিতরই আমি এই তিনজনের একেবারে ছায়া হোয়ে দাঁড়ালাম। আমাকে না হোলে ওঁদেরও এক মুহূর্ত চলতো না। আমি কিন্তু ওঁদের ভিতর তর্কাতর্কি কিম্বা ঝগড়াঝাঁটির উপক্রম হোলে তার ত্রিসীমানাতেও থাকতাম না। তবে একঘেয়ে ক্লান্তিকর মুহূর্তগুলি সরস রঙ্গীন হাসি-গল্পে প্রাণবন্ত করে তুলতে আমি ছিলাম অপরিহার্য।

বেশ কাটছিলো দিনগুলি। প্রতিটি সন্ধ্যা কাটাতাম ডাচেস ছ ফিয়ানের কাছে আর অপরাহ্নটি ছিলো সান্তা ক্রসের প্রিন্সেস এর জন্যে। বাকী সময়টা বাড়িতেই কাটতো গৃহকর্ত্রীর কন্যা মার্গরিৎ আর মেনিকোচ্চিও নামে একটি তরুণের সঙ্গে হাসি-গল্পে। মেনিকোচ্চিও ঐ বাড়িতেই থাকতো, ওকে আমার সত্যিকারের ভালো লাগতো। ও প্রেমে পড়েছিলো আর সারাক্ষণ আমার কাছে ওর প্রেমিকার গল্প করতো। ওর ভারী সখ ছিলো আমাকে একবার ওর প্রেমিকাকে দেখাতে। মেয়েটি থাকতো কনভেণ্টে। মাত্র দশ বছর বয়সেই ওকে কনভেণ্টে দিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে ও মুক্তি পাবে একেবারে বিয়ের সময়, তার কার্ডিন্যালের অনুমতিতে। ওই কনভেণ্টের সর্বময় কর্তা উনিই। মেনিকোচ্চিওর বোনও ওই

একই কনভেণ্টে ছিলো—তাকে ও প্রতি রবিবার দেখতে যেতো। সেখানেই ওর প্রেমিকাকে ও প্রথম দেখে আর কনভেণ্টের নানা নিয়মের কড়াকড়ির ফলে এতদিনে পাঁচ-ছয়বারের বেশী কথাও বলতে পায়নি বেচারী।

ওই আশ্রমটি যাঁরা চালাতেন তাঁদের ঠিক মঠবাসিনী সন্ন্যাসিনী বলা যায় না। কারণ, তাঁদের কোনো ব্রত বা শপথ কিছুই করতে হয় না—সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদও ধারণ করতে হয় না। তবে মঠ ছেড়ে চলে যাবার জন্য কোনো দিনই ওঁরা লুব্ধ হোয়ে উঠতেন না। কারণ বেশ জানতেন, বাইরের দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে বেরিয়ে এসে রাস্তায় রাস্তায় একটু খাদ্যের আশায় ভিক্ষা করে বেড়ানো ছাড়া কোনো উপায় থাকবে না। আর তরুণী মেয়েদের পক্ষেও মুক্তির দুটি পথ—একটি বিবাহ আর একটি পলায়ন। দুটিই রীতিমত কষ্টসাধ্য।

শহরের ঠিক বাইরেই একটা বিশ্রী বিরাট বাড়ি নিয়ে আশ্রমটি। ডবল করে মোটা গরাদ দেওয়া বারান্দা। এত ঘেঁষাঘেঁষি গরাদ যে একটা শিশুরও হাত গলে না। আর ওধার থেকে যে কথা বলছে তাকে ভালো করে দেখাও যায় না। আমি মেনিকোচ্চিওকে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার প্রেমিকাটিকে প্রেমে পড়বার মত ভালো করে দেখলে কোথা থেকে হে?

—প্রথম দিনেই ওদের কর্ত্রী একটি জ্বলন্ত বাতি ভুলে ফেলে গিয়েছিলো, অন্য সময় মেয়েটি আমার বোনের সঙ্গিনী হিসাবে আসতো—কিন্তু কোনো আলো না নিয়ে—আজও বোধ হয় আলো ছাড়াই আসবে। কারণ, পরিচারিকাটি 'মাদার সুপিরিয়র' (আশ্রমের কর্ত্রী)-কে তোমার আসার কথা জানাতে গেছে।

সত্যিই আমরা কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, ঝাপসা অন্ধকারে তিনটি নারীমূর্তি এগিয়ে এলো। ভালো কোরে কিছুই বোঝবার উপায় ছিলো না। শুধু শুনে বুঝলাম মেনিকোচ্চিওর বোনের কণ্ঠস্বর কি অপূর্ব সুষমায় ভরা! মুহূর্তে বুঝলাম, অন্ধ লোকেও কেমন করে প্রেমে পড়ে—সে শুধু এমন রমণীয় সুধাভরা স্বরের মাধুর্যে।

ওদের কর্ত্রীটিকেও তরুণী বলা যায়। বয়স ত্রিশেরও কম। আমি তার সঙ্গেই কথাবার্তা চালাচ্ছিলাম। শুনলাম, পঁচিশ বছরের পর মেয়েরা অল্পবয়সী মেয়েদের উপর কর্তৃত্বভার পায়। আর পঁয়ত্রিশ বছরের পর আশ্রম থেকে চলে যেতে পারে ইচ্ছা করলে, কিন্তু সাধারণতঃ চলে যাবার ইচ্ছাটা কারো হয় না বড় একটা।

—তাহলে আপনাদের মধ্যে বৃদ্ধাও অনেক আছেন বলুন?

—তা' আমরা সবশুদ্ধ একশো'র উপর। একমাত্র বিয়ে করে চলে গেলে কিম্বা মারা গেলে আমাদের সংখ্যা কমে। আমিই তো গত বিশ বছর ধরে আছি এখানে। এতদিনে মাত্র চার জনের বিয়ে হতে দেখলাম। চার জনেই কিন্তু বিয়ের আসরে যাবার আগে বরকে দেখেই নি। যদি কেউ আমাদের কর্তা কার্ডিন্যাল-এর কাছে আমাদের কাউকে বিবাহ করবার জন্যে অনুমতি চায়, তবে সে হয় পাগল নয় তার দুশো ক্রাউন মুদ্রার ভীষণ প্রয়োজন। অবশ্য স্ত্রীকে ভরণপোষণের ক্ষমতা আছে, সে খোঁজ না নিয়ে কার্ডিন্যাল কখনো অনুমতি দেন না।

—আচ্ছা যে বিয়ে করবে, সে পছন্দ করে কি করে?

—সে শুধু বয়স আর কি ধরনের স্ত্রী সে চায় সেটা কার্ডিন্যালকে জানায়। তিনি 'মাদার সুপিরিয়র'-এর উপরই নির্বাচনের ভার দেন।

—এখানে খাওয়া-পরার ব্যবস্থাটা ভালোই নিশ্চয়ই?

—মোটেই নয়। বছরে হাজার ক্রাউন পাওয়া যায়, তাই দিয়ে এতগুলি মেয়ের পক্ষে ভালো ভাবে স্বচ্ছল, স্বাচ্ছন্দ্যে থাকাটা স্বপ্ন—

—আচ্ছা, এই বন্দিশালায় তবে কারা ছেলে-মেয়েকে পাঠায়?

—যারা অত্যন্ত গরীব, নিতান্তই হতভাগা, তারাই। যারা জানে একটু বড় হলেই মেয়েকে বাইরের জগতের হিংস্র পশুত্বের আর লোভের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না, তারাই—যারা জানে, অন্যায় পথ থেকে রক্ষা করতে পারবে না মেয়েকে, তারাই—আর সেইজন্যেই আমাদের এখানে সব মেয়েরাই সুন্দরী আর রূপসী। এমন কি, যে মেয়ে যথেষ্ট সুন্দরী নয় তাকে নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়। এর বিচারের ভারও কাডিন্যালের উপর, কখনও বা পুরোহিত আর মেয়েটির বাপ-মাও বিচারের ভার নেন। যে সুন্দরী নয় তাকে প্রত্যাখ্যানের কারণে ওঁরা বলেন, কুৎসিত মেয়েরা কোনো লোককেই প্রলোভিত করতে পারে না—তাদের দিয়ে পাপের প্রসার লাভেরও কোনো আশঙ্কা নেই তাই। বুঝতেই পারছেন, আমাদের এই যে চিরজীবন বন্দিনীদশা, এই কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন, এর জন্যে বার বার আমরা অভিশাপ দিই আমাদের বিধাতাকে রূপসী করে সৃষ্টি করার জন্যে—আমাদের রূপই তো আমাদের কাল!

আমি ভাবতেও পারছিলাম না এই আশ্রম-ব্যবস্থা কি করে সহ্য করা যায়? কারণ, যে রকম নিয়মের কড়াকড়ি তাইতে এই সব হতভাগিনীরা কোনো দিনই তাদের স্বামী মনোনয়ন করবার বিন্দুমাত্র সুযোগও পাবে না। তার ওপর দুশো ক্রাউন পণ দিয়ে বিয়ে করার নিয়মটি থাকাতে স্পষ্টই বোঝা যায়, আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা বেশ একটি লাভজনক ব্যবস্থাও করেছেন। আমি ফিরে এসে

কার্ডিন্যাল ছ বার্ণাস আর প্রিন্সেস-এর সামনে সমস্ত বিস্তারিত জানালাম। ওঁরা বললেন, এ বিষয়ে পোপের কাছে আবেদন জানাবেন, যাতে আশ্রমবাসিনীরা দালানের ভিতরই সাক্ষাৎপ্রার্থীদের ডাকতে পারেন—তাছাড়া অন্য সব নিয়মকানুনও সাধারণ আশ্রম-গুলির মতই করা হবে। কার্ডিন্যাল আমাকে আবেদনপত্রটি লিখে 'মাদার সুপিরিয়রের' কাছে নিয়ে গিয়ে সবাই-এর সই করিয়ে আনবার কথা বললেন। প্রিন্সেস জানালেন, তারপর উনিও বাইরের থেকে বেশ কিছু সই যোগাড় করে দেবেন। কার্ডিন্যাল অরসিনি নিজেই আবেদনপত্রটি পোপের কাছে পৌছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। পোপের কাচ থেকে অনুমতি আসতে একটুও দেরী হোলো না। উপরন্তু তিনি আরও অনুগ্রহ দেখালেন এই বলে যে, একটা তদন্ত বিভাগ খোলা হবে আশ্রমের কাজকর্মের দিকে নজর রাখবার জন্য—আশ্রমবাসিনীদের সংখ্যা একশো থেকে কমিয়ে পঞ্চাশ করা হবে আর পণের সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে। যে মেয়ে পঁচিশ বছর পার হওয়া সত্ত্বেও বিবাহিত হবে না, সে তার পণের টাকা নিয়ে আশ্রম ছেড়ে চলে যাবে। বারো জন মেট্রন নিযুক্ত করা হবে মেয়েদের দেখাশোনার জন্য। আর বারো জন পরিচারিকা থাকবে গৃহকর্ম করার জন্য।

এই সব কাজ শেষ হতে, সমস্ত বন্দোবস্ত করতে বেশ কিছুদিন লাগলো। প্রথম দিন যেদিন সাক্ষাৎকারীদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হোলো সেদিন মেনিকোচ্চিওর সঙ্গে আমি আবার গেলাম। ওর প্রেমিকাটি সত্যিই সুন্দরী কিন্তু ওর বোন—যেন রূপের ঝরণা—মাত্র ষোলো বছর বয়েস। ওর কমনীয়, দীর্ঘ সুঠাম সুকুমার তনুখানি কবির ভাষায় সঞ্চারিণী লতার মতই। আর কি

আশ্চর্য রং—এমন মোমের মত নরম সাদা রঙ আমার চোখে আগে কখনো পড়েনি—তার সঙ্গে এমন মেঘের মত কালো চুল আর গভীর কালো চোখ। ওর রক্ষয়িত্রী সঙ্গিনী যে মেয়েটি সঙ্গে এসেছিলো সে ওর চেয়ে প্রায় বছর দশেকের বড়। তার কাছে খবর পেলাম, নতুন ব্যবস্থায় আশ্রমের ভিতর কেমন প্রতিক্রিয়া হোয়েছে।

—'মাদার সুপিরিয়র' খুব খুসী হোয়েছেন। মেয়েরাও তো আনন্দে আটখানা। কিন্তু বৃদ্ধাদের নিয়েই মুস্কিল। তারা যা-তা রটাচ্ছে আর রাগের জ্বালায় সারাক্ষণ অশান্তি সৃষ্টি করছে।

মেনিকোচ্চিওর বোন আর্মেলিনা আমার সারা মন জুড়ে বসলো। ওর সঙ্গিনী এমিলিয়াকেও ভারী ভালো লাগলো। কিন্তু নিজের প্রবল উত্তেজনা অনুভব করে গোড়াতেই সাবধান হোলাম আর্মেলিনার সম্বন্ধে। ওর দাদার কাছে জানালাম আমি বিবাহিত, সেই সঙ্গে অনুরোধও করলাম কাউকে সেকথা না বলতে। এমনি করে নিজের চারদিকে একটা আড়াল তৈরী করতে লাগলাম, যাতে কোনো দুর্বল মুহূর্তে কোনো অসতর্কতা সুযোগ নিতে না পারে। তাছাড়াও আর্মেলিনাও যাতে আমাকে নিয়ে মিথ্যে স্বপ্নের জাল না বোনে।

কিন্তু ভালো লাগার তীব্র অনুভূতিকে তো অস্বীকার করা যায় না? হারও মানতে হয় বৈকি মাঝে মাঝে। তাই প্রতি রাতেই একবার করে আশ্রমে না গিয়ে থাকতে পারতাম না। আর্মেলিনা আর এমিলিয়ার সঙ্গে গল্প-গুজব করে আর রাতের বরাদ্দ চকোলেট একসঙ্গে পান করে উঠে আসতাম প্রায় রাত এগারোটায়। ১৭৭১ সালে নববর্ষের দিন ওদের প্রত্যেককে উপহার দিলাম গরম কাপড়ের পোষাক আর 'মাদার সুপিরিয়র'কে চকোলেট, কফি, আর চিনি।

আমি ওদের ক্ষুদ্র কোমল মুঠিতে চুমা খেলাম—ওদের জীবনে এই প্রথম পুরুষস্পর্শ। আমি আর্মেলিনাকে অনুনয় করলাম, বিনিময় একটি চুম্বন—কিন্তু গভীর লজ্জায় আর্মেলিনার চোখের ঘন পল্লবগুলি ধীরে ধীরে নত হোয়ে এলো, রঙের ছোপ ধরলো মোমের মত সাদা গালে ; নীরবে বসে রইলো আমার কাতর অনুরোধে কোনো সাড়া না দিয়েই।

প্রিন্সেস আর কার্ডিন্যাল ভ্য বার্ণাসের কাছে আমার এই ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী খুব সরস করে বললাম—খুব উপভোগ করলেন দুজনেই। এমন কি কার্ডিনাল প্রস্তাব করলেন, একদিন ওঁরা সকলেই একসঙ্গে আশ্রম পরিদর্শনে যাবেন। সেখানে প্রিন্সেস আর্মেলিনার সঙ্গে পরিচিত হবার পর সহজেই ওকে মাঝে মাঝে বাইরে নিয়ে আসবার অনুমতি যোগাড় করতে পারবেন। প্রস্তাবটা চমৎকার সন্দেহ নেই। আমি ঠিকই বুঝেছিলাম, এর মধ্য দিয়ে কার্ডিন্যাল নিজের কৌতূহল চরিতার্থ করতে চান—আর্মেলিনা সম্বন্ধে। কিন্তু তাইতে আমার ঘাবড়াবার কিছু ছিল না।

আমাদের আশ্রম পরিদর্শনে যাবার কথাটা সারা আশ্রমে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়লো আর সঙ্গে সঙ্গে বাঁধ-ভাঙ্গা উত্তেজনায় মেতে উঠলো সবাই। ওদের জীবনে এই প্রথম একটা নতুন কিছু ঘটছে—এই প্রথম বাইরের দুনিয়াটা থেকে এক ঝলক আলো এসে ঢুকছে কত দিনের জমাটবাঁধা একঘেয়ে অন্ধকারের ভিতর। কচিৎ, কদাচিৎ এক-আধজন ডাক্তার বা পুরোহিত ছাড়া এই বিরাট বন্দিশালায় কে কবে এসেছে ?

সমস্ত আশ্রমটি ঘুরে ঘুরে দেখার পর সমস্ত আশ্রমবাসিনীদের ডাকা হোলো লম্বা দালানটায়। সেখানে অত সুন্দরীদের ভিড়ের

মধ্যেও কার্ডিন্যাল এক মুহূর্তেই চিনে নিলেন আর্মেলিনাকে। সত্যিই আর্মেলিনার রূপের আলোয় আর সবাইকেই নিষ্প্রভ লাগছিলো। প্রিন্সেস অবধি মুগ্ধ ওর রূপে—এগিয়ে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন আর্মেলিনাকে। তারপর এমিলিয়ার হাত দুটি ধরে বললেন—তোমার মুখখানি অত ম্লান কেন? তোমার বিষাদের কারণ আমি বুঝেছি, কিছু ভেব না, তুমি এমন সুন্দরী আর এমন লক্ষ্মী মেয়ে, আমি খুঁজে দেবো তোমায় মনের মত সঙ্গী, তোমার যোগ্য স্বামী, যে তোমাকে হাসিতে ভরিয়ে তুলতে পারবে—

'মাদার সুপিরিয়রে'র মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠলো আর বৃদ্ধা কুমারীদের মুখে নামলো আষাঢ়ের ঘন মেঘ!

এর কয়েক দিন পরেই কার্ডিন্যালের অনুমতি নিয়ে প্রিন্সেস ওদের কয়েক জনকে নিজের প্রাসাদে সারাদিন কাটাবার জন্যে আর থিয়েটার দেখানোর জন্যে নিমন্ত্রণ করে আনলেন। ওঁর নিজের চাপরাশ-আঁটা দরওয়ান, আর গাড়ী গেল ওদের আনতে। আমরা সবাই প্রাসাদে উপস্থিত ছিলাম। ওরা এলো। ভয়ে, লজ্জায়, নতুন পরিবেশে ওরা তটস্থ; লজ্জায় জড়োসড়ো। সবাই ওদের সঙ্গে খুব দরদ ভরা মিষ্টি ব্যবহার করলেন, উৎসাহ দিতে লাগলেন, যাতে ওরা সহজ হোয়ে উঠে সহজভাবে মন খুলে কথা বলতে পারে, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! জীবনের প্রথম এই জাঁকজমকভরা বিরাট প্রাসাদ দেখে—চারপাশে এত সব বিখ্যাত সম্ভ্রান্ত লোক দেখে ওরা আরও তটস্থ হোয়ে রইলো, পাছে কিছু বোকামি প্রকাশ পায় ওদের হাবে-ভাবে কি কথাবার্তায়! রাত্রে থিয়েটার দেখার পর আমি ওদের পৌছে দেবার ভার নিলাম। এই মুহূর্তটির আশা করেছিলাম বৈকি! কিন্তু সুযোগ নেবার সুরুতেই বাধা। একটি

চুম্বনের প্রত্যাশায় লোলুপ হয়ে উঠতেই ধাক্কা খেলাম—অন্ধকারে কোমল ক্ষুদ্র মুঠিটি নিজের হাতে টানতে গিয়ে অনুভব করলাম সজোরে ছিনিয়ে নেওয়া হোলো হাতখানি—অনুযোগের উত্তরে শুনলাম, আমার ব্যবহার অতি অশোভন। ভয় দেখালাম আর কখনো যাবো না ওদের কাছে—কেউই সে কথা মানলো না।

আট দিন চলে গেলো—একটি বারের জন্যেও আর আশ্রমে যাইনি দেখিনি ওই সব মনোহারিণী ধর্মভীরু সন্ন্যাসিনীদের। আট দিন পর 'মাদাম স্থপিরয়রে'র কাছ থেকে একট চিঠি পেলাম, আমাকে দেখা করতে যেতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি যেতে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন কেন হঠাৎ যাওয়া বন্ধ করেছি।

—আমি আর্মেলিনাকে ভলোবেসেছি তাই—

—আপনার উপর করুণা হচ্ছে। কিন্তু আমার মনে হয় ওকে ত্যাগ করার এটা কারণ নয়, তা ছাড়া দেখছেন না বেচারার নামে কত কিছু রটতে পারে—সকলে বলবে আপনার ভালোবাসাটা শুধু নিজের একটা খেয়াল চরিতার্থ করা। এখন খেয়াল মিটেছে, তাই ওকে ত্যাগ করলেন—

—বেশ, আমি কাল প্রাতরাশের সময়তেই এখানে আসছি। আর তারপর আপনি যদি অনুমতি দেন ওদের দুজনকে অপেরা দেখতে নিয়ে যাবো। কিন্তু আপনি আর্মেলিনাকে জানিয়ে রাখবেন যে, শুধু আপনার পরামর্শ যুক্তিযুক্ত মনে করি বলেই আসছি আবার—

পরদিন সকালে যখন গেলাম তখন প্রথমেই এলো এমিলিয়া। এসেই আমাকে তিরস্কার করলো, আমার ব্যবহার নাকি অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মতো হয়েছে—যাকে একটুও ভালো লাগে তার উপর এমন ব্যবহার নাকি কোন মানুষই করতে পারে না। বিশেষ করে

আর্মেলিনাকে আমি ভালোবাসি, একথা 'মাদার সুপিরিয়রে'র কাছে বলা নাকি অত্যন্ত অন্যায় হোয়েছে, আপনার সঙ্গে দেখা হোয়ে অবধি ছেলেমানুষ বেচারার কি কষ্টে যে দিন কাটছে !

—কেন ? কেন বলো তো ?

—কারণ ওর দৃঢ় ধারণা, আপনি ওকে ওর কর্তব্য থেকে চ্যুত করেছেন, ওর নিষ্ঠা নষ্ট করতে চাইছেন।

—তার জন্যেই তো ওর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে চাইছিলাম। তুমি কি ভাবো এতে আমার কিছু এসে-যায় না ? আমার মনের শান্তিও নির্ভর করে ওকে একবার দেখতে পাওয়ায়—অবশ্য যদি ওর আমার প্রতি সমান আগ্রহ থেকে থাকে, তবে কিছুই হবে না—সবই ঠিক থাকবে।

—আমাদের যে কিছু কর্তব্য আছে—আর সে সবে তো আপনার কোনো বিশ্বাস নেই।

—বেশ তো, কর্তব্যনিষ্ঠ হয়েই থাক তোমরা। শুধু একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে মিথ্যে অভিযুক্ত করো না—যে তোমাদের কাছ থেকে দূরে সরে থেকেই তোমাদের কর্তব্যের প্রতি তার শ্রদ্ধা জানায়।

আর্মেলিনা ঘরে ঢুকতেই ওর পরিবর্তন আমার চোখে পড়লো। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার চেহারা এত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কেন ? মুখেও হাসি নেই ?

—আপনার কাছ থেকে যে কি গভীর দুঃখ পেয়েছি, তা' আপনি জানেন না।

—বেশ, একটু মন ঠাণ্ডা করে বোসো--যে আঘাত দিয়েছি, তার বেদনা যথাসাধ্য দূর করার চেষ্টা করবো—আমাকে চিরকাল তোমার

বন্ধু বলে জেনো আর যতদিন আমি রোমে থাকবো, সপ্তাহে একবার অন্ততঃ তোমার কাছে আসবোই—

—সপ্তাহে একবার! আপনি যে রোজ আসতেন?

—তোমার সঙ্গে কম দেখা হওয়াই ভালো আমার পক্ষে, তাইতে এই অশান্ত মনটাকে সংযত রাখতে পারবো—

—ভাবতেও কষ্ট হয় আমি যেমন ভালোবাসি, আপনি সে-রকম বাসতে পারেন না।

—মানে, মনের সমস্ত আবেগ আর উত্তেজনা বর্জন করে তো?

—তা' বলিনি, তবে আমি তো পারি নিজেকে সংযত করতে, যখনি আমার আদর্শের সঙ্গে, কর্তব্যের সঙ্গে সমতা না রেখে মনটা চঞ্চল হোয়ে ওঠে তখনি।

—তোমার বয়সে সম্ভব কিন্তু আমার বয়সে নতুন করে শেখা অসম্ভব, আর সত্যি বলতে কি, শিখতে চাইও না। সত্যি কথা বলবে, এই জোর করে মনকে সংযত করতে একটুও কষ্ট হয় না?

—আপনার সংস্পর্শে যে অনুভূতি জাগে, তাকে দমন করতে দুঃখ হয়। আমার ইচ্ছে হয়, আপনি যদি স্বয়ং পোপ হতেন, আপনি যদি আমার বাবা হোতেন, এমন কি আপনি যদি আমার মত আর একটি মেয়ে হোতেন, তাহলে তো আমরা সারা দিনই একত্রে থাকতে পারতাম, আদর্শে, কর্তব্যে কোথাও ত্রুটি ঘটতো না।

ওর এই সরলতাভরা ছলনা এত স্বাভাবিক অথচ এত অদ্ভুত যে, শুনতে শুনতে আমি না হেসে থাকতে পারলাম না।

অপেরা দেখে রাস্তার ধারে ছোট্টো একটা রেস্তোরাঁতে ঢুকে পড়লাম ওদের নিয়ে। সেখানে পরিচারিকাটি এসে জিজ্ঞাসা করলে অয়ষ্টার (ঝিনুক) খাবো কি না। ওদের মুখে দেখলাম, গভীর আগ্রহ

অয়ষ্টার কেমন খেতে না জানি, ইচ্ছা করেই ওদের সামনে দামটা জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি জানালে, একশোর দাম পঞ্চাশ পাওলী (ইতালীয় মুদ্রা)-র কম নয়। একশোটার অর্ডার দিলাম। যখন আর্মেলিনা বুঝলো যে, অয়ষ্টার খেতে পাঁচটি রোমান ক্রাউন খরচ হবে তখন আপত্তি জানালো প্রবল ভাবে। কিন্তু গভীর খুশীতে ঝিকমিকিয়ে উঠলো ওর চোখ দুটি। যখন আমি বললাম, ওর কাছে কোনো কিছুই আমার খুব দামী কি ভালো মনেই হয় না। তারপর প্রায় আধ ডজন শেষ করে ওর সঙ্গিনীর দিকে চেয়ে বললে, এমন সুন্দর জিনিস খাওয়া নিশ্চয়ই পাপ। এমিলিয়া উত্তর দিলে, জিনিসগুলি এত চমৎকার বলে নয়, আসলে প্রতি গ্রাসে এক পাওলী (মুদ্রা) করে গলাধঃকরণ করাটাই বোধহয় আসল পাপ—

—এঁ্যা সত্যি? অথচ আমাদের পরমারাধ্য পোপ বন্ধ করেন না এ-সব খাওয়া? এতেও যদি পেটুক হবার পাপ না হয় তো আর কিসে হবে? আমি যদিও খেয়েছি কিন্তু স্বীকারোক্তির সময় নিশ্চয়ই বলবো বৈকি, পেটুকের মত খেয়ে পাপ করেছি—

বেশ কাটলো সে সন্ধ্যাটা খাওয়াতে, হাসিতে গল্পেতে—মুছে গেলো মনের কোণের মেঘটুকু।

কিছুদিন পরে এমিলিয়ার পাণিপ্রার্থী হোয়ে একজন ব্যবসায়ী এলো। কিন্তু সে বেচারার মাত্র চার শ' ক্রাউন দেবার ক্ষমতা অথচ আশ্রম থেকে ছ'শো ক্রাউন দাবী করা হোলো। দেখলাম এমিলিয়ার সমস্ত ভবিষ্যৎ-সুখ নির্ভর করে ওর সার্থক পরিণয়ে; আর সেদিক থেকে ব্যবসায়ী লোকটি সব রকমেই বাঞ্ছনীয়, তাই আমিই বাকী টাকাটা দিয়ে দিলাম। আট দিনের মধ্যেই শুভ পরিণয় সমাপ্ত। এমিলিয়া

চলে গেলো তার স্বামীর ঘরে। সেই সপ্তাহেই মেনিকোচ্চিও ওর প্রেমিকাকে বিয়ে করে রোমেতে স্থায়ী সংসার পাতলে।

'মাদার সুপিরিয়র' আর একটি ভারী চমৎকার মেয়েকে আর্মেলিনার সঙ্গিনী করে দিলেন। মেয়েটি আর্মেলিনার চেয়ে মাত্র তিন-চার বছরের বড়ো আর অপরূপ রূপসী—না, আমার ছোট্টো বান্ধবীটির মত নয় অবশ্য। ওর নাম স্কোলাস্তিকা। কি জানি কেন, স্কোলাস্তিকাকে আমার খুব একটা ভালো লাগেনি। স্কোলাস্তিকা কখনো থিয়েটার দেখেনি—কিন্তু আর্মেলিনা এবার রীতিমত আবদার ধরলো বলনাচে যাবে। এটা আরও কঠিন ব্যাপার! যাই হোক আমি বললাম, ওরা যদি পুরুষের সাজে যেতে পারে তবেই নিয়ে যাবো। অবশ্য জামা-কাপড় সব আমি এনে দেবো। এত বড় একটা নতুনত্বের প্রস্তাবে দুজনেই রাজী। হোটেলে একটা ঘর ঠিক করে রাখলাম, জামা-কাপড় সেখানেই পাঠিয়ে সব বন্দোবস্ত করে রাখলাম। ঘরটিতে বেশ আগুনের ব্যবস্থাও ছিলো। আমি বললাম ওরা একা থাকতে চায় তো আমি ঠাণ্ডা সত্ত্বেও পাশের কামরায় যাচ্ছি। স্কোলাস্তিকা বলে উঠলো—

—দেখছি আমিই আপনাদের দুজনার মধ্যে বাধা। স্পষ্ট বোঝা যায় আপনারা দুজনে দুজনকে ভালোবাসেন—আমি তো শিশু নই—

—ঠিকই বলেছো স্কোলাস্তিকা, আমি আর্মেলিনাকে ভালোবাসি বটে কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসে না। আর আমাকে দুঃখ দেবার হাজার ফন্দী খোঁজে, এই বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

মিনিট পনেরো যেতে না যেতেই দরজায় টোকা পড়লো। আর্মেলিনা এসে বললে আমার সাহায্য ছাড়া পোষাক পরা অসম্ভব। তা ছাড়া জুতাজোড়া পায়ে ভীষণ আঁট হোচ্ছে। আমার গম্ভীর ক্ষুব্ধ

মুখ দেখে আর্মেলিনা হঠাৎ ছুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে অজস্র চুম্বনে আমাকে আচ্ছন্ন করে দিলে—উড়ে গেল মনের আকাশের কালো মেঘ, উচ্ছল হাসিতে লুটিয়ে পড়লো স্কোলাস্তিকা।

ঠিক বলেছি কি না, আমিই হোলাম ছুজনার ভালোবাসার পথে অন্তরায়। কিন্তু আমার উপর যদি আস্থা না রাখেন তবে আমি কাল যাবো না আপনাদের সঙ্গে অপেরা দেখতে—

এবার আর্মেলিনার আগ্রহাতিশয্যে স্কোলাস্তিকাকে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে একটি চুম্বন করলাম। ব্যস, শান্তি। আর্মেলিনা খুশিতে উচ্ছ্বসিত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই নিখুঁত ছুইটি যুবার সজ্জায় সজ্জিত ছুই বান্ধবীকে নিয়ে হাজির হলাম বলনাচের আসরে।

বলনাচের আসরে যে ভয় একেবারেই করিনি, শেষ অবধি তাই হোলো। একটা ছোটো সাধারণ নাচের আসর—ছোটোখাটো ব্যবসায়ী সমাজের অনুষ্ঠান। পরিচিত কাউকে আশা করিনি। কিন্তু একজন পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হোয়ে গেলো। সপরিবারে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গের সঙ্গী ছুটিকে বিশেষ করে অভিনন্দন জানালেন। বেচারারা এরকম পরিস্থিতিতে একেবারে নতুন, নিঃশব্দে পুতুলের মত দাঁড়িয়ে রইলো। কিন্তু কথা বলতে বলতে লক্ষ্য করলাম, একটি দীর্ঘাঙ্গী তরুণী আর্মেলিনার কাছে এগিয়ে এসে নাচের আমন্ত্রণ জানালে। আমি লক্ষ্য করলাম তরুণীটি আর কেউ নয়, ফ্লোরেন্সের একটি তরুণ। প্রথম দিন থিয়েটারে আমার বক্সে একটা চিঠি এনে বার বার সতৃষ্ণ নয়নে আর্মেলিনার দিকে তাকাচ্ছিল। আজ তরুণীর পরিচ্ছদে অপরূপ সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। আর্মেলিনা ওঁর স্বভাব-সরলতায় বললে, কোথায় যেন ওকে দেখেছি মনে হচ্ছে।

—আপনি ভুল করছেন, তবে আমার একটি ভাই আছে অবিকল আমার মত দেখতে—আর আপনারও বোধহয় একটি অবিকল আপনার মত সুন্দরী বোন আছে—একেবারে আপনার প্রতিচ্ছবি—তাঁর সঙ্গে একটা থিয়েটারে আমার ভাই-এর পরিচয় হোয়েছিল।

ওর কথায় আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আর্মেলিনা নাচতে চাইলো না—সবাই বসে বসে গল্প করতে লাগলাম। আমার বন্ধুর সঙ্গে কথা বলাই আমার কর্তব্য—আর আর্মেলিনা সেই ফ্লোরেন্সের তরুণীটির সঙ্গে কথা বলছিল দেখে সেদিকে আমার নজর না দেওয়াই উচিত—কিন্তু আমার প্রকৃতিটাই অত্যন্ত হিংসুক ধরনের। ওদের ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখে রাগে আর হিংসায় আমার সমস্ত মন জ্বলতে লাগলো। তার উপর স্কোলাস্তিকাও ওঠে পড়ে ঘরের অন্য প্রান্তে একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে গেলো।

একটু পরেই আমি এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। দেখি, একটি নিভৃত কোণে দুজনে মগ্ন আলাপ-আলোচনায়। আমাকে দেখেই স্কোলাস্তিকা এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে পরিচয় করিয়ে দিলে সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে—জানালে এঁর কথাই আমাকে ও আগে বলেছে, ইনি ওর পাণিপ্রার্থী। আমি যতদূর সম্ভব সংযত, বিনীতভাবে ভদ্রতা বজায় রাখলাম। বেশীক্ষণ সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না—আর্মেলিনাকে ওই ফ্লোরেন্সের তরুণীটির সঙ্গে দেখার পর থেকে মনের জ্বালায় ওদের কাছ থেকে বেশী দূরে থাকতে পারছিলাম না। ফিরে এসে অবাক হোয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যে আর্মেলিনা ওই তরুণটির সঙ্গে রীতিমত নাচতে সুরু করেছে—সব চেয়ে আশ্চর্য, তরুণটির প্রতিটি পদক্ষেপ এমন তন্ময়তার সঙ্গে অনুসরণ করে যাচ্ছে যে এতটুকু আড়ষ্টতা নেই ওর সহজ সাবলীল নৃত্যছন্দে।

সবাই প্রশংসায় মুখর হোয়ে উঠলো। নাচের শেষে আমি অত্যন্ত কষ্টার্জিত ভদ্রতার সঙ্গে হাসতে হাসতে সস্নেহ স্বরে বললাম আর্মেলিনাকে, তুমি জানো তো সাড়ে বারোটার মধ্যেই তোমার বাড়ি পৌঁছানো চাই।

—তা বটে, তবুও আপনিই তো আমাদের প্রভু এখন।

—না, শপথ ভঙ্গ করে প্রভুত্বের দায়িত্ব নিতে পারি না—গম্ভীর ভাবে বললাম—তবে তুমি যদি জোর কর তাহলে আমি আরও অপেক্ষা করতে বাধ্য।

স্কোলাস্তিকার কাছে যেতেই ও উঠে পড়লো সঙ্গীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে। রাত্রি বারোটার মধ্যে ফিরবার জন্যে ও প্রস্তুত সে কথাও জানালো। অতএব সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা চলে এলাম আমাদের হোটেলে। পথে একটি কথাও হোলো না। কিন্তু হোটেলে খেতে বসে স্কোলাস্তিকা আর্মেলিনাকে অত্যন্ত তিরস্কার করতে লাগলো—ওর ব্যবহারের জন্যই আমাকে পার্টির শেষের দিকে অমন রূঢ় হোয়ে উঠতে হোয়েছিলো বলে। ওর জন্যেই আমার পক্ষে আশ্রমের নিয়ম রক্ষাও সম্ভব হোয়ে উঠছিল বলে। বুঝলাম না ঠিক এটা আমার উপরই প্রতিশোধ নিচ্ছিলো কি না আমার কিশোরী প্রিয়াকে লাঞ্ছিত করে। আর্মেলিনার দুইটি কপোল বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতেই লাগলো—প্রচুর উপাদেয় আহার্য সত্ত্বেও কিছুই খেতে পারলে না—বিষণ্ণ বিমর্ষ মুখে বসে বসে শুনলে—স্কোলাস্তিকা সহর্ষ উচ্ছ্বাসে দিতে লাগলো তার ভাবী স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্ণ বিবরণ—আর আমার দুটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আর বহুদর্শী মন আবিষ্কার করলে ওই দুটি বিষাদভরা ঘন কালো আঁখিপল্লবের গোপন ভাষা—আমার কিশোরী প্রিয়ার হৃদয়খানি মুগ্ধ—সেই ফ্লোরেন্সের তরুণের

অপরূপ দেহকান্তিতে—ওই নিবিড় কালো চোখের গভীর দৃষ্টি স্বপ্ন রচনা করছে—প্রিয় মিলনের স্বপ্ন—কামনা করছে—ওর দুটি শুভ্র কোমল পাণির প্রার্থী হয়ে আসুক ফ্লোরেন্সের সেই তরুণ—ওর সারা সন্ধ্যার নৃত্যসঙ্গী সেই রূপকুমার—

এ কোন খেলা সুরু করেছি—কি হোলো আমার জয় না পরাজয় এই কথা ভাবতে ভাবতে সেই রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ভোরের আলোয় ঘুম ভেঙে প্রথমেই মনে হোলো উত্তর পেয়েছি—

—[এই অসমাপ্ত অংশটি থেকে পরের আরও দুটি অধ্যায় ক্যাসানোভার পাণ্ডুলিপি থেকে লুপ্ত। এর সঠিক কারণ আজও জানা যায়নি। ক্যাসানোভার পরিণতি এই কাহিনীতে কোথায় দাঁড়াবে 'স্মৃতিকথা'র অভিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকার কাছে তা' সহজেই অনুমেয়। অবশ্য সবই অনুমান। লুপ্ত অধ্যায়গুলির পর ক্যাসানোভাকে দেখা যায় ফ্লোরেন্সে। কেন হঠাৎ রোম ছেড়ে ফ্লোরেন্সে গেল—স্ব-ইচ্ছায় না আরও কোনো ঘটনাস্রোতে বাধ্য হোয়ে—কিছুই জানা যায় না—আর জানা যায় না ফ্লোরেন্সের সেই তরুণটির সঙ্গে আর্মেলিনার প্রেমের পরিণতি কোথায় দাঁড়ালো—

অনেকে অনুমান করেন, এই বিচ্ছিন্ন অংশটি ক্যাসানোভা নিজেই নষ্ট করেছিলেন পুনর্লিখনের জন্য—হয়ত অসুস্থতা কিম্বা অন্য কোনো কারণে অসমাপ্ত থেকে যায় ঐ অংশটির সংযোজন। কারণ ১৭৯৮ সাল অবধি দেখা যায়, ক্যাসানোভা তখনও পাণ্ডুলিপিটি শোধন করে চলেছেন।]

উনবিংশ অধ্যায়

(লুপ্ত অধ্যায় দুটির পরবর্তী অধ্যায়ের এই বিচ্ছিন্ন অংশটি)

সবকিছুর বিশদ বিবরণ না দিয়ে শুধু যতদিন খুশী ওঁর রাজ্যে স্বচ্ছন্দে বসবাস করার অনুমতিটুকু চাইলাম। অবশ্য এই নবীন বয়সী ডিউকটির কৌতূহলী প্রশ্ন মেটাতে আমার স্বদেশ থেকে নির্বাসনের কারণটিও জানাতে হোয়েছিলো। তাঁকে আশ্বাসও দিলাম নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার আহার-বাসস্থানের জন্যে কারো কাছেই আমাকে হাত পাততে হবে না—আমার নিজের কিছু টাকাকড়ি আছে—আমি শুধু নিশ্চিন্ত হোয়ে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে যাই।

—যতদিন আপনার আচার-আচরণে কোনো ত্রুটি না ঘটে ততদিন আমার দেশের আইন আর শৃঙ্খলাই আপনাকে রক্ষা করবে, নিশ্চিন্ত থাকুন এ বিষয়ে। যাই হোক, আমার কাছেই প্রথম আসতে আমি সত্যিই ভারী খুসী হোয়েছি। আচ্ছা, আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব ফ্লোরেন্সে নেই?

—বছর দশেক আগে এই ফ্লোরেন্সের প্রত্যেকটি গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গেই আমার পরিচয় ছিলো। কিন্তু এখন আমি সম্পূর্ণ নির্জন ভাবে নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চাই, তাই পুরানো পরিচয় ঝালিয়ে নেবার এতটুকুও উৎসাহ আমার নেই।

যাই হোক, এবার নির্ঝঞ্ঝাটে কিছুদিন কাটানো যাবে ভেবে বেশ ভালো লাগলো। একটি অতি নিরীহ সাধু প্রকৃতির ব্যবসাদারের বাড়িতেই দুখানি ঘর নিয়ে আমার বাসা বাঁধলাম। বাড়িতে শুধু ওই ভদ্রলোকটির কুরূপা স্ত্রীটি ছাড়া আর কেউই ছিল না আমার চিত্ত-

চাঞ্চল্য ঘটাতে। প্রায় সপ্তাহ তিনেক কাটিয়েছিলাম এখানে বাইরের জগতের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে। এমন সময় কাউণ্ট ষ্ট্রাটিকো তাঁর আঠারো বছরের ছাত্র মোরোসিনিকে নিয়ে ফ্লেরেন্সে এসে হাজির। ওঁর পা ভেঙে যাওয়াতে বাইরে বেরোতে পারতেন না, তাই আমাকেই অনুরোধ করলেন মোরোসিনির সঙ্গে সব সময় থাকার, তা' নাহলে কুসঙ্গে মিশে ওর অধঃপতন হোতে পারে।

এতে আমার পড়াশোনারই যে ক্ষতি হোলো তাই শুধু নয়, নির্জন বাসের সব পরিকল্পনাও ভেস্তে গেলো। অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এই বিকৃতরুচি তরুণটির সঙ্গী হোতে হোলো। মোরোসিনির প্রকৃতি ছিলো অদ্ভুত! শিক্ষা, সাহিত্য, সৎসঙ্গ, কিম্বা জ্ঞানী-গুণীর প্রতি ওর এতটুকু আকর্ষণ ছিলো না। শুধু বেছে বেছে দেশের দুর্গম স্থান-গুলিতে ঘোড়ার পিঠে চড়ে ছুটতো নিজের প্রাণ-সংশয় করে, আর প্রচুর মদ খেতো যতক্ষণ না বেহুঁস মাতাল হোয়ে পড়তো ; তাইতেই শেষ নয়, অতি নীচুস্তরের মেয়েদের নিয়ে কুৎসিততম সম্ভোগ ছিলো ওঁর প্রাত্যহিক আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ।

দুটি মাস ও ফ্লোরেন্সে ছিলো, তাব মধ্যে বিশ বার ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি আমি। কি ঘৃণাই করতাম ওর সঙ্গকে—শুধু কর্তব্যবোধে ওকে ত্যাগ করতে পারি নি।

আর একটি বন্ধু জুটেছিলো আমার এই সময়—জানোভিচ্। সুন্দর কান্তি, অটুট স্বাস্থ্য, সহজ প্রাণের আনন্দে ভরপুর। ওকে দেখে মনে হোতো, ওঁর মধ্যে অনেক কিছু সম্ভাবনা আছে, অনুকূল পরিবেশে ও অনেক উন্নতি করতে পারে। ওকে দেখে আরও মনে পড়তো, পনেরো বছর আগেকার যুবক ক্যাসানোভাকে। কিন্তু ওর মধ্যেও বেশভূষা ইত্যাদির ভিতর দিয়ে ওর প্রচণ্ড অমিতব্যয়িতা

দেখে ভয় হোতো, কোনো দিন এমন কোনো ভুল করে বসবে, যা আমার ভাগ্যেও ঘটেছিলো। জানোভিচের বাড়িতে আর একজনের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, তার নাম 'জেন'। অবশ্য এরা কেউই আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল না, এমনি মাঝে মাঝে দেখা-সাক্ষাৎ হোতো শুধু।

লর্ড লিঙ্কন, বয়স বিশ বছরও পার হয়নি, ডিউক অফ্ নিউকাস্‌ল-এর একমাত্র সন্তান, এ সময় ফ্লোরেন্সে ছিলো। বিখ্যাত নর্তকী লা লাম্বার্তির প্রেমে সে বেচারা একেবারে হাবুডুবু খাচ্ছিল। প্রতিদিন অপেরার শেষে গিয়ে লা লাম্বার্তির সঙ্গে দেখা করতো কিন্তু ওর বাড়ি অবধি সঙ্গে যেতে বেচারার সাহসে কুলাত না। অবশ্য গেলে অভ্যর্থনা ভালোই জুটতো কপালে। কারণ একে ইংরেজ অর্থাৎ ধরেই নেওয়া যায় মস্ত ধনী, তার উপর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ !

জানোভিচ রীতিমত ঝানু, গোড়া থেকেই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। তারপর নিজেই লা লাম্বার্তির সঙ্গে পরিচয় পাকা করে নিয়ে লিঙ্কনকে ওর বাড়িতে নিয়ে যেতে লাগলো। লা লাম্বার্তিও এই চক্রান্তে ছিলো, তাই তরুণ ইংরেজ-তনয়টিকে প্রেমের অভিনয়ে মুগ্ধ করে জালে ফেলতে একটুও দেরী করেনি। আত্মহারা, প্রেমমুগ্ধ লিঙ্কন প্রতিদিন রাত্রেই ওর বাড়িতে নৈশভোজনে উপস্থিত থাকতো আর শেষে তাসের জুয়ায় মেতে যেতো লাম্বার্তি, জানোভিচ্ আর জেনের সঙ্গে। প্রথম প্রথম ওরা ওকে কয়েক শ' মুদ্রা জিতিয়ে দিয়ে খেলার নেশাটা জাগিয়ে দেয়। বেচারী লিঙ্কন তখন ওদের হাতের পুতুল—তারপর থেকেই ওদের চাতুরির জালে ও ধরা পড়লো। প্রতি রাত্রে বাজী হেরে সর্বস্বান্ত হোতে চললো লিঙ্কন। শেষ অবধি জেনের কাছেই ওর ঋণ দাঁড়ালো বারো হাজার গিনি। তার মধ্যে তিন হাজার মাত্র শোধ করতে পেরেছিলো, বাকী তিনটি

বিলেও ওই টাকার অঙ্ক সই করে লণ্ডনের ব্যাঙ্কে ওকে পাঠাতে হয় টাকা তুলতে। এ-সব গল্প আমি লিঙ্কনের মুখেই শুনেছিলাম, যখন 'বোলোনা'তে আমার সঙ্গে ওর দেখা হয় তখন।

সারা ফ্লোরেন্সে তখন সবার মুখেই এই কথা। বাঙ্কার তাসোতাসি জানোভিচকে লিঙ্কনের নির্দেশমত ছয় হাজার গিনি তখন দিয়েছে। এমন সময় আমার অবস্থাটা একবার ভাবো, হঠাৎ একজন অপরিচিত লোক এসে সোজা আমার ঘরে ঢুকে আমার নাম জিজ্ঞাসা করে নিয়ে জানালে, ডিউকের আদেশ, তিন দিনের মধ্যে আমাকে ফ্লোরেন্স ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তারিখটা ছিলো আটাশে ডিসেম্বর। ঠিক তিন বছর আগে এই একই তারিখে আমাকে বার্সিলোনা ছেড়ে চলে যাবার আদেশ এসেছিলো। অদৃষ্টের কি নিষ্ঠুর পরিহাস। স্তম্ভিত হোয়ে বসে থাকা ছাড়া সে মুহূর্তে কিছু করবার রইলো না। বার বার প্রশ্ন করেও কোনো কারণই জানতে পারলাম না এই আকস্মিক আদেশের। শুধু জানলাম এটা রাজার নির্দেশ, আমাকে এটা মানতেই হবে। বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, অপমানিত হৃদয়ে মেনে নিতে বাধ্য হলাম।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দের শেষ তারিখটিতে এসে পৌছলাম 'বোলোনা'তে। ভেনিসের একজন অতি সম্ভ্রান্ত পদস্থ ভদ্রলোক সিনর দা জাগুরী আর মঁসিয়ে ব্রাগাদাঁর অভিন্নহৃদয় বন্ধু আর আমারও অকৃত্রিম সুহৃদ সিনর দান্দালোর সঙ্গে আমার রীতিমত পত্রালাপ চলতো। দুজনেই চাইতেন যাতে আমি আবার স্বদেশে ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্ত ভাবে জীবনযাত্রা সুরু করতে পারি। এই সম্বন্ধে আমরা তিন জনেই চিঠিপত্রের ভিতর দিয়ে নানা ধরনের পরামর্শ আর আলোচনা

আমাকে নিয়ে একজন সুন্দর চেহারার ভদ্রলোকের সামনে দাঁড় করিয়ে দিলেন, তিনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমাকে লক্ষ্য করছেন বুঝলাম।

—আমার মন বলছে আপনি নিশ্চয়ই সিনর দা জাগুরী।

আমি বললাম ঠিক ঠিক বলেছো ক্যাসানোভা! আমি যখন দান্দালোর কাছে শুনলাম তুমি এখানে, তখনি এসে তোমাকে অভিনন্দন জানাবো ভেবেছিলাম, তোমার স্বদেশে ফেরার দিন এগিয়ে এলো বলে। এ বছর না হোলেও আসছে বছর তো নিশ্চয়ই—

একজন সুপুরুষ বৃদ্ধ এইবার ঘরে ঢুকে ওই অভিনন্দনে যোগ দিলেন। তারপর পিত্তোনিকে জানালেন, ওর বাড়িতে নৈশ-ভোজনে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে। সেই সঙ্গে এও বললেন যে, আমার সঙ্গে এখনও ওঁর আলাপ হয়নি।

—কী! এই ছোট্টো শহরটায় ক্যাসানোভা দশ দিন ধরে রয়েছে অথচ ভেনিসের রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে এখনও ওর পরিচয় হয়নি। সিনর জাগুরী আশ্চর্য হোয়ে গেলেন।

খুব রহস্যপ্রিয় এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি। আমার সৌভাগ্য, আমি ওঁর বন্ধুত্ব অর্জন করতে পেরেছিলাম—ত্রিয়েস্তিতে দু'টি বছর সে বন্ধুত্ব আমার অনেক কাজে লেগেছে। আর আমি জানি, স্বদেশের শাসন বিভাগের মার্জনা লাভে ওঁর কতখানি হাত আছে, ওঁর কতখানি সহায়তা আছে আমার দেশে ফেরার অনুমতিটুকু পাওয়াতে। সত্যিই আমার জীবনে তখন একমাত্র লক্ষ্য কেমন করে নিজের দেশটিতে ফিরে যাবো এই দীর্ঘ নির্বাসনের শেষে—শুধু সেই আশা নিয়েই বেঁচেছিলাম তখন।

ত্রিয়েস্তিতে বেশ শান্তিতেই দিনগুলি কাটছিলো। অতি অনাড়ম্বর সহজ সরল জীবনযাত্রা যাকে বলে—উপায় কি, মাত্র পনেরোটি সেকুইন মাসে বাঁধা আয় তখন। জুয়াখেলা তো ছেড়েই দিয়েছিলাম, তা ছাড়া নৈশভোজনটাও কোনো না কোনো বন্ধুর বাড়ি সারা হোতো—ভেনিসের রাজপ্রতিনিধি, কি ফ্রান্সের রাজদূত কিম্বা ব্যারণ পিত্তোনি যার বাড়িতেই হোক জুটে যেত ঠিকই। ভেনিসের রাজদূতের সহায়তায় তার মাধ্যমে খানিকটা দেশসেবার সুযোগও জুটে গিয়েছিলো। বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে বেশ খানিকটা সাহায্য করতে পেরেছিলাম—কয়েকটি পুরানো চুক্তির নতুনতর সর্ত আর কয়েকটি নূতন চুক্তির ব্যবস্থা করে দেওয়াতে বেশ মোটারকম লাভ হয়—কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভেনিস রাষ্ট্র থেকে আমি একসঙ্গে একশ ডুকাট পাই আর মাসে দশ সেকুইন করে মাসোহারা। অভাব মিটে গেলো আমার—বেশ স্বাচ্ছন্দ্য এলো জীবনযাত্রায়।

বিংশ অধ্যায়

ত্রিয়েস্তিতে অভিজাত মহিলা সম্প্রদায়ের হঠাৎ প্রচণ্ড সখ হোলো ফরাসী নাটক অভিনয় করার। বেচারী আমাকেই তাঁরা মনোনীত করলেন, নাট্য পরিচালক, সজ্জা পরিচালক, মঞ্চ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ এক কথায় সব কিছুরই ব্যবস্থাপক! শুধু নাটক ঠিক করে দেওয়া নয়, কোন অংশ কে অভিনয় করবেন, তারও ব্যবস্থা করতে হোলো। সত্যিই বিপদে পড়েছিলাম—মহিলাদের অভিনয়ে যে কৌতুক আনন্দ বরাতে জুটবে ভেবেছিলাম তা'তো জুটলো না; শুধু অক্লান্ত পরিশ্রমে বিরক্তিই জাগতে লাগলো।

প্রতিটি অভিনেত্রীই তো আনকোরা, এ বিষয়ে তার উপর সারা দিন প্রত্যেকের কাছে ছুটোছুটি করে প্রত্যেকের নির্দিষ্ট অংশটি মুখস্থ করানো—সে যে কী কষ্টসাধ্য, ঈশ্বর জানেন! একপাতা মুখস্থ করে তো তার আগের পাতাটা ভুলে যায়। সবাই জানে ইতালীতে যদি কোনরকম বিপ্লবের প্রয়োজন হয়, তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন নারী শিক্ষায় বিপ্লব আনার। সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত অভিজাত সম্প্রদায়ও মেয়েদের অল্প কয়েক বছরের জন্যে কনভেণ্টে দিয়েই খালাস। যতক্ষণ না বাপ-মায়ের মনোনীত সুপাত্রের সঙ্গে মালাবদল ঘটছে—যাকে তারা চেনেও নি, জানেও নি, যাদের সম্বন্ধে মনের কোণে এতটুকু ভালোবাসার স্বপ্ন জাগেনি—ব্যস্ বাকী জীবনটাতেও স্বামীর সম্বন্ধে অতি নিরপেক্ষ অতি নিস্পৃহভাবে কাটিয়ে দেয়। বেশীর ভাগ সময়েতেই অবশ্য উভয়পক্ষই এই ভুলের প্রতিকার করে ব্যভিচার আর উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয়ে। ইতালীতে অভিজাত বংশের ধারাবাহিকতা একটা কথার কথায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। সম্ভ্রান্ত উচ্চবংশীয় অভিজাত

সম্প্রদায়ের মধ্যেও খুব কম লোকেই পিতৃপরিচয়ে পরিচিত হবার অধিকার রাখে।

ফরাসী নাটকের জন্য যাঁরা তখন 'গোরিস্'এ এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে কাউন্ট টোরিয়ানির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উনি বার বার আমাকে অনুরোধ জানালেন, গোরিস্ থেকে মাইল ছয়েক দূরে তাঁর একটি পল্লী-নিবাস আছে; সেখানে আমি যেন গিয়ে শরৎকালটা কাটিয়ে আসি।

লোকটির বয়স ত্রিশের বেশী নয়, অবিবাহিত কিন্তু ওর কুৎসিত মুখখানায় নিষ্ঠুরতা, পাশবিকতা, বিশ্বাসঘাতকতা, অহঙ্কার, ঈর্ষা, ঘৃণা আর কামুকতার ছাপ যেন স্পষ্ট করে ফুটে আছে। কিন্তু এমন আন্তরিকতা আর আগ্রহের সঙ্গে আমাকে নিমন্ত্রণ জানালে যে মন একটুও সায় না দিলেও জোর করে ভাবলাম, লোকটাকে দেখে হয়ত ভুল বুঝেছিলাম।

প্রত্যেকের কাছেই শুনলাম ও লোক ভালো—শুধু মেয়েদের সম্বন্ধে ওর অসম্ভব দুর্বলতা আর প্রকাশ্য ঝগড়া বা অপমানে ভীষণ ভাবে প্রতিশোধ নেয়। যাই হোক, আমি ওঁকে কথা দিলাম যে সেপ্টেম্বরের পয়লা তারিখে আমি 'গোরিস্'এ ওর সঙ্গে দেখা করবো তারপর দুজনে একসঙ্গে স্পার্ সাতে ওঁর গ্রামের বাড়িতে যাবো।

'গোরিস'এ ওঁর বাড়ি যখন পৌছলাম শুনলাম উনি বাড়ি নেই। বললাম আমি ওঁরই আমন্ত্রিত অতিথি। তখন আমার জিনিসপত্র লোকজনেরা গাড়ী থেকে নামিয়ে নিলে। জিনিসপত্র রেখে 'গোরিস'এ আমার একটি বন্ধু কাউন্ট টরেসের বাড়িতে দেখা করতে গেলাম—সেখানে মধ্যাহ্ন ভোজন অবধি সেরে ফিরে এলাম যখন তখন শুনলাম টোরিয়ানি স্পার্সাতে চলে গেছেন, কালকের আগে ফিরবে না—

দেখালেন যাতে করে কাউন্ট চেষ্টা করেছেন ওই সব স্বাক্ষরগুলি জাল বলে প্রমাণ করতে। উকিলটি প্রমাণ করলেন কাউন্টের ওই প্রচেষ্টা কতখানি অসম্ভব। তারপর আবেদন করলেন একটি নিরীহ নির্বিবাদী চাষী পরিবারকে ওই সব জোচ্চোরের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্য।

কাউন্টের ব্যারিষ্টার ঝাড়া দু'ঘণ্টার উপরও বক্তৃতা চালাচ্ছিলেন। শেষে বিচারক বাধ্য হয়ে থামিয়ে দিলেন। এমন কোনো অপমান ছিল না যা তিনি প্রতিপক্ষের উপর বর্ষণ করতে কসুর করলেন। এর পরে রায় বেরোবার অপেক্ষায় আমরা সকলেই অন্য একটি হলে গিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম, চাষী-পরিবারটি এক কোণে নিজেরাই চুপচাপ বসেছিলো। ওদের সান্ত্বনার বাণী যোগাতে খোশামোদ করতে বা মিথ্যা স্তোক দিতে কোনো বন্ধু পারিষদ বা মিত্রবেশী শত্রু কিছুই ছিল না। কিন্তু কাউন্টের চারপাশে দশ-বারোজন মিলে সমোল্লাসে চিৎকার করতে লাগলো, যেন তাদের দৃঢ় ধারণা মামলায় তাদের জয় অনিবার্য।

আমি কাউন্ট টরেসের কানে চুপি চুপি বললাম টৌরিয়ানির হেরে যাওয়াই উচিত। অন্ততঃ ওর ব্যারিষ্টারের ওই অশ্লীল অপমানকর বক্তৃতার অপরাধের জন্যেই। ওর কান দুটো কেটে নিয়ে ওকে ছয় মাসের জন্য 'পিলরি'-তে (শাস্তি দেবার কাঠের যন্ত্র। মধ্যে গর্ত করা গলায় বেঁধে রাখার জন্য) বেঁধে রাখা উচিত।

—সেই সঙ্গে ওর মক্কেলকেও—টরেস বেশ জোরেই বলে উঠলো। ঘণ্টাখানেক পরে আদালতের কেরাণী এসে দুই পক্ষকে দুটি কাগজ দিয়ে গেলো। কাউন্ট হো-হো করে হেসে উঠে সেটা চিৎকার করে পড়তে লাগলো। আদালত কাউন্টকেই অভিযুক্ত করেছে

রসিদের স্বাক্ষর অস্বীকার করার জন্য, আর তার শাস্তিস্বরূপ এক বছরের পুরো মাহিনা ওই চাষীটিকে দিতে হবে। আর এই অভিযোগ ছাড়া অন্য কোন অভিযোগ যদি ওই চাষীটির থাকে, তবে তার জন্যে আবার মামলা করার অধিকার চাষীটিকে দেওয়া হোল।

টোরিয়ানির ব্যারিষ্টারের মুখটি চূণ হোয়ে উঠলো। কিন্তু তার মক্কেল তাকে তার প্রাপ্য ছয়টি সেকুইন দিলেন। তারপর সবাই মিলে আদালত থেকে বাড়ি ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে উঠে আমরা স্পার্সাতে গেলাম। পাহাড়ের উপর বাড়িখানি বেশ বড়ই। টোরিয়ানি আমাকে ঘুরে ঘুরে সব দেখিয়ে একতলায় ছোট্টো একখানি ঘরে এসে জানালে, সেটাই আমার জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছে। বিশ্রী কয়েকটা আসবাব, তার উপর আলো-বাতাসও খেলে না বললেই হয়। টোরিয়ানি বললে, এই ঘরখানা আমার বাবার সবচেয়ে প্রিয় ঘর ছিলো, তিনিও আপনার মত পড়াশোনা ভালোবাসতেন। এখানে সম্পূর্ণ ইচ্ছামত আপন খুশীমত কাটান, কেউ আপনার কাছে আসবে না।

অনেক বেলায় খাওয়া হলো। মধ্যাহ্ন ভোজন তো বাদই গেলো। সবচেয়ে বিশ্রী লাগলো টোরিয়ানি অসম্ভব তাড়াতাড়ি খেতে সুরু করে দু' মিনিটেই খাওয়া শেষ করে আমাকে বললে, আমি নাকি ভীষণ দেরী করে খাই। খাবার পর বিদায় নিয়ে জানিয়ে গেলো পরদিন দেখা হবে। আমিও আমার ঘরে চলে এলাম জিনিসপত্র ঠিক করতে। আমি সে সময় পোলাণ্ডের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড লিখতে ব্যস্ত ছিলাম। রাত্রি অন্ধকার হোয়ে আসতে আমি একটা আলো আনতে বললাম। কিছু পরে একটি ভৃত্য এসে হাজির একটা চর্বির বাতি নিয়ে। ভারী বিশ্রী লাগলো—একটা মোমবাতি কিংবা একটা

টিকে আছে। কিন্তু না, চলে যাওয়ার কথা মন থেকে তাড়ালাম। অন্যায় করবো না, কোনো অন্যায় করতে চাই না আর।

পরদিন সকালে একজন চাকর একটা কাপে করে নিজের রুচিমত চিনি, দুধ মিশিয়ে একেবারে তৈরী করা ঠাণ্ডা জলো কফি এনে দিলে। আমি ছুঁলামও না। শুধু হাসতে হাসতে বললাম, আমার ওই কফিটা ওর মুখেই ছুঁড়ে ফেলার ইচ্ছা ছিলো—এই ভাবে কেউ কোথাও কফি দেয় না, দিতে হয় না।

চুল কাটবার সময় জিজ্ঞাসা করলাম চাকরটাকে, মোমবাতির বদলে আমাকে চর্বির বাতি দিয়েছিলো কেন?

—আজ্ঞে কি করবো বলুন, আমাকে যা দেওয়া হয়েছিলো তাই দিয়েছি। চর্বির বাতিটা আপনাকে দেবার জন্যে আর মোমবাতিটা আমাদের মনিবের জন্যে দেওয়া হয়েছিলো।

আগের দিন বাড়ির পুরোহিতের সঙ্গে খাবার টেবিলে আলাপ হোয়েছিলো। শুনেছিলাম, এ বাড়ির সব কিছু কেনাকাটার ভারও তার উপর। সোজা তাঁর কাছে গিয়ে কিছু মোমবাতি কিনে দাম দিয়ে দিলাম হাতে হাতে। তিনি বললেন, মনিবকেও একথা জানাবেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, একটার সময় খেতে যেতে হবে। সেই শুনে ঠিক সাড়ে বারোটার পরই খাবার ঘরে গিয়ে হাজির। কিন্তু আশ্চর্য যে, টোরিয়ানির তখন অর্ধেক খাওয়া শেষ। কোনো মতে নিজেকে সংযত করে বললাম, পুরোহিত আমাকে একটার সময় আসতে বলেছিলেন।

—সাধারণতঃ তাই হয়, তবে আজ আমাকে কয়েকটি জায়গায় যেতে হবে তাই বারোটায় খাবার দিতে বলেছিলাম, নির্বিকার ভাবে টোরিয়ানি বলে গেলো। তারপর চাকরদের ডেকে বলে দিলে,

যে সব খাবার আগে দেওয়া হোয়ে গেছে, সেগুলি আবার নিয়ে আসতে। বারণ করলাম। যা তখনো টেবিলে অবশিষ্ট ছিলো, তাই দিয়েই খাওয়া শেষ করলাম।

পরদিন পুরোহিত নিজে এসে হাজির, মোমবাতির দাম ফিরিয়ে দিতে। মনিবের নাকি হুকুম হোয়েছে, এ বাড়িতে আমাকে সব বিষয়ে ওঁর মতই মানতে হবে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ একটু পরেই চাকর এসে হাজির, ট্রে-তে করে গরম কফি, আলাদা জাগে দুধ, চিনি ইত্যাদি সমেত। দরজায় নতুন তালা ঝুললো। বেশ পরিবর্তনে সাহায্যেব জন্য চাকরও এলো—গোটা আবহাওয়াই যেন হঠাৎ বদলে গেলো।

মনে মনে ভাবলাম, তাহলে আমি বেশ ভালো শিক্ষাই দিয়েছি। কিন্তু ভুল ভাঙলো। সপ্তাহ না কাটতেই কাউন্ট একদিন আমাকে কিছু না জানিয়েই 'গোরিস'এ চলে গেলেন। পূরো দশটি দিন কাটিয়ে যেদিন ফিরলেন আমি সেদিন বললাম যে, আমার সঙ্গলাভের জন্যই আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করা হোয়েছে, কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে আমার সঙ্গ এতই অপ্রীতিকর, তখন আমি ত্রিয়েস্তেই ফিরে যাবো— এই নির্জন বিষণ্ণ পুরীতে একা-একা দিন কাটানোর যন্ত্রণায় ভুগতে চাই না আর। টোরিয়ানি এই শুনে অজস্র কাকুতি-মিনতিতে ভেঙে পড়লো। বার বার আশ্বাস দিলে আর কখনও এমন হবে না। ওর অনুরোধ এড়াতে পারলাম না, থেকেই যেতে হোলো।

কি একঘেয়ে নীরস বিবর্ণ দিন কাটছিলো স্পার্সায়। ওর একটা বিরাট আঙুরক্ষেত ছিলো, সেই আঙুরক্ষেতের চাষীদের উপর দিনের পর দিন অত্যাচার আর হাম্‌লা চালিয়ে যেত অক্লান্ত ভাবে। দেখে দেখে সমস্ত মনটা ওর উপর বিরূপ হোয়ে উঠছিলো; শেষে

তারপর দুপুর পর্যন্ত উনি আমার সঙ্গে রইলেন, আর সারাক্ষণ বোঝাতে চাইলেন যে অন্যায়টা আমার। কারণ উনি যদি পথে কোনো চাষী মেয়েকে ধরে মারেন তবে তাইতে আমার মাথাব্যথার কিছু কারণ নেই—মেয়েটি তো আমার সম্পত্তি নয়।

—কী! আপনি ভেবেছেন একটা অসহায়, নিরীহ মেয়ের উপর আপনার অত্যাচার আমি নিবিবাদে মেনে নেবো? বিশেষ করে কয়েক মুহূর্ত আগেও যে আমার বাহুপাশে বাঁধা ছিলো! ভীতু, লম্পট ছাড়া আর কেউই চুপ করে থাকতে পারতো না, ঐ অবস্থায় আপনি পারতেন নিরপেক্ষ দর্শকের মত দাঁড়িয়ে মজা দেখতে?

কাউন্ট কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর ধীরে ধীরে বললেন, এক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের কোনো প্রয়োজন নেই, যে বেঁচে থাকবে তার পক্ষে সেটা কিছু গৌরবের হবে না।

সজোরে হেসে উঠে তীব্র তীক্ষ্ণ শ্লেষে আর বিদ্রূপে ওকে জর্জরিত করে তুললাম।

—আমরা দু'জনেই একটা জঙ্গলে যাবো দ্বন্দ্ব যুদ্ধের জন্য। যদি আপনিই বেঁচে থাকেন তবে আমার গাড়োয়ানকে আপনি ইচ্ছামত নির্দেশ দিতে পারেন। যেখানে খুশি আপনাকে পৌঁছে দেবার জন্যে।

কাউন্ট স্পষ্ট ভাবে বললেন। খুব ভালো কথা। তলোয়ার না পিস্তল?

—তলোয়ার।

খুব জমকালো ভোজনের পর রওনা হোলাম দুজনে। মনটা বেশ ফুর্তিতে ভরে উঠেছিলো। শুনলাম কাউন্ট চালককে নির্দেশ দিলেন গোরিস রোড ধরে যাবার জন্যে। আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম কখন থামবার নির্দেশ দেবেন, কিন্তু কোথায় কি? দিব্যি চলে

এলাম শহরে, একটিও বাক্যব্যয় না করে। শহরে পৌঁছে উনি তখন নির্দেশ দিলেন সেই হোটেলে নিয়ে যেতে। প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়লাম—আমাদের বিখ্যাত দ্বন্দ্বযুদ্ধ ধোঁয়া হোয়ে মিলিয়ে গেল!

—আপনি ঠিকই করেছেন। আমরা পরস্পরের বন্ধুই থাকবো। তবে প্রতিজ্ঞা করুন যেন এই ঘটনা কোথাও প্রকাশ না পায়। আর যদিই বা কেউ এ প্রসঙ্গ তোলে হাল্কা ভাবে উড়িয়ে দেবেন—সকাতর মিনতি জানালেন কাউণ্ট।

কথা দিলাম, পরস্পরের হস্তমর্দনে ব্যাপারটার ওইখানেই নিষ্পত্তি হোলো। তখনকার মত গোরিসেই একটা নিরিবিলি বাসা দেখে উঠে এলাম। অনেক কাজ বাকী। আপাততঃ পোলাণ্ডের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করতেই হবে। টোরিয়ানির সঙ্গে আমার বিবাদের কথা ইতিমধ্যে সর্বত্র প্রচার হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি কোনো সময়ই কোনো গুরুত্ব দিতাম না ও-সব কথায়। কিছুকাল পরে বেশ একটি সম্ভ্রান্ত ঘরের তরুণী কন্যার পাণিগ্রহণ করে টোরিয়ানি। তারপর যতদিন বেঁচে ছিলো মেয়েটির জীবন অত্যাচারে দুর্ব্যবহারে জর্জরিত করে তুলেছিলো। শেষ অবধি মেয়েটির ভাগ্যজোরে বিয়ের বছর তেরো-চোদ্দ পরেই উন্মাদ হোয়ে অতি শোচনীয় অবস্থায় মারা যায়।

১৪৭৩ সালের শেষ তারিখটিতে গোরিস ছেড়ে চলে এলাম 'ত্রিয়েস্ত'-এ। সরকারী চৌরাস্তার উপর বেশ বড় একটি হোটেলের কয়েকখানি কামরা নিয়ে আমার নতুন বাসা বাঁধলাম।

* * * *

[এইখানেই এমনি আকস্মিক ভাবে সমাপ্ত হোয়েছে ক্যাসানোভার স্মৃতিকথা। আজও কেউ জানে না ক্যাসানোভা মৃত্যুর আগে স্মৃতিকথা শেষ করেছিলো কি না, না আকস্মিক ভাবে মৃত্যুই তাঁর